আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
এই পুস্তক উৎস্বর্গীকৃত হল

॥ এক ॥

পূণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে মহাভারতের যুদ্ধ আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৯০০-৮০০ অব্দে সংগঠিত হয়েছিল বলে এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের অভিমত। হস্তিনাপুর রাজসিংহাসনের অধিকার নিয়ে জ্ঞাতিভ্রাতা কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ভারতের সকল নৃপতিবর্গই তাঁদের সৈন্যদল নিয়ে যোগদান করেছিলেন। মোট ১৮ অক্ষৌহিনী সেনা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে কৌরবপক্ষে ছিল ১১ অক্ষৌহিনী এবং পাণ্ডবপক্ষে ৭। (২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত সৈন্য নিয়ে এক অক্ষৌহিনী গঠিত)। আঠার দিনের এই বিধ্বংশী যুদ্ধে উভয় পক্ষের অগণিত যোদ্ধৃবৃন্দ তাঁদের সৈন্যদলসহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ধ্বংসের ব্যাপকতায় জানা যায় যখন যুদ্ধশেষে দেখা গেল রক্ষা পেয়েছেন উল্লেখযোগ্য মাত্র দশজন; কৌরবপক্ষে তিনজন—দ্রোণাচার্যপুত্র অশ্বথামা, কুলগুরু কৃপাচার্য ও ভোজরাজ কৃতবর্মা, আর পাণ্ডবপক্ষে সাতজন পঞ্চপাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণবংশীয় যাদববীর সাত্যকি।

এরূপ এক মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি যে অতি ব্যাপক ছিল তা অনায়াসেই অনুমেয়। যে কোন যুদ্ধবিগ্রহে অপরপক্ষের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, সমর সজ্জা, অন্য শক্তির সহিত মিত্রতা, সহযোগী রাষ্ট্রের ও রাজন্যবর্গের মধ্যে মতবিরোধ প্রভৃতি নানা বিষয়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মহাভারতের যুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তবে মহাভারতের কবি আখ্যানগুলির বর্ণনার বিষয়েই তাঁর রচনাশৈলী নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এ জন্যই মহাভারত জগতে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ হিসাবে স্থান পেয়েছে। গোপন সংবাদ আদান প্রদানের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে গৌণই থেকে গেছে। সে জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রয়োগের কিছু কিছু বিবরণ থাকলেও বহুক্ষেত্রেই উহার উল্লেখ নেই। কিন্তু সেখানেও-আক্রমণাত্মক বা রক্ষণাত্মক যে অবস্থাই হোক না কেন, অপর পক্ষের বহু সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে। আবার এও দেখা গেছে বহু প্রয়োজনীয় পূর্ব সংবাদ সংগ্রহের অভাবে পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহের বিষয়টি বিশেষ কোন গুরুত্বই পায় নি।

প্রতিপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে কৌরবদের ব্যর্থতাই বেশী। কৌরব প্রধান দুর্যোধন ছিলেন চরম পাণ্ডববিদ্বেষী। এই বিদ্বেষভাবের জন্যই তিনি বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে কখনই সচেতন হতে পারেন নি। এর জন্য অবশ্য অনেকটাই দায়ী মাতুল শকুনি ও মিত্র কর্ণের কুমন্ত্রণা ছলে বলে কৌশলে সব কিছু গ্রাস করাই যেন তাঁর প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল। সেখানেও সুস্থ পরিকল্পনা ও প্রয়োগবিধির অভাব লক্ষিত হয়। চর নিয়োগ পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অথচ দুর্যোধনের কোন কিছুরই অভাব ছিল না। পাণ্ডবদের বনবাসের পর ভারতের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁরই করতলগত। লোকবলও অসামান্য। বেশীর ভাগ রাজন্যবর্গই তঁর পক্ষে। তাঁর অধীনে আছে এক বিরাট সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও গুপ্তচর বাহিনী। তদুপরি কৌরবপক্ষে আছেন পিতামহ ভীষ্ম যিনি শৌর্যবীর্যে অপ্রতিরোধ্য, কুলগুরু কৃপাচার্য, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, মহাবীর কর্ণ ও অন্যান্য বহু বীর যোদ্ধবৃন্দ। দুর্যোধন নিজে একজন গদাযুদ্ধ বিশারদ এবং তাঁর শত ভ্রাতার প্রত্যেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। হস্তিনাপুরের এই শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রায় সমস্ত সেনানায়ক-সহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হল কেবল ১৮ দিনের যুদ্ধে, তাও আবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাণ্ডব সেনার হাতে। ইহা সত্যই বিস্ময়কর।

যুদ্ধের ব্যাপারে ধর্মাধর্মের সূক্ষ্ম বিচার সম্ভব নয়। তবে যুদ্ধেরও কতকগুলি শাশ্বত ও স্বীকৃত নিয়মাবলী থাকে যা উল্লঙ্ঘণ অবাঞ্ছনীয় ও নিন্দনীয়। এ বিষয়ে পাণ্ডবপক্ষই বহুগুণে দোষী। কৃষ্ণের নির্দেশে মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয়ে দ্রোণাদি কৌরবপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধবৃন্দ নিহত হয়েছেন। বলা হয় ধর্মরাজ্য স্থাপনের বৃহৎ উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত করতে ও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য সময় সময় ন্যায় নীতি বিসর্জন দিতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যই কি মহাভারতের যুদ্ধের পর ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল? যুদ্ধে অগণিত যোদ্ধবৃন্দের মৃত্যুতে ভারতভূমি বীরশূন্য হয়ে পড়েছিল। অভিজ্ঞ রাজন্যবর্গের অভাবে বিভিন্ন রাজ্যের শাসনযন্ত্র হয়েছিল বিপর্যস্ত। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে বহু সময় লেগেছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর রাজসিংহাসন লাভ করে ভ্রাতাদের সহিত মাত্র ৩৬ বৎসর রাজ্যভোগ করেছিলেন। তন্মধ্যে পনের বৎসর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে রাজকার্য পরিচালিত হয়। ধৃতরাষ্ট্র বা যুধিষ্ঠির কেহই পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের মৃত্যুশোক ভুলতে পারেন নি। এ অবস্থায় তাঁরা রাজকার্যে কতদূর মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। যুধিষ্ঠিরের অবর্তমানে উত্তরার গর্ভজাত অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুর রাজসিংহাসনে আসীন হন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মত রাজোপযোগী কোন মহৎ কর্মই সম্পাদন করেন নি। তিনি মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একবার মৃগয়া করতে গিয়ে বনমধ্যে একটি হরিণকে তাড়না করার সময় তিনি এক ধ্যানমগ্ন ঋষিকে দেখতে পান ও হরিণটি কোন দিকে পালিয়েছে জিজ্ঞাসা করেন। ঋষি মৌনব্রতে ছিলেন। পরীক্ষিৎ তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ ধনুক দিয়ে একটি মৃতসর্প উঠিয়ে ঋষির গলায় জড়িয়ে দিলেন। মহান ভরত বংশের একজন রাজার পক্ষে এমন বালকসুলভ প্রগলভতা সত্যই দুঃখের। পরে তিনি ঋষির শাপে অকালে সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধে শতপুত্র হারিয়ে মূহ্যমানা ধৃতরাষ্ট্রমহিষী

গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করে অভিসম্পাত দেন কুরুকুল যে ভাবে ধ্বংস হয়েছে তাঁর যাদব বৃষ্ণিকুলও সেইভাবে ধ্বংস হবে এবং তাঁদের নারীকুল কুরুকামিনীদের মতই দুর্দশাগ্রস্তা হবেন। সাধ্বী গান্ধারীর অভিশাপ সত্যে পরিণত হয়েছিল। সমস্ত যদু ও বৃষ্ণিকুল আত্মকলহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্যাধের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। যদুও বৃষ্ণিকুলের ধ্বংস ও তাঁর এই অপঘাতে মৃত্যু যেন শ্রীকৃষ্ণের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। দেখা যায় মহাভারতের যুদ্ধ কেবল ধ্বংসই এনেছিল। যুদ্ধে ধ্বংসের বিভৎসতা এতই ব্যাপক ছিল যে গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মের অমর উপদেশাবলী অন্তত তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। তাই মহাভারতের এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

মহাভারতের যুদ্ধ অন্যান্য যুদ্ধের মতই আর একটি যুদ্ধ। ইতিহাসে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ কম হয় নি। হস্তিনাপুর রাজসিংহাসনের জন্য জ্ঞাতিভ্রাতাদের মধ্যে মতবিরোধ ও যুদ্ধ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ঘটনার বিবরণ দেখে মনে হয় প্রথম থেকেই দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মসীলিপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে। দুর্যোধনের আদেশে পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে প্রকাশ্য রাজসভায় আনয়ন ও তাঁর বস্ত্রহরণের চেষ্টার মধ্যে এর জঘন্যতম প্রতিফলন দেখতে পাই। কিন্তু সত্যই কি এমন একটি লজ্জাকর ও অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল? হস্তিনাপুর রাজবংশ অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। শৌর্য বীর্যের প্রতীক ও ন্যায় নীতির ধারক ও বাহক হিসাবে এই বংশের রাজা ও রাজপুত্রদের সুনাম জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত। সেই রাজ্যের রাজসভায় স্বয়ং রাজার (ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলেও সব কিছুই শুনছিলেন) সম্মুখে ও পিতামহ ভীষ্মাদি অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সভাসদদের উপস্থিতিতে রজঃস্বলাজনিত একবস্ত্র পরিহিতা কুলবধূ দ্রোপদীকে কেশাকর্ষণে আনয়ন করে তাঁর বস্ত্র হরণের চেষ্টা হল এবং তাঁর শ্লীলতা রক্ষায় কেহই এগিয়ে এলেন না এটা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় মহাজ্ঞানী কুরু পিতামহ ভীষ্মের দ্ব্যর্থবোধক ধর্মাধর্ম ব্যাখ্যা সত্যই পীড়াদায়ক। কেন তিনি নিজশক্তিতে দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করে দ্রৌপদীকে অসম্মানের হাত থেকে উদ্ধার করলেন না? অবশেষে কৃষ্ণকে এগিয়ে আসতে হল। তিনি সূক্ষ্মশরীরে সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে অলৌকিক উপায়ে দ্রৌপদীর বস্ত্র দীর্ঘায়িত করে বস্ত্রহরণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। দ্রৌপদী চরম অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। এই ঘটনায় কৌরবগণের অপযশ শতগুণে বৃদ্ধি পেল। কৌরব প্রধান দুর্যোধনের ধিক্কারে সকলে সোচ্চার হয়ে উঠল। মনে হয় কৌরবদের শত্রুপক্ষ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনার অবতারণা করেছিল পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে ও কৃষ্ণকে একজন ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করতে। সমস্ত ঘটনাই

কল্পনাপ্রসূত হওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ একটি অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা করে মহাভারতের কবি যেন হস্তিনাপুর রাজবংশের মহান ঐতিহ্যের প্রতি অবিচারই করেছেন, উদ্দেশ্য যাই হোক।

অথচ আমরা দুর্যোধনের মহানুভবতার বহু পরিচয় পেয়েছি। তিনি কর্ণকে সূতপুত্র জেনেও তাঁর শৌর্যবীর্যের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি; তিনি তাঁকে অঙ্গ রাজ্যের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছিলেন তাঁর যোগ্যতার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে। অন্যদিকে পাণ্ডবগণ কতভাবেই না কর্ণকে অপমান করেছেন শূতপুত্র বলে। দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর প্রভৃতি কৌরবপ্রধানদের পরিত্যাগ করেননি বা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি যদিও তাঁরা কৌরবদের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদেরই সাহায্য করে গেছেন।

দোষগুণের বিচারে মহাভারতের কবি কৌরবদের চেয়ে পাণ্ডবদেরই বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মের প্রতীক। বহু বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বে কৃষ্ণের সহায়তায় পাণ্ডবগণ নানা মহৎ কার্যের অনুষ্ঠান করেছেন। পাশা খেলায় হেরে প্রতিজ্ঞামত তিনি বিনা দ্বিধায় ভার্যা ও ভ্রাতাদের সহিত বনে গমন করেন। বনবাস কালে যুধিষ্ঠির গন্ধর্বদের হাতে বন্দী মহাশত্রু দুর্যোধনাদি সকলকে মুক্ত করে আনেন। শত্রুর প্রতি এরূপ ব্যবহার নজিরবিহীন। কৌরবদের সহিত বিরোধের তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানই চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্য তিনি শেষপর্যন্ত চেষ্টা করে যান। মাত্র পাঁচটি গ্রাম পেলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন সে প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন। দুর্যোধনের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধ জয়ের জন্য কৃষ্ণের নির্দেশে তিনি ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এজন্য যুধিষ্ঠিরের অনুশোচনাও কম হয় নি। দয়াবান যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জ্ঞাতিবর্গের নিধনে শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। এই শোকে তিনি আজীবন সন্তপ্ত ছিলেন। যুদ্ধশেষে জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য কৌরব প্রধানদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এ সবই তাঁর মহানুভবতার লক্ষণ। চারিত্রিক দিক থেকে কৌরব প্রধান দুর্যোধন ছিলেন একদেশদর্শী স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। আপন সিদ্ধান্তের উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। গভীরতার সহিত কোন কিছু চিন্তা করতে পারতেন না। অন্যদিকে ঈশ্বরাবতার পাণ্ডব উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অতি সূক্ষ্ম। অসাধারণ ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। বিপদোদ্ধার উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা ছিল তাঁর অপরিসীম। সমস্ত সংবাদই তাঁর করতলগত থাকায় পরবর্তী সঠিব পদক্ষেপ নিতে পাণ্ডবদের কোন অসুবিধা হয় নি।

॥ দুই ॥

মহাভারতের কবি ঘটনাবলী জাগতিক ও অলৌকিক শক্তির সংমিশ্রণে অতি

নিপুণভাবে সংযোজন করেছেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেবল একটি শক্তির উপর নির্ভর করলে চলবে না। অলৌকিক বা দৈবিক শক্তির সহিত জাগতিক শক্তির সমন্বয় অবশ্য প্রয়োজন। এজন্য অলৌকিক বা দৈবিক শক্তির সঙ্গে জাগতিক শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা মহাভারতে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের ব্যাপারে নানা উপদেশাবলীর মধ্যে বার বার শত্রুর কুঅভিসন্ধি সম্বন্ধে পূর্ব সংবাদ সংগ্রহের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। সুরক্ষা ও চরণীতি এবং তৎ সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রনায়কসহ বহু ঋষি ও শাস্ত্রবিদ্‌গণ মহাভারতে আমাদের জন্য অমূল্য উপদেশসমূহ রেখে গেছেন যা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। সর্ব প্রথম আমাদের মনে পড়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নীতিনিপুণ মন্ত্রী কণিকের উপদেশ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনাদি তাঁর শতপুত্রের প্রতি অত্যধিক দুর্বল ছিলেন। যখন নিজভ্রাতা প্রয়াত পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র বাল্যাবস্থাতেই শৌর্যবীর্য, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিজপুত্রদের অপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা অর্জন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করল, তখন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পঞ্চপাণ্ডদের প্রতি তাঁর এক গভীর ঈর্ষাও জাগরিত হল। তিনি নীতিনিপুণ মন্ত্রী কণিককে আহ্বান করে পাণ্ডবদের প্রতি এমতাবস্থায় সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহ বাদে আর কী প্রকার ব্যবহার করা উচিত তা বিশদভাবে জানতে চাইলেন। যদিও কণিক বর্ণিত নীতিগুলি কুমন্ত্রণা বলে আখ্যাত, সময় বিশেষে এগুলির প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয় নয়। কণিক বললেন,--মহারাজ, ধৈর্য রাজার একটি প্রধান গুণ। রাজা সব সময় ধৈর্য অবলম্বন করে থাকবেন যাতে তাঁর রোষ, অসন্তোষ বা পৌরুষ কখনই প্রকাশ না পায়। এতে শত্রু রাজার প্রকৃত মনোভাব বুঝতে না পেরে নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকবে এবং রাজার অর্থ ও বলের সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে উৎসাহবোধ করবে না। রাজা সাধ্যানুসারে বিপক্ষের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবেন যাতে সুযোগমত তা তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সদা সর্বদা রাজাকে আপন দোষত্রুটি, অপরের সহায়তা প্রাপ্তি, রাজ্য রক্ষায় ও বিস্তারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড নীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে সংবাদ সমূহ যত্নসহকারে গোপন রাখতে হবে। মহারাজ, যে উপায়েই হোক শত্রুর মূলোচ্ছেদ করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ অনেক সময় দুর্বল শক্তিও কালক্রমে শক্তি অর্জন করে রাজার ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়। সময় সময় শত্রুর অন্যায় কাজের প্রতি উদাসীন থেকে অন্ধ ও বধিরের মত ব্যবহার করা কর্তব্য। এই ভাবে শত্রুকে নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে তার সহিত মিত্রতা স্থাপন করে বশে এনে সুযোগমত ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এখানে দয়া প্রদর্শনের কোন স্থান নেই। শত্রুর সহযোগীদের উৎকোচ দিয়ে তার দুর্বলতা সম্বন্ধে সকল সংবাদ জ্ঞাত হয়ে তাকে বিনষ্ট করা রাজার একটি অবশ্য কর্তব্য। সেই সঙ্গে উৎকোচগ্রহণকারী বিশ্বাসঘাতকদেরও ধ্বংস করে ফেলতে হবে। রাজার

মনে রাখতে হবে, প্রধান শত্রু বিনষ্ট হলে তার অন্যান্য সংযোগীদের বিনষ্ট করা সহজ হয়ে পড়ে। মহারাজ, ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরকে বিনয় প্রকাশ, লুব্ধকে অর্থদান এবং সমভাবাপন্ন ব্যক্তিকে বল প্রয়োগ দ্বারা বশীভূত করতে হবে। পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা ও গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় কার্য করে তবে তাদেরও বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। শত্রুকে সর্বোপায়ে এমন কি বিষপ্রয়োগেও ধ্বংস করা বিধেয়। শত্রু সম বলবান ও বুদ্ধিসম্পন্ন হলে রাজা অধিকতর প্রচেষ্টা দ্বারা নিজ শক্তি বর্দ্ধন করবেন। অন্যথায় সাফল্য লাভ অসম্ভব। কুপিত হয়ে অগ্রপশ্চাদ বিবেচনা না করে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। শান্তবাক্য, ধর্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে প্রথমে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন। এর পরও যদি শত্রু বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তার প্রতি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত হবে না। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়। আবার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতিবিশ্বাস করা অনুচিত। কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি কোন লোভের বশবর্তী হয়ে অবিশ্বাসের কাজ করে রাজ্যের ক্ষতি সাধন করতে পারে। রাজা নিজে অথবা বিশ্বস্ত আমাত্যদের সিদ্ধান্ত-মত শত্রুর খবরাখবর সংগ্রহ করতে চর নিয়োগ করবেন। পাষণ্ড ও তাপসদের বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। এতে পাষণ্ড প্রকৃতির লোকরা নিজ রাজ্যে কোনরূপ অপকার্য করতে পারবে না। অথচ তারা শত্রুরাজ্যে অপরাধ জগতের সঙ্গে মিশে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ কবতে পারবে। আর শুদ্ধাচারী তাপসগণ পররাজ্যে সহজেই সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে পারবে। রাজা ওই সকল সংগৃহীত তথ্য প্রয়োজনমত শত্রুব বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবালয়, পা নাগার, পথ, তীর্থস্থান, চত্বর, কুপ, পর্বত, বন প্রভৃতি স্থানে মন্ত্রণাকুশল ব্যক্তিদের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত। এরূপ স্থলে মন্ত্রণা করলে মন্ত্রণা লব্ধ বিষয়বস্তু শত্রুর চরদের নিকট অগোচর থাকবে। রাজা নিজ মন্ত্রনা গোপন রেখে উপযুক্ত চরদ্বারা শত্রুর মনোভাব জানতে চেষ্টা করবেন। মহারাজ, পাণ্ডুর পুত্রদের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রমত ব্যবহার করে নিজেকে ও নিজ পুত্রদের রক্ষা করুন।

মহাভারতে দেবর্ষি নারদেরও রাজধর্ম, সুরক্ষা, চরনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রকল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ে বহু অমূল্য উপদেশাবলী উল্লিখিত আছে। ইন্দ্রপ্রস্থে নিজেদের রাজধানী স্থাপনের পর পাণ্ডবগণ দানব-স্থপতি ময়দানবের সাহায্যে সেখানে এক অপূর্ব রত্নখচিত নয়নাভিরাম সভাগৃহ নির্মান করান। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও অন্যান্য মাননীয় অতিথিবর্গের সঙ্গে সভাগৃহে প্রবেশ করলে সেখানে দেবর্ষি নারদের উপস্থিত হয়। মহাসমাদৃত হয়ে প্রসন্নচিত্তে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসাচ্ছলে ধর্মকামার্থ বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে নানা উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশগুলি বহুমুখী ও কালোত্তীর্ণ। দেবর্ষি বললেন—

মহারাজ, তুমি পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজকর্ম পরিচালনা করছ তো? বিষয় চিন্তা যেন ধমানুষ্ঠানের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান করবে

ও অমাত্য ও সুহৃদগণের উপযুক্ত সুখসাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে। রাজকোষ বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি রাখবে এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষায় দূর্গ নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সৈন্যদল নিযুক্ত করবে। মন্ত্রিগণ যেন সদাসর্বদা তোমার অনুরক্ত থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। তাঁদের কোন বিচ্যুতিই যেন সহ্য করা না হয়। কপটদুতদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে। তারা গোপন সংবাদাদি শত্রুর নিকট প্রকাশ করে রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করতে পারে। বিশ্বস্ত চর নিয়োগ করে শত্রু মিত্র সকলের সংবাদ সংগ্রহ করবে। মনে রাখবে আজ যিনি মিত্র কাল তিনি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করতে পারেন। বিশ্বস্ত সংকুলজাত ও অনুগত ব্যক্তিগণকেই কেবল মন্ত্রিপদে নিয়োগ করবে। কার্যসিদ্ধির অনেকটাই নির্ভর করে ঘটনাবলীর সুষ্ঠু মন্ত্রণার উপর। সেজন্য রাজ্যের মঙ্গলের জন্য মন্ত্রণা গোপন রাখতে সক্ষম এমন জ্ঞানবান অমাত্যদের নিযুক্ত করবে। মনে রাখবে একার ও বহুজনের মধ্যে মন্ত্রণার কোন মূল্য নেই। মন্ত্রণার বিষয়বস্তু সব অবস্থাতেই জনসাধারণের অগোচরে রাখবে। অন্যাথায় রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। চর নিয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে। অভিজ্ঞ ও বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত চরদ্বারা শত্রুপক্ষীয় চরদের উপর নজর রাখবে। শত্রুর চরদের সনাক্তকরণ সম্ভব হলে তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। মহারাজ, কাজের গুরুত্ব বুঝে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। তা না হলে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। সকল সফল কাজের জন্য পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। শত্রু যখন বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত থাকবে তখনই তাকে নিজ শক্তির মূল্যায়ণ করে এবং আপন রাজ্য সংরক্ষিত করে আক্রমণ করা উচিত। শত্রুকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তার সেনা প্রধানদের গোপনে উৎকোচ প্রদান করবে। দেখবে যেন অধিকৃত ও নিজরাজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের বিরুদ্ধে মন্ত্রনায় ব্যাপৃত না হয়। এতে শাসনযন্ত্র দুর্বল হয়ে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবে বিশ্বাসী ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ যেন কোন ভুল তথ্যের ভিত্তিতে শাস্তিভোগ না করে। এরূপ হলে জনসাধারণ শাসনযন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। লোভী, পরদ্রব্য হরণকারী, শত্রুভাবাপন্ন ও অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কাজকর্মে নিয়োগ করবে না। নারীদের নিকট কোন গূহ্যকথা প্রকাশ করবে না। কাল বিলম্ব না করে সকল অমঙ্গল সংবাদের প্রতিকার করবে। নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত রক্ষীবৃন্দ নিয়োগ করবে। শত্রুর অর্থের লোভে রাষ্ট্রদ্রোহীরা যাতে কোন অনিষ্ঠ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে। মহারাজ, দেখবে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় শিষ্ট ব্যক্তি যেন শাস্তিভোগ না করে, আর সকল দুষ্টলোকেই যেন তাদের অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করে।

পরিশেষে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সর্বতোভাবে চর্তুদশ রাজদোষ বর্জন করতে উপদেশ দিলেন। এগুলি হল—নাস্তিক্য অনৃত, ক্রোধপ্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা,

জ্ঞানীব্যক্তির সম্পর্ক বর্জন, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অযোগ্য ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ মন্ত্রণা, সংগুপ্তিতে উদাসীনতা, মঙ্গল কার্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান বা ঔদ্ধত্য।

উপদেশ প্রদান সমাপ্তে যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করে বললেন, দেবর্ষি, আপনার উপদেশাবলী শিরোধার্য করে আমি রাজকার্য পরিচালনা করব। সৎপথেই সব কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করি, তবে আমি পূর্ববর্তী জিতেন্দ্রিয় নৃপতিদের সমকক্ষ নই।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নীতিবিশারদ কণিক ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি নারদের উপদেশাবলী বিচার করলে নারোদক্ত উপদেশাবলীই শ্রেষ্ঠতর বলে মনে হবে। কণিকের উপদেশাবলীর উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডুপুত্রদের উৎকর্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত হীনবল দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের স্বার্থ রক্ষা করা। কণিক কার্যতঃ পাণ্ডুপুত্রদের শত্রু মনে করে তাঁদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রকে সেইমত ব্যবহার করতে বললেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন সদুপদেশ দেন নি। উপদেশগুলি প্রায় সবই ছিল নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক, গঠনমূলক ছিল সামান্যই। কনিক বর্ণিত কুমন্ত্রণা হিসাবে বিধৃত হয়ে যথার্থই হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ধৃতরাষ্ট্র কণিকের উপদেশমত নিজ পুত্রদের সহিত আলোচনা করে মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডুপুত্রদের বারাণাবতে নির্বাসিত করেন। এই বারণা বতেই দুর্যোধন ও মাতুল শকুনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁদের সকলকে যতুগৃহ দাহে পুড়িয়ে মারতে। সে চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে দেবর্ষি নারদের উপদেশাবলীর উদ্দেশ্য ছিল নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যের সুরক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করা এবং তাঁকে একজন মহান প্রজাবৎসল রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। দেবর্ষি নারদের এসব উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল। তাঁর উপদেশমত কাজ করে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহায়তায় এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অসাধারণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে মহাসম্মানকর রাজচক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর সুশাসনে সমগ্রদেশে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি নেমে আসে। দেবর্ষি নারদের উপদেশগুলি ছিল উদার, গঠনমুলক, বহুমূখী ও প্রজারঞ্জন মূলক। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কোন কুমন্ত্রণা দেন নি। তিনি কেবল তাঁকে রাজার কর্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অবশ্য একথা সত্য দেবর্ষি নারদ ও নীতিবিশারদ কনিক এঁদের দুজনেরই গুপ্তচর নিয়োগ সম্বন্ধে উপদেশগুলি মূল্যবান এবং সকল রাজারই তাহা প্রণিধান যোগ্য। বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য রক্ষায় কণিকোক্ত নীতিগুলির প্রয়োগেরও প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় গোপন সংবাদ আদান প্রদান সম্বন্ধে মহাভারতে আরও বহু উল্লেখ আছে। পাণ্ডবগণ বনবাসকালে এক সময় বদরিকাশ্রমের সন্নিকটে ভাগীরথীর

তীরে এক মনোরম স্থানে অবস্থান করছিলেন। একদিন বায়ুতাড়িত হয়ে একটি সহস্রদল পদ্ম দ্রৌপদীর সমীপে পতিত হল। পদ্মটি দেখে দ্রৌপদী উৎফুল্ল হয়ে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনকে তাঁর জন্য ঐ পুষ্প সংগ্রহ করে আনতে অনুরোধ করলেন। ভীমসেন পদ্মের অন্বেষণে গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত এক কদলিবনে উপনীত হলেন। পরে সেখানের এক সরোবরে স্নান সেরে শঙ্খধ্বনি করে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। এর ফলে পর্বতে এক ভীষণ প্রতিশব্দ উত্থিত হয়ে বনস্থিত সিংহ ও হস্তিকুল ঘোরতর চিৎকার আরম্ভ করল। এই শব্দে কপিকুলাগ্রগণ্য রামভক্ত হনুমান যিনি রাম ও সীতার বরে অমরত্ব লাভ করে ঐ কদলিবনে বাস করছিলেন, আপন ভ্রাতা ভীমসেনের আগমন বার্তা জানতে পারলেন। কদলিবনে স্বর্গগমনের এক অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। পাছে ভীমসেন ঐ পথ গ্রহণ করে শাপগ্রস্ত হন ও পরাভব বরণ করেন, সেই ভয়ে হনুমান ঐ পথ অবরোধ করে শয়ান রইলেন। অনতি বিলম্বে ভীমসেন সেইস্থানে উপস্থিত হয়ে হনুমানকে বললেন পথ ছেড়ে দিতে। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর হনুমান ভীমসেনকে তার লাঙ্গুল উত্তোলন করে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। মহাবীর ভীমসেন বহু চেষ্টা করেও হনুমানের লাঙ্গুল এতটুকু উত্তোলন করতে সমর্থ হলেন না। ভীমসেন তখন বুঝতে পারলেন হনুমান একজন ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষ। বিনীতভাবে ভীমসেন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে হনুমান আপন পরিচয় দিয়ে ত্রেতাযুগে সীতা হরণ ও উদ্ধারের সকল ঘটনাবলী বর্ণনা করলেন। সব কিছু শুনে ভীমসেন আপন অগ্রজ হনুমানকে প্রণিপাত করে তাঁর কাছ থেকে যুগধর্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলে হনুমান সত্য ত্রেতা প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় ধর্ম ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। হনুমান বললেন, ভ্রাত, দেশ ও জনসাধারণের রক্ষাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। রাজা বুদ্ধিমান, শ্রুতশীল, বৃদ্ধ ও সজ্জনদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য শাসন করবেন। দুষ্টের শাস্তিবিধান রাজার একটি অবশ্য কর্তব্য। রাজা নিজে দুশ্চরিত্র লম্পট হলে পতন অনিবার্য। রাজা সর্বদা উপযুক্ত চর নিয়োগ করে শত্রুর দুর্গ ও বল সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে আপন কর্তব্য স্থির করবেন। চর কেবল শত্রুর সংবাদই সংগ্রহ করবে না; আপন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, জনমত, দুর্গের অবস্থান ও সংস্কার, প্রাপ্তবিষয়ের রক্ষা, সাফল্য ও অবক্ষয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করবে। এর ফলে রাজ্যের সকল প্রকার সমস্যার আশু সমাধান করা রাজার পক্ষে সম্ভব হবে। মনে রাখবে, কার্যসাধনের প্রধান উপায় হল চরদ্বারা সংবাদ আহরণ, আপন বুদ্ধি, সৎভাব, পরাক্রম, শত্রু নিগ্রহ, সজ্জনের রক্ষা এবং নিজ দক্ষতা। সাম, দান, ভেদ, দন্ড ও উপেক্ষা একত্র বা পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হলে সাফল্য লাভ সহজ হয়। মন্ত্রণা রাজকার্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এই মন্ত্রণা সব সময় ব্রাহ্মণ তথা সৎব্যক্তিদের সঙ্গে করা উচিত। কোন

অবস্থাতেই স্ত্রীলোক, বালক, অতিবৃদ্ধ, লঘুচেতা ও উন্মাদগ্রস্তের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত নয়। ধর্মকার্যে ধার্মিক, স্ত্রীলোকের নিকট ক্লীব এবং ক্রুরকর্মের জন্য ক্রুরদেরই নিয়োগ করা কতর্ব্য। কোন নূতন পরিস্থিতি উপস্থিত হলে চরদ্বারা প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করে যথাকর্তব্য স্থির করবে। ভ্রাত, মনে রাখবে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন সুনিশ্চিত করেই রাজা লোক-মর্য্যাদা অর্জন করতে সমর্থ হন।

পরে ভীমসেন হনুমানের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে একটি বৃহৎ নদী হতে কুবের অনুচরদের সকল বাধা অতিক্রম করে দ্রৌপদীর জন্য দিব্য পদ্ম সংগ্রহ করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবর্গের নিধনের কারণে এক গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হন। ভ্রাতাগণ এমন কি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণও তাঁর শোক অপনোদনে ব্যর্থ হন। বাসুদেব তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে শরশয্যায় শায়িত কুরুপিতামহ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'মহাত্মন! আমরা সকলে ধর্মসিদ্ধান্ত জ্ঞাত হতে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে হতজ্ঞান হয়েছেন, অতএব আপনি ধর্মার্থযুক্ত কথা কীর্তন করে তাঁর শোকাপনোদন করুন। বার্সুসেবের কথা শুনে মহাত্মা ভীষ্ম মহানন্দ প্রকাশ করে বললেন, —'লোকনাথ, আমি আপনার নিকট কী কীর্তন করব? সকল বাক্যেই আপনি বিদ্যমান রয়েছেন। এক্ষণে শরাঘাত নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হয়ে আছে। দৌর্বল্য প্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। এ অবস্থায় আপনার আজ্ঞা কীরূপে পালন করব'? তখন বাসুদেব বরপ্রদান করে শরাঘাত জনিত সমস্ত দুঃখ কষ্ট মহাত্মা ভীষ্মের দেহ হতে দূরীভূত করলেন। মহাত্মা ভীষ্মের রজগুণ ও তমগুণ বিবর্জিত হয়ে সত্বগুণাত্মক ও ধর্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত হলেন। দিব্যচক্ষু লাভ করে সকল বিষয়বস্তু অনায়াসে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। বাসুদেব হতে প্রাপ্ত শক্তিবলে মহাত্মা ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম, অর্থ, কাম, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, আশ্রমধর্ম, রাজধর্ম, চরণীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে উপদেশাবলী প্রদান করলেন তা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

রাজধর্ম ব্যাখ্যা করে মহাত্মা ভীষ্ম বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির! সর্বদা মনে রাখবে উদ্‌যোগী রাজাই কার্যে সাফল্য লাভ করতে পারেন। রাজকার্য পরিচালনায় কেবল দৈবের উপর নির্ভর না করে নিজ পুরুষকারের উপর নির্ভর করবে। কার্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হলে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তখন রাজাকে কার্যসিদ্ধির জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা করতে হবে। পণ্ডিতগণের মতে এটাই রাজার কার্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়। সকল কর্ম সত্যনিষ্ঠ হয়ে সরলভাবে সম্পাদন করবে। কিন্তু আপন দোষ গোপন রাখবে যাতে শত্রুর কোন সুবিধা না হয়। পরের ছিদ্রান্বেষণে যত্নবান থাকবে এবং মন্ত্রণাগুপ্তি সুনিশ্চিত করবে। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এ সব বিষয়ে মিথ্যা কথনও

দোষের নহে। ছয় প্রকার দুর্গের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এর মধ্যে নরদুর্গই নিতান্ত দুর্ভেদ্য। রাজাকে সেজন্য সর্বদা প্রজার হিতের জন্য কর্ম করে তাদের সহযোগিতা পেতে সচেষ্ট হতে হবে। প্রজারঞ্জক রাজা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় সকল প্রকার বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। রাজা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলবেন। তিনি অতি মৃদু বা অতি কঠোর হবেন না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাদি নানা উপায়ে নিজ ও পর রাজ্যের তুলনামূলক অবস্থা বিবেচনা করে রাজা আপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রাজা সর্বদা ধৈর্য অবলম্বন করে চলবেন; কখনই অধৈর্য হবেন না। কোন অবস্থাতেই রাজা ভৃত্যের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করবেন না। এতে ভৃত্য রাজার প্রতি সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলবে এবং রাজাকে অবজ্ঞা করবে। এমন কি সাহস বেড়ে গিয়ে রাজাকে তিরস্কার পর্যন্ত করতে পারে। রাজার মৃদুতার সুযোগ নিয়ে অবিবেকী ভৃত্য উৎকোচ গ্রহণ, রাজধন অপহরণ, জালপত্রাদি প্রণয়ণ প্রভৃতি নানা অহিতকর কার্যে লিপ্ত হবে এবং গোপন মন্ত্রণা ও রাজার দুষ্কর্মসমূহ শত্রুর নিকট প্রকাশ করবে। এর ফলে রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে। সেজন্য বৎস, ভৃত্যের সঙ্গে ব্যবহারে সর্বদা সতর্ক থাকবে।

রাজধর্ম সম্বন্ধে আরও উপদেশ দিয়ে ভীষ্ম বললেন, বৎস, মনে রাখবে, রাজার অবস্থা সর্পগর্তস্থ মুষিকের ন্যায়; যে কোন সময় বিপদ উপস্থিত হতে পারে। সে জন্য রাজাকে নিজের উদ্যমের উপর বিশ্বাস রেখে রাজ্য রক্ষায় সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাজ্যের সাতটি অঙ্গ হল—রাজা নিজে, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল। যে এদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে শত্রু হোক বা মিত্রই হোক তাকে বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। রাজা কাকেও অতি বিশ্বাস বা অতি অবিশ্বাস করবেন না। সকলের কাজকর্মকেই কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখবেন। কারণ কখন যে কে রাজার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হবে তার কোন স্থিরতা নেই। সেই রাজাই প্রশংসার যোগ্য যিনি শত্রুরাজ্যের ছিদ্রান্বেষণে সফল হন ও উৎকোচ দ্বারা বিপক্ষীয়দের স্ববশে আনয়ন করতে পারেন। সেই রাজাই রাজ্য লাভ করতে সমর্থ হন যিনি জ্ঞানীদের সম্মান করেন, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হতে উৎসুক থাকেন, প্রজাসাধারণের হিতকর্মে নিয়োজিত হন এবং যাঁহার চর ও মন্ত্রণা বিপক্ষের নিকট গোপন থাকে।

প্রজা রক্ষার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে ভীষ্ম বললেন, বৎস, রক্ষাই রাজধর্মের প্রধান অঙ্গ। পণ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা রক্ষাধর্মকেই প্রশংসা করে গেছেন। রক্ষা বিধানের উপায়গুলির মধ্যে আছে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহে গুপ্তচর নিয়োগ, রাজকর্মচারিদের সন্তুষ্টি বিধান, যথোপযুক্ত কর গ্রহণ, সাধুসঙ্গ, শত্রুপক্ষে ভেদসৃষ্টি, দোষীব্যক্তির দণ্ডপ্রদান, সৈন্যদলের সন্তুষ্টি বিধান, আপন রাজ্যে শত্রুর ভেদসৃষ্টির বিরুদ্ধে সাবধানতা, অসৎলোকের সংসর্গ ত্যাগ প্রভৃতি।

চর নিয়োগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভীষ্ম বললেন—বৎস যুধিষ্ঠির, মনে রেখো, আপন

চিত্তকে জয় না করে শত্রুকে জয় করা যায় না। নৈতিক বলে বলীয়ান রাজাই রাজকর্মচারী ও জনসাধারণের সহযোগিতায় শত্রুর পরাজয় সম্ভব করতে পারেন। যারা জড়, অন্ধ বা বধিরের ন্যায় দেখতে গুপ্তচর হিসাবে রাজা তাদেরই নিযুক্ত করবেন। কারণ এই সকল লোক অন্যের সন্দেহের উদ্রেক না করে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয় বলে গুপ্তচরদের ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রম সহ্য করার মত সামর্থ থাকা প্রয়োজন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেবল বিচক্ষণ লোকদেরই গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত করা বিধেয়। অমাত্য, মিত্র, রাজপুত্র, সামন্তরাজগণ এবং নগর ও জনপদবাসীদের গোপনীয় রাজকর্ম সম্বন্ধেও গুপ্তচরগণ সংবাদ সংগ্রহ করবে। কারণ রাজার সকলের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। রাজার গুপ্তচরগণ যেন পরস্পরকে জানতে না পারে এবং তাদের কাজকর্মের তদারকির জন্য যেন অন্য নিরপেক্ষ লোক নিযুক্ত করা হয়। শত্রুর চরদের কাজকর্ম সম্বন্ধে রাজা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। এ জন্য পানশালা, মল্লযুদ্ধস্থান, মহাজন সমাজ, ভিক্ষুকদের আবাসস্থল, পণ্ডিতগণের সমাগমস্থান, চত্বর, রাজসভা, স্বজনদের বাসস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে যেখানে চক্রর চরদের যাতায়াত থাকা সম্ভব, রাজা আপন চরদ্বারা গোপনে তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। রাজার একটি অবশ্য করণীয় কাজ হল শত্রুর চরদের চিহ্নিত করে তাদের স্বপক্ষে আনয়ন করা উপযুক্ত অর্থের লোভ দেখিয়ে। কারণ এতে শত্রুর চরদের আপন স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

যুদ্ধযাত্রার নিয়মাবলী বর্ণনা করে ভীষ্ম বললেন, বৎস, দুর্বল, মিত্রবিহীন শত্রু বা প্রমত্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধেই রাজার যুদ্ধ যাত্রা করা উচিত। সেখানেও শত্রুকে হেয় জ্ঞান না করে এক শক্তিশালী সৈনবাহিনী সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে হবে। হীনবল রাজা সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে বিশ্বস্ত ভৃত্যদের দ্বারা বলবান রাজাকে অস্ত্র, অগ্নি ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে উৎপীড়িত করবেন। বলবান রাজাব অমাত্য ও সুহৃদ বর্গের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাঁকে হতবল করতে হবে। ভগবান বৃহস্পতির উপদেশ স্মরণে রাখবে,—সাম, দান ও ভেদ নীতিদ্বারা কার্যসিদ্ধি হলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অকর্তব্য। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্ভাব্য রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সংবাদ সংগ্রহ করতে চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান লোকবসতি স্থলে চর নিয়োগ করা কর্তব্য। রাজার যদি সন্দেহ হয় তাঁর কোন ভৃত্য, অমাত্য, পুরবাসী বা অন্য কোন রাজা হতে বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে তবে তিনি কাল বিলম্ব না করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপকারী ব্যক্তিদের পুরস্কৃত ও প্রশংসা করে তাদের মনোবল রক্ষা করা রাজার একটি বড় কর্তব্য।

দণ্ডনীতির ব্যাখ্যা করে ভীষ্ম বললেন, বৎস, দণ্ডনীতির সম্যক প্রয়োগের ফলেই

সকল বর্ণের লোক নিজ নিজ কর্ম যত্নসহকারে সম্পাদন করে থাকে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সম্ভব হয়ে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। দণ্ডনীতি প্রয়োগ করে রাজা অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করবেন। রাজা সুখ্যাতি লাভ করেন তখনই যখন তিনি রাগদ্বেষশূন্য হয়ে ধর্মানুষ্ঠান, লোভশূন্য হয়ে স্নেহ প্রকাশ, ঔদ্ধত্য না দেখিয়ে কামনাসিদ্ধি, নির্ভিকভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মপ্রশংসা না করে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতি নানা গুণাবলী অর্জন করতে সমর্থ হন। রাজার অবশ্য বর্জনীয় বিষয়গুলি হল অসৎ লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন, বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সহিত বিরোধ, অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ, অসৎব্যক্তির নিকট গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশ, আত্মপ্রচার, দুষ্টলোকের সহায়তা গ্রহণ, সাফল্যের পূর্বেই দক্ষতা প্রকাশ, মিত্রত্যাগ, অজ্ঞব্যক্তিকে শাস্তিপ্রদান, পরাজিত শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা, অনাবশ্যক ক্রোধ প্রকাশ ও অন্যায়কারীর প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন।

মন্ত্রিনিরূপণ বিষয়ে ভীষ্ম বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, রাজার মিত্র চার প্রকার—সমার্থ (যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান্য), ভজমান (অনুগত্য), সহজ (আত্মীয়) এবং কৃত্রিম (অর্থদ্বারা বশীভূত)। এছাড়াও আছে রাজার পঞ্চম মিত্র—ধর্মাত্মা ব্যক্তি তিনি ধার্মিক রাজারই পক্ষ অবলম্বন করেন; অধার্মিক রাজাকে কোন সহায়তা করেন না। মনে রাখবে কেবল ধর্মপথ অবলম্বন করে কোন রাজা বিজয় লাভ করতে পারেন না; তাঁকে সময় সময় অধর্মের পথও গ্রহণ করতে হয়। রাজা তাঁর ধর্মবিরুদ্ধ সংকল্প ধর্মাত্মা মিত্রের নিকট গোপন রাখবেন। পূর্বোক্ত চার প্রকার মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ। অন্য দুই প্রকার মিত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে রাজার সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ সুযোগ পেলে তারা রাজার বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। মনুষ্যচিত্ত সদা চঞ্চল। শত্রু যে কখন মিত্র ও মিত্র যে কখন শত্রু হয়ে উঠে তার কোন স্থিরতা নেই। সে জন্য রাজা কাহাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন না। কারও উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা অকাল মৃত্যুস্বরূপ। তবে তোমার গুরু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি যদি সরলস্বভাব, মেধাবী ও কার্যনিপূণ হন, মান অপমান বিষয়ে উদাসীন থাকেন এবং অমাত্যপদ গ্রহণ করে তোমার গৃহে অবস্থান করতে সম্মত হন তবে তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করতে পার। এমন ব্যক্তির নিকট গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ করলেও বিপদের আশঙ্কা নেই। কর্মদক্ষ, মিতভাষী, নীতিপরায়ণ, দ্বেষহীন ও সংযমী ব্যক্তিকেই প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করবে। আর অমাত্যপদে নিযুক্ত করবে তাঁদেরই যাঁরা কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান, অহঙ্কারশূন্য ও কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানযুক্ত। একই কার্যসম্পাদনের জন্য বহু অমাত্য নিযুক্ত করা বিধেয় নয়। এতে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে কার্য সম্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। বৎস, জ্ঞাতিদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ তাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে দেখা

যায়। আবার জ্ঞাতি না থাকাও বিশেষ দুঃখের বিষয়। সেজন্য জ্ঞাতিদের কখনই আন্তরিক বিশ্বাস করবে না; কিন্তু বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করবে। ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন করে জ্ঞাতিবর্গকে নিজ বশে আনা অসম্ভব নয়। বাসুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশমত এই পন্থা অবলম্বন করেই বিরুদ্ধচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্রদের স্ববশে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। মনে রাখবে অভ্যন্তরিক ভেদ বিরোধ বাইরের শত্রু অপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর।

বৎস, সম্পদবৃদ্ধি ও তার রক্ষা রাজার একটি অবশ্য কর্তব্য। কোন লোভী রাজকর্মচারীর পক্ষে রাজধন চুরি করা অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এই চুরির সংবাদ রাজার গোচরে আনবে, তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় অসাধু কর্মচারী তাকে নানাভাবে বিপর্যস্ত, এমনকি তার প্রাণনাশ পর্যন্ত করতে পারে। এর ফলে কেউই রাজধন চুরির সংবাদ রাজার গোচরে আনতে সাহস করবে না। পরিণামে রাজার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে। বৎস, অমাত্যগণ রাজার অনিষ্টচেষ্টায় রত হলে, ক্রমে ক্রমে একে একে তাদের হীনবল করে বিনষ্ট করতে হবে। সকলের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়।

বৎস, বিনীত, সৎ, সরল ও সুবক্তাদেরই সভাসদ পদে নিযুক্ত করবে। বিপদকালে নেতৃস্থানীয় শক্তিমান অমাত্য ও অন্যান্য জ্ঞানবান ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাজার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত স্বদেশজাত বিদ্বান ব্যক্তিগণই সেনাপত্য ও অন্যান্য দায়িত্বশীল পদের উপযোগী এবং রাজা তাদেরই ঐসকল পদে নিযুক্ত করবেন। সাধারণ অবস্থায় রাজা বহুলোককে পরিত্যাগ করে কেবল একজনের উপর নির্ভর করবেন না। তবে সেই ব্যক্তি যদি বহুগুণ সম্পন্ন হয় তবে তাঁকে আশ্রয় করে অন্যান্যদের পরিত্যাগ করা অন্যায় হবে না। আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে এমন মন্ত্রীর সহিত রাজা গোপনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না। অনুগত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হল তিনি তিরস্কৃত এমন কি পদচ্যুত হলেও রাজার বিরুদ্ধাচরণের চিন্তা করেন না। এরূপ অনুগত ব্যক্তির সহিতই রাজা মন্ত্রণা করবেন। কুটিল ব্যক্তি নানা গুণসম্পন্ন হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরূপ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করা নির্বোধের কাজ।

মন্ত্রীদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভীষ্ম বললেন, বৎস, স্মরণ রেখ, রাজ্যের উন্নতি নির্ভর করে মন্ত্রীদের সুমন্ত্রণাবলেই। মন্ত্রী সে জন্য সর্বদা প্রজা, শত্রু এমন কি স্বীয় প্রভুরও রন্ধ্রান্বেষণে সচেষ্ট থাকবেন। শত্রুর কোনরূপ দুর্বলতা ও বিচ্যুতি দেখলে মন্ত্রী রাজার অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মন্ত্রী রাজার দুর্বলতা, বিচ্যুতি ও গুপ্তমন্ত্রণা শত্রুর নিকট গোপন রাখবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায়। রাজা তিন বা চারজনের একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যে সকল স্থানে রাজা মন্ত্রণা করবেন সেখানে যেন কোন কুঞ্জ, কৃশ. খঞ্জ, অন্ধ প্রভৃতি লোকের উপস্থিতি না থাকে। কারণ

এই প্রকার প্রতিবন্ধীরা অনেক সময় শত্রুর চর হিসাবে কাজ করে। নৌকায় বা অন্য কোন অনাবৃত স্থানে মন্ত্রণা করার সময় অতি মৃদু বা অতি উচ্চস্বরে আলোচনা প্রভৃতি বাক্য দোষ বা হাঁটু কাঁপান পা নাচান প্রভৃতি অঙ্গদোষ থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় শত্রুপক্ষীয় চরের সন্দেহের উদ্রেক হয়ে মন্ত্রণার সংগুপ্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

বৎস, সেনাপতিদের অন্যান্য গুণের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনা, ব্যূহরচনা প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। শত্রুর দুর্বলতা অন্বেষণ করা তাঁদের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজা সর্বদা শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করবেন। কিন্তু নিজে কাউকেও বিশ্বাস করবেন না; এমন কি নিজ পুত্রকেও নয়। মূলত অবিশ্বাসই রাজার কার্যসিদ্ধির প্রধান উপায়। রাজ্য রক্ষার উপায় হিসাবে রাজা চর নিয়োগ করে রাষ্ট্রদ্রোহীদের খুঁজে বার করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। চর নিয়োগ, মন্ত্রণা, রাজকোষবৃদ্ধি ও অপরাধীর দণ্ডবিধান বিষয়ে রাজা বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। এ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দায়িত্ব অন্যদের উপর ন্যস্ত করে রাজার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। রাজা অনুগত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবেন যাতে তাদের মনোবল অক্ষুন্ন থাকে।

বৎস, পূর্বেই বলেছি প্রজাপালনই রাজার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এজন্য জনসাধারণের কার্যাকার্য সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। চর নিয়োগ করে রাজা এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন। অতীত কাজের প্রশংসা মানুষের একটি বড় গুণ। এরূপ সজ্জন লোকদের চিহ্নিত করতে রাজা চর নিয়োগ করবেন। বৎস, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায় বলে জানবে। এ সমস্ত সম্পদ অল্পমাত্র অর্জন করে পরিতৃপ্ত থাকা রাজার কখনই উচিত নয়।

বৎস, পূর্বে উপকার করেছে এমন শত্রুকে পরাজিত করে সম্মানিত করা উচিত। রাজা কোন কারণ বশতঃ একবার কারও প্রতি অপ্রিয় আচরণ করে তার প্রতি উদাসীন থাকবেন না। সুযোগ উপস্থিত হলেই রাজা তার প্রতি প্রিয় ব্যবহার করবেন। প্রিয় ব্যবহারে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়। বলবান্ শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছ থেকে দূরে থেকে নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করা বিধেয় নয়। সুযোগ পেলেই বলবান শত্রু এর প্রতিশোধ নেবে। রাজা বিভিন্ন ভূপতিগণের আচার ব্যবহার অতি বিশ্বস্ত চরদ্বারা সংগ্রহ করবেন। রাজ্যের বিস্তার ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয় পাঁচটি উপায়ে—দুর্গাদি রক্ষা, যুদ্ধ, ধর্মানুশাসন, মন্ত্রণা সংগুপ্তি ও প্রজারঞ্জন।

বৎস, বিপদকালে শত্রুকে বিনয় প্রদর্শন করবে। অনুকূল সময় এলে তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। মনে রেখো, কৃতঘ্ন ব্যক্তি কার্য শেষ হলেই উপকারীর বিরুদ্ধাচরণ করে। সে জন্য কার্য সম্পূর্ণ শেষ না করে কিছু অবশিষ্ট রাখা উচিত। যারা শত্রুর শত্রু তাদের সঙ্গে সখ্যতা করবে। আপন চরদের শত্রুর চর মনে করে শঙ্কিত থাকবে। কারণ অর্থলোভে তারা যে কোন সময় শত্রুপক্ষে যোগ দিতে পারে। কারা নিজের

চর আর কারাই বা শত্রুর চর তা ভালভাবে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। দুরাত্মা, তস্কর ও অন্যান্য সমাজ বিরোধীরা উদ্যান, পর্যটনস্থল, পানাগার, বেশ্যাপল্লী, তীর্থস্থান প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। চর নিয়োগ করে তাদের খুঁজে বার করতে হবে। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এদের সামান্য অংশও বিদ্যমান থাকলে ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। মনে রেখো, যে শত্রুর মস্তক ছেদ করা সম্ভব নয়, তাকে প্রহার করতে যাওয়া মূর্খামী।

বৎস, ঐক্যবদ্ধ সৈনদল যুদ্ধজয়ের অন্যতম হাতিয়ার। অপরিমিত বলশালী হলেও রাজা প্রথমেই যুদ্ধে অগ্রসর হবেন না। সাম, দান ও ভেদ নীতি প্রয়োগ করে শত্রুকে দুর্বল করতে হবে। শত্রুর শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। এ সব কাজে চরের বিশেষ ভূমিকা আছে। এত সব প্রচেষ্টা সত্বেও শত্রু বশীভূত না হলে যুদ্ধের পথেই অগ্রসর হতে হবে।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট এইরূপে আরও বহু বিষয়ে উপদেশ লাভ করে প্রকৃতিস্থ হয়ে অন্যান্যদের সহিত হস্তিনাপুর ফিরে এলেন। অতঃপর মহাত্মা ভীষ্ম তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভির মধ্যে স্বর্গারোহণ করলেন।

পাণ্ডবগণ বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের রাজ্যাংশ দাবি করলে কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। যুদ্ধ বাঞ্ছনীয় নয় মনে করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সারথী ও পার্ষদ সঞ্জয়কে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে বিরাটনগরে পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ করেন। আলোচনায় সঞ্জয় বুঝতে পারলেন পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ার সর্তানুসারে তাঁদের রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ ফেরত না পেলে তাঁরা অস্ত্রবলে রাজ্য উদ্ধারে দ্বিধা করবেন না। হস্তিনাপুরে ফিরে এসে সঞ্জয় এ সংবাদ দিয়ে বললেন, মহারাজ, এ যুদ্ধে কুরুকুল সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং এর জন্য আপনিই দায়ী হবেন। আপনি আপনার স্বেচ্ছাচারী পুত্র দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে কাজ করার জন্যই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

সঞ্জয়ের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র অস্থিরচিত্ত হয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ধর্মানুগত উপদেশ শুনতে মহামন্ত্রী বিদুরকে নিজ সমীপে আহ্বান করলেন। রাজধর্ম, সুরক্ষা, চরনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিদুরের উপদেশাবলীর সারবত্তা সর্বজন স্বীকৃত। আজকের সমাজ ব্যবস্থাতেও এগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। বিদুর পণ্ডিতের লক্ষণ-বর্ণনায় বললেন, মহারাজ, যার কার্য ও মন্ত্রণা সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর নিকট গোপন থাকে তিনিই পণ্ডিত। যিনি ভয় ও আকাঙ্খা বর্জিত হয়ে কার্য সম্পাদনে উদ্যোগী হন তিনিই পণ্ডিত। যিনি আপন সম্মানে অসম্মানে বিপদে আপদে অবিচলিত থাকেন তিনিই পণ্ডিত। যিনি দুর্বলের অবমাননা করেন না, শত্রুর দুর্বলতা জেনেও তার সন্দেহের উদ্রেক না করে

উদাসীন থাকেন, বলবানের বিরুদ্ধাচরণ করেন না এবং উপযুক্ত সময়েই বিক্রম প্রকাশ করেন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। মহারাজ, আর যে ব্যক্তি আপন স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হন ও মিত্রের প্রতি মিথ্যাচরণ করেন তিনিই মূর্খ। যিনি শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করেন ও প্রকৃত মিত্রকে হিংসা করেন তিনিই মূর্খ। যিনি অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করেন ও নিজের বল সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে লোভের বশবর্তী হয়ে অলভ্য বস্তুর লাভে অগ্রসর হন তিনিই মূর্খ। মহারাজ, আপনি সাম, দান, ভেদ প্রভৃতি উপায় দ্বারা শত্রু, মিত্র ও উদাসীন লোকদের বশীভূত করুন। দ্যূত ক্রিড়া, মদ্যপান, কর্কশভাষণ, লঘুপাপে গুরু দণ্ড, নির্যাতনপূর্বক কর সংগ্রহ প্রভৃতি অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকুন। রাজা কখনই অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, অলস ও স্তাবকদের সঙ্গে রাজ্যের কোন বিষয়ে মন্ত্রণা করবেন না। এতে মন্ত্রণাসংগুপ্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা। মহারাজ, কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তার প্রয়োজন ও পরিণাম এবং আপন উদ্যোগ সম্বন্ধে সম্যক পর্য্যালোচনা বাঞ্ছনীয়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কর্মে প্রবিষ্ট হলে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। আপন রাজ্যের মঙ্গলার্থী রাজা সর্বত্র অন্বেষণ করে সকল লোক হতে সদ্বাক্য ও সদাচার আহরণ করবেন। মনে রাখা দরকার রাজা চরদ্বারা ও ইতর ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন।

মহারাজ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপকার করে দূরে চলে গেলেও নিশ্চিন্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সুযোগ পেলেই সে প্রতিঘাত হানতে পারে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা অনুচিত। আবার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিশ্বাস হতে ভয় উৎপন্ন হয় এবং এর ফলে সব কিছু সমূলে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মহারাজ, চতুর্দিকে রাজার সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যাতে কি বহিঃশত্রু কি অন্তঃশত্রু কেউই তাঁর গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। কার্য সম্পাদনের পূর্বে মন্ত্রণা প্রকাশ অনুচিত। পার্বত্য প্রদেশে, নিজ প্রাসাদে ও অরণ্য প্রভৃতি নির্জনস্থানে মন্ত্রণা করা বিধেয়। রাজার যিনি সুহৃদ তিনিই গুপ্তমন্ত্রণা জানবার অধিকারী। সচিবপদে নিয়োগের পূর্বে সকল প্রার্থীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করা উচিত। তাদের অর্থলিপ্সা ও মন্ত্রণা কার্পণ্য (সঠিক মন্ত্রণা না দেওয়া) দুইই থাকতে পারে।

মহারাজ, বধ্যশত্রু বশীভূত হলেও তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিনষ্ট না হলে সে ভবিষ্যতে রাজার বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। রাজা স্বয়ং হীনবল হলেও শত্রুর সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে চলবেন যাতে তার কাছ থেকে কোন বিপদ না আসে। মন্ত্রণা সংগুপ্তি বিঘ্নিত হতে পারে ছয়টি কারণে; (১) রাজার চিত্তবৈক্লব্য (২) আলস্য ও নিদ্রাপ্রিয়তা (৩) শত্রুর চরদের না জানা (৪) রাজার নিজের ভাবভঙ্গী (৫) দুষ্ট অমাত্যে বিশ্বাস ও (৬) পররাজ্যের দক্ষদূত। এ বিষয়ে রাজাকে

অবহিত থাকতে হবে। উদ্যোগপরায়ণা তাই কার্যসিদ্ধির মূল কারণ। অতি বিনয় সম্পন্ন ব্যক্তিকেও অশক্ত বিবেচিত হয়ে দুষ্ট লোকের হাতে পরাভূত হতে দেখা গেছে। ভগবতী লক্ষ্মীও অতি গুণবান ও অতি নিপুণ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে বহু নীতিবাক্য ব্যাখ্যা করে বিদুর বললেন—মহারাজ, আপনি পাণ্ডুপুত্রদের নিজপুত্রদের সমান জ্ঞান করে তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দিন। অন্যথায় অমিত বিক্রম পাণ্ডুপুত্রদের হস্তে কুরুকুল বিনষ্ট হবে সন্দেহ নেই। ধৃতরাষ্ট্র উত্তরে বললেন, বিদুর, আমি তোমার কথায় সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু পুত্র দুর্যোধনকে স্মরণ করলে আমার মতিভ্রম হয়। আমি সত্যাসত্যের জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

পুত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র একজন প্রজ্ঞাবান নৃপতি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পত্নী গান্ধারীর সহিত বন গমনের পূর্বে তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, চরনীতি, সুরক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। রাজ্যের স্থায়িত্বের বিষয় ব্যাখ্যা করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, স্বামী (রাজা) অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, শৈল ও পৌরবর্গ—এই অষ্টাঙ্গযুক্ত তোমার রাজ্যের সমগ্র পরিস্থিতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে। এ বিষয়ে তুমি প্রবীণ জ্ঞানবান ব্যক্তিদের উপদেশ গ্রহণ করবে। তাঁরা তোমায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবেন। মন্ত্রিদের নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকবে। প্রকৃত বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই মন্ত্রিপদে নিয়োগ করবে। তোমার অধীনস্থ বিশ্বাসী গুপ্তচর দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে তার সকল সংবাদ সংগ্রহ করবে। যে পুরমধ্যে তুমি বাস করবে তাহা সব দিক থেকে সুরক্ষিত হওয়া উচিত। সব সময় সাবধানে আত্মরক্ষা করবে। মন্ত্রিদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী, বিনয়ী ও সদকুলোদ্ভব তাঁদের সঙ্গেই মন্ত্রণা করা বিধেয়। মন্ত্রণা নিভৃত স্থানে হওয়া আবশ্যক। জড়, পঙ্গু প্রভৃতি প্রতিবন্ধীদের মন্ত্রণাস্থলের নিকটে আসতে দেবে না। এজন্য পূর্ব থেকেই মন্ত্রণা স্থল সুরক্ষিত রাখবে। কারণ প্রতিবন্ধীদের ছদ্মবেশে শত্রুর চর সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে। মন্ত্রণার সংগুপ্তি বিঘ্নিত হলে রাজ্যের ক্ষতি অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে, যেহেতু এর প্রতিবিধান অতি কঠিন। মন্ত্রিদের এ বিষয়ে অবহিত করা দরকার। চরদ্বারা পুরবাসীদের দোষগুণ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবে। প্রকৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরই বিচারকের পদে নিযুক্ত করবে যাতে দুষ্টের দণ্ড সুনিশ্চিত হয়। বিচারকগণ ন্যায়ানুবর্তী হয়ে কাজ করেছেন কি না তা জানার জন্য চর নিয়োগ করবে। যাঁরা উৎকোচ গ্রহণ কারী, গুরুদণ্ডদাতা ও অন্যান্য দোষযুক্ত তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। কর্তব্যচ্যুতি গর্হিত হলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

বৎস, প্রাতঃকালই সেনাদল তত্ত্বাবধানের প্রশস্ত সময়। আর দূত ও চরদের কার্যাদি পরিদর্শনের উপযুক্ত সময় হল সন্ধ্যাকাল। মধ্যাহ্নকাল ও মধ্যরাত্রিতে প্রজাদের কার্য

পরিদর্শন করা বিধেয়। অর্থ ও সম্পদ বৃদ্ধি রাজার একটি প্রধান কর্তব্য। তবে দেখতে হবে এ কাজে যেন প্রজাদের উপর কোন পীড়ন করা না হয়। প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করেই তাদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা উচিত। সেনাপতি পদের জন্য যারা অধ্যবসায়শীল, কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও বিশ্বাসী তাঁদেরই নিযুক্ত করবে।

বৎস, তুমি সর্বদা শত্রু, শত্রুর মিত্র, শত্রুর পরাজয়-কাঙ্খী, শত্রুর মিত্রের পরাজয় কাঙ্খী, অগ্নি ও বিষাদি প্রয়োগকারী, মিত্র ও মিত্রের মিত্র—এদের সকলের সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। শত্রু সুযোগ পেলে সব বাধা অতিক্রম করে রাজার সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারে। দেখবে এরূপ পরিস্থিতি যেন উপস্থিত না হয়। দুর্বল শত্রুকেই জয়ের চেষ্টা করা উচিত। আর বলবান শত্রুর সঙ্গে বিবাদ না করে সন্ধি করাই বাঞ্ছনীয়। রাজা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নানা যুক্তি ও উপায় উদ্ভাবন করবেন। উপযুক্ত চর নিয়োগ করে শত্রুর দুর্বলতা সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তার মিত্র আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। ওই ভাবে শত্রুকে আরও দুর্বল করে সুযোগমত তাকে বিনষ্ট করাই বুদ্ধিমান রাজার কাজ।

বৎস, রাজা শত্রুদের একে একে বিনাশ করবেন। এক সঙ্গে সকলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবেন না। আপন ও শত্রু সৈন্যের বল, সমরসজ্জা ইত্যাদি সম্বন্ধে চরদ্বারা সকল সংবাদ সংগ্রহ করেই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হবেন।

ধৃতরাষ্ট্র পরিশেষে বললেন বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি আমার উপদেশমত ধর্মানুসারে কার্য করে প্রজাপালন কর। নিশ্চয়ই তুমি ইহলোকে সুখভোগ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করবে।

রাজধর্ম, সুরক্ষা, চরনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নারদ-ভীষ্মাদি কর্তৃক বর্ণিত নীতিগুলির মধ্যে বহু ক্ষেত্রে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায় এবং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ নীতিগুলি বহু পরীক্ষিত ও পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ—রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনায় এগুলির কার্যকারিতা তখনকার সমাজে বহুবার প্রমাণিত। বস্তুতঃ নীতিগুলি কালোত্তীর্ণ; সকল রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই প্রায় সমান ভাবে প্রযুজ্য। রাষ্ট্রের সুরক্ষায় গুপ্ত সংবাদ ও প্রতি-সংবাদ (counter-intelligence) সংগ্রহ বিষয়ে আধুনিক রাষ্ট্রনায়কদের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ মহাভারতে বর্ণিত নীতিগুলির সহিত বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে প্রমাণ হয় মহাভারতের যুগে এক উচ্চমানের রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের সুরক্ষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপ্রধান ও পণ্ডিতগণ গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করতেন এবং এ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের পরিধিও ছিল অসাধারণ। অবাক লাগে যখন দেখি ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদ-ধন্য মহাজ্ঞানী দেবর্ষি নারদও গুপ্তচরের ভূমিকার ন্যায় একটি পার্থিব বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। এতে বিষয়টি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাই প্রমাণিত হয়।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং রাজ্য রক্ষাই মহাভারতের যুগে রাজার প্রধান কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট ছিল। কতকগুলি বিশেষ নীতি অনুসরণ করেই রাজা তাঁর কর্তব্য সমূহ পালন করতেন। ভীষ্মাদি গুরুজনদের মুখ থেকে আমরা এই নীতিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা শুনেছি। নীতিভ্রষ্ট রাজা রাজ্যসম্পদ হারিয়ে মহাবিপদে পতিত হতেন এবং সময় বিশেষে নিজ জীবন পর্যন্ত হারাতেন। বর্তমান কালের পরিবর্তিত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনায়কদের প্রাথমিক কর্তব্য সমূহ একই আছে এবং কর্তব্য সমূহের সফল রূপায়ণে মহাভারত-বর্ণিত নীতিগুলিই বহুলাংশে পালনীয়। রাজা বা শাসককুলের নৈতিক মানের উপরই নির্ভর করে অধঃস্তনকর্মীদের কর্মপ্রেরণা। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছি আমরা মহাভারতে। দুর্যোধনের নীতিভ্রষ্টতার করণেই তাঁরই নিয়োজিত প্রধান প্রধান যোদ্ধবৃন্দ ও গুপ্তচর সহ অন্যান্য বহু রাজকর্মচারী তাঁদের কাজে নিরুৎসাহ বোধ করে বিপক্ষে যোগ দিয়ে নিজ পক্ষের ক্ষতি করতে দ্বিধা করেন নি। দুর্যোধনের এই সকল যোদ্ধবৃন্দ, গুপ্তচর ও রাজকর্মচারী সত্বগুণান্বিত পাণ্ডবদের প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আজকের দিনে শাসককুলের নীতিভ্রষ্টতার কারণে বিভিন্ন দেশে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নীতিপরায়ণ রাজা বা রাষ্ট্রনায়কগণই নিঃস্বার্থ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধি করে দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারেন। এ ভাবেই মহাভারতে বর্ণিত 'নরদুর্গের' শক্তিবৃদ্ধি করে রাজ্যের সুরক্ষা বিধান সম্ভব। ইহা মহাভারতের যুগে যেমন সত্য ছিল, আজকের দিনেও একই ভাবে সত্য।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই মহাভারতের যুগে নারীদের যোগ্য সম্মান্ দেওয়া হয় নি। পুরুষরাই তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা ছিল। অনেক সময় তাদের পণ্য হিসাবেও ব্যবহার করতে দেখা গেছে। মহাভারতের রাষ্ট্রনায়ক ও পণ্ডিতগণ নারীদের রাষ্ট্রের গুপ্তমন্ত্রণার অংশীদার করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। হয়তো তাঁদের ধারণা ছিল নারীরা সরলমনা, ভাবপ্রবণা ও কৌতুহল পরায়ণা; মন্ত্রণা সংগুপ্তির জন্য যে মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন তা তাদের নেই। তাদের সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব। বর্তমান যুগে নারীদের সম্বন্ধে এমন বিরুদ্ধ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। নারীরা আজ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। এই পদাধিকার বলে তারা রাষ্ট্রের বহু অতি গোপনীয় মন্ত্রণার ধারক ও বাহক। এতে রাষ্ট্রের কোন স্বার্থহানি হতে পারে বলে কেহই মনে করে না। দুই একজন নারীর মন্ত্রণার সংগুপ্তি রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য সমগ্র নারীকুলকে দায়ী করা অনুচিত। আবার এমন বহু ঘটনা আছে যেখানে পুরুষ রাজকর্মচারী গোপন সংবাদ নানা প্রলোভনের বশে শত্রুর নিকট প্রকাশ করেছে। আসল বিবেচ্য বিষয় হল বিশ্বাস যোগ্যতা। এই বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হলে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে—সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক-গোপন সংবাদের আদান প্রদান বা মন্ত্রণা

থেকে দূরে রাখতে হবে? এজন্য নারীদের স্বতন্ত্রভাবে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। যাহা হোক, মন্ত্রণা সংগুপ্তি বিষয়ে নারীদের সম্বন্ধে তখনকার প্রচলিত মূল্যায়ণের ভিত্তিতে এই বিরূপ মন্তব্যে মহাভারতের নীতিগুলির সার্বজনীনতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি।

॥ তিন ॥

মহাভারতের নানা ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা চরনীতি, মন্ত্রণা-সংগুপ্তি ও সুরক্ষা সমন্ধে বেশ কিছু সফল প্রয়োগ দেখতে পাই। অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্তও কম নয়। বাল্যাবস্থা থেকেই দুর্যোধনাদি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন অসাধারণ দৈহিক বলের অধিকারী ছিলেন। তিনি ক্রীড়াচ্ছলে ধার্তরাষ্ট্রদের নানাভাবে নিপীড়িত করতেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দুর্যোধন ভীমসেনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর আদেশে গঙ্গার তীরবর্তী একস্থানে কয়েকটি মনোরম অট্টালিকা নির্মান করে সেখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে রাখা হল। নির্দিষ্ট দিনে দুর্যোধনের আমন্ত্রণে ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব গঙ্গায় জলক্রীড়ার মানসে সেস্থানে উপস্থিত হলেন। আহারের সময় রাজপুত্রগণ কৌতুক মনে মিষ্টান্ন হাতে নিয়ে একে অন্যের মুখে দিতে লাগলেন। দুর্যোধন নিজে ভীমসেনের মুখে মিষ্টান্ন তুলে দিলেন এবং সে মিষ্টান্নে বিষমিশ্রিত ছিল। আহার শেষে সকলে জলক্রীড়ায় নামলেন। বিষক্রিয়ার ফলে পরিশ্রান্ত ভীমসেন জ্ঞান হারিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় নদীর তীরবর্তী এক অল্পজলমগ্ন স্থানে শায়িত হলেন। দুর্যোধন তখন ভীমসেনের হাত পা লতা দ্বারা বেঁধে তাঁকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন। এ ঘটনা অন্যান্য রাজপুত্রগণ জানতে পারলেন না, যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে জল থেকে উঠে এসেছেন! ভীমসেনের অচৈতন্য দেহ জলের গভীরে প্রবেশ করলে বিষধর সর্পগণ তাঁকে দংশন করে। ফলে তাঁর দেহের দুর্যোধন কর্তৃক প্রদত্ত বিষের তেজ বিনষ্ট হয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। পরে ভীমসেন নাগলোকে এসে উপস্থিত হন। সেখানে নাগরাজ ভীমসেনের পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে নিজ প্রাসাদে নিয়ে আসেন। ভীমসেন নাগরাজের নিকট বহু ধনরত্ন উপহার পান এবং নাগরাজ প্রদত্ত অমৃত পান করে আরও বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে উঠেন।

জল ক্রীড়া শেষে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতাগণ ভীমসেনকে না দেখে মনে করলেন তিনি পূর্বেই রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছেন। রাজপ্রাসাদেও ভীমসেনকে না দেখে মাতা কুন্তীসহ সকলেই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বহু সন্ধানেও তাঁকে কোথাও পাওয়া না যাওয়ায় তাঁদের সন্দেহ হল ভীমসেনের কোন বিপদ হয়েছে। তাঁরা মনে করলেন ক্রূরমতি দুর্যোধনের হস্তেই ভীমসেন নিহত হয়েছেন।।

সমস্ত ঘটনা জেনে পাণ্ডব হিতৈষী মহামন্ত্রী বিদুর সকলকে সাবধান করে দিলেন এ ঘটনা যেন অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ না পায়। মহামুনি বেদব্যাসের ভবিষ্যৎবাণী উদ্ধৃত করে মাতা কুন্তীকে আশ্বস্ত করলেন তাঁর পুত্রগণ সকলেই দীর্ঘায়ু হবেন; তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই। আট দিনের পর ভীমসেন নাগলোক হতে সুস্থশরীরে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলে সকলের দুশ্চিন্তা দূর হল।

নাগগণের দংশনে ভীমের দেহস্থ বিষের ক্ষয় ও জীবন লাভ এবং নাগলোকে অমৃত পান ও অপার শক্তিলাভ সত্যই একটি অলৌকিক ঘটনা। জাগতিক বিচারে এর ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। হতে পারে নানা জীবনদায়ী পদার্থে সমৃদ্ধ সুশীতল গঙ্গা জলে ভীমের অচৈতন্য দেহ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। নাগগণের দংশন ও নাগলোকে যেয়ে অমৃত পান করে ভীমের মহাশক্তি লাভের ঘটনাটি হয়তো মহাভারতের কবির এক নাটকীয় সংযোজন। যাহোক সমগ্র ঘটনার মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষনীয়। এক, দুর্যোধন কর্তৃক ভীমকে বিষপ্রয়োগে হত্যার পরিকল্পনা পাণ্ডব পক্ষের কেহই পূর্বে জানতে পারেননি। এতে দুর্যোধনের যেমন সাফল্য, অন্য দিকে পাণ্ডবপক্ষের ব্যর্থতাও। এ কথা সত্য কুন্তীপুত্রগণ সকলেই অল্পবয়স্ক। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বয়সই তখন মাত্র ১৬/১৭ বৎসর। সকলেই সরলস্বভাব ও বিশ্বাসপ্রবণ। দুর্যোধন যে জল ক্রীড়ার নামে ভীমকে বিষপ্রয়োগে হত্যার এমন একটি জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন তা তাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাঁদের পক্ষে দুর্যোধনের মনোভাবের কোন আভাস না পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্ন পাণ্ডব হিতৈষী মহামন্ত্রী বিদুর ভীম নিধনের দুর্যোধনের এই পরিকল্পনার কোন পূর্বাভাস পেলেন না এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। পঞ্চপাণ্ডব বিশেষত ভীমের প্রতি দুর্যোধনের আক্রোশের কথা তাঁর অজানা নয়। গঙ্গাতীরে মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হল। নানা প্রকার ভোজ্যদ্রব্য সংগৃহীত হল সেখানে গঙ্গায় জল ক্রীড়ার নামে। এত সমস্ত আয়োজনের মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকাই স্বাভাবিক। বিদুরের অনুচরগণ কিছুই জানতে পারল না। এটা তাঁর পক্ষে এক বড় ব্যর্থতা। দুই, রাজপ্রাসাদে অন্যের অবিদিত অবস্থায় ভীমের ৮ দিন অনুপস্থিতি বিদুরের উপদেশেই সম্ভব হয়েছিল। পাণ্ডবগণ যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন এই সফল মন্ত্রণা সংগুপ্তির ফলে। দুর্যোধন ধরেই নিয়েছিলেন ভীমের বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হয়েছে। ভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি এক আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন হলেন। পরে ভীমের প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটলে ধার্তরাষ্ট্রগণের বিস্ময়ের সীমা রইল না। গঙ্গায় জলক্রীড়ার দিনের ঘটনা সম্বন্ধে দুপক্ষই নীরব রইলেন। দুর্যোধনের ধারণা হল তাঁর দুষ্কর্মের কথা পাণ্ডবগণ জানতে পারেন নি। আর ভীম যে নূতন শক্তি অর্জন করে ফিরে এসেছেন সে কথা দুর্যোধনের নিকট অজ্ঞাত রইল। পাণ্ডবগণ তখনও সহায় সম্পদহীন। এমতাবস্থায় দুর্যোধনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন অভিযোগ

এনে ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আরও তিক্ত করা পাণ্ডবগণ সমীচীন মনে করলেন না। এতে বিদুরের দূরদর্শিতারই প্রমাণ মেলে। এই ঘটনার পর পাণ্ডবগণ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলেন নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে। প্রথম রাউণ্ডেই দুর্যোধন হেরে গেলেন, আর জিত হল পাণ্ডবদের।

শৌর্যবীর্য ও অন্যান্য গুণে অলংকৃত পাণ্ডবগণ সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। প্রজাসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে ও পিতামহ ভীষ্মাদি গুরুজনদের প্রস্তাবনানুসারে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হল। যৌবরাজ্যের দাবিদার ছিলেন দুর্যোধন। কারণ তিনিই বর্তমান রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। হলেনই বা তিনি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বয়সে কম। আশাহত দুর্যোধন মাতুল শকুনি, মিত্র কর্ণ ও ভ্রাতাদের উস্কানিতে বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি চক্রান্ত করলেন পাণ্ডবদের এবার একসঙ্গে পুড়িয়ে মারবেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও পাণ্ডবদের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় শঙ্কিত। তিনি শত্রুদমনে নীতিনিপুণ মন্ত্রী কণিককে ডেকে তাঁর মতামত শুনলেন কণিকের কূটমন্ত্রণা ধৃতরাষ্ট্রের ভালই লাগল।

এদিকে দুর্যোধন, শকুনি,কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন একসঙ্গে মন্ত্রণা করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন কোন বিশেষ কারণ দেখিয়ে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর থেকে নির্বাসিত করে প্রয়াগের সন্নিকটে অবস্থিত বারণাবত নগরে পাঠিয়ে দিতে। অন্যতম উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের অবর্তমানে সমগ্র হস্তিনাপুর রাজ্য নিজেদের হস্তগত করা। প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র এরূপ অন্যায় কাজ করতে অসম্মত হলেন। বললেন, ভীষ্মাদি গুরুজন ও অন্যান্য ধর্মশীল পুরবাসীগণ পান্ডবদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় সহ্য করবেন না।

দুর্যোধন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তখন উদ্ভাবন করলেন এক নূতন পন্থা। ভ্রাতাদের সঙ্গে হস্তিনাপুর নগরবাসীর এক বড় অংশকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করলেন। ধৃতরাষ্ট্রেরও তলে তলে এ বিষয়ে সায় ছিল। তাঁরই পরামর্শে মন্ত্রিগণ বারণাবত নগরের নানা সুখ্যাতি করতে আরম্ভ করলেন। বারণাবত শহর নাকি এক অতি মহৎ ও পরম রমনীয় স্থান। এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হলে পাণ্ডবদের কানেও পৌঁছল। তাঁরা নিজ থেকেই বারণাবতে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পাণ্ডবদের মনোভাব জেনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ডেকে এনে বারণাবতের অনেক সুখ্যাতি করলেন ও তাঁদের সেখানে কিছুদিন বাস করতে বললেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কুমতলব বুঝেও এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। ভীষ্মাদি গুরুজনগণ এ বিষয়ে তাঁদের পূর্বের আপত্তি তুলে নিলেন।

পরিকল্পনামত কাজ অগ্রসর হচ্ছে দেখে দুর্যোধনের আনন্দের শেষ নেই। এখন তিনি পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি পুরোচন নামে এক সচিবকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে তাঁর সাহায্যে বারণাবত নগরে মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করলেন। পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে দুর্যোধন পুরোচনকে

বললেন.—পুরোচন. তুমি বারণাবতে গিয়ে শণ, ধুনা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দিয়ে একটি চকমিলান সুসজ্জিত গৃহ নির্মাণ করাবে। মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণ ঘৃত, তেল, চর্বি, লাক্ষাদি মিশ্রিত করে গৃহের দেওয়াল লেপনের ব্যবস্থা করবে। গৃহের চর্তুদিকে ঘৃত, তেল, কাষ্ঠ প্রভৃতি দাহ্যপদার্থ সংগ্রহ করে রাখবে। সমস্ত কিছুই খুব গোপনে সম্পাদিত করতে হবে। পাণ্ডবদের যেন কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়। গৃহ নির্মিত হলে মাতা কুন্তী ও পাণ্ডবদের অতি সমাদরে সেখানে বনবাসের জন্য নিয়ে আসবে। দেখবে নূতন গৃহে যেন তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দের কোন অভাব না হয়। এইভাবে তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করে কিছুদিন বনবাসের পর গৃহে অগ্নিসংযোগ করবে। মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবদের অগ্নিদগ্ধে মৃত্যু হলে নগরবাসীগণ মনে করবে অকস্মাৎ আগুন লেগেই তাঁদের গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে। এতে কারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করবে না।

পুরোচন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে বারণাবতে গমন করলেন।

পাণ্ডবগণের বারণাবতে নির্বাসনের গূঢ় উদ্দেশ্য মহামন্ত্রী বিদুর পূর্বেই তাঁর চরদের সাহায্যে জানতে পেরেছিলেন। তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। পাণ্ডবদেরও সেইমত উপদেশ দিলেন। বিদুরের উদ্দেশ্য ধার্তরাষ্ট্রদের এক মিথ্যা আত্মপ্রসাদের মধ্যে রাখা। তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হলেন যখন পাণ্ডবগণ স্বেচ্ছায় বারণাবতে গমন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে মাতা কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবগণ বারণাবতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁদের নির্বাসনের সংবাদ পেয়ে প্রজাগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। যুধিষ্ঠির সকলকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিবৃত্ত করলেন। যুধিষ্ঠিরকে অনেকটা একলা পেয়ে বিদুর উভয়ের জানা অন্যের অবোধ্য ম্লেচ্ছ ভাষায় বল্লেন বৎস, যিনি নীতিজ্ঞানী তিনি সব সময় বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে সচেষ্ট থাকেন। তৃণ দগ্ধ করা অগ্নির পক্ষে সহজ হলেও গর্তবাসী মনুষ্যের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। লৌহাস্ত্র ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণ নাশ সম্ভব। যিনি ধৈর্যশীল, পথ চিনে রাখেন ও নক্ষত্র দ্বারা দিক্‌নির্ণয় করতে সক্ষম, তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন তাঁদের আসন্ন বিপদের কথা এবং সেই সঙ্গে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়ও। বিদুরকে নিশ্চিন্ত করে বললেন, বুঝেছি।

বারণাবতে পৌঁছলে পুরবাসীগণ মাতা কুন্তী ও পাণ্ডবদের সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাল। পুরোচন পূর্বেই বারণাবতে এসে পৌঁছেছেন। তিনি তাঁদের সকলকে মহাসমাদরে এক রাজভবনে বাসের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে দশদিন বাস করে পুরোচনের অনুরোধে মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবগণ বসবাসের জন্য নব নির্মিত গৃহে চলে এলেন। পুরোচন নূতন

গৃহের নামকরণ করেছেন 'শিব' যাতে কাহারও কোন সন্দেহ না জাগে।

নূতন বাসভবনে পৌঁছে যুধিষ্ঠির ঘৃত, চর্বি ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, পুরোচন তাঁদের পুড়িয়ে মারার জন্য দাহ্যপদার্থ দিয়ে এই ভবন দুর্যোধনের আদেশে নির্মাণ করিয়েছে। সব শুনে ভীম এস্থান পরিত্যাগ করতে বললেন। যুধিষ্ঠির রাজী হলেন না; বললেন, আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে জানতে পারলে পাপাত্মা পুরোচন আমাদের সকলকেই বলপ্রয়োগে পুড়িয়ে মারবেন। পালিয়ে গেলেও দুর্যোধনের চরদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই। সে জন্য পুরোচনের বিশ্বাস উৎপাদন করে আমরা এখানেই বাস করব। গোপনে এই জতুগৃহের ভূমিতে গর্ত তৈরী করে সেখানে অবস্থান করব। আর মৃগয়ার নামে চারিদিক ঘুরে পথঘাট সব চিনে রাখব। সব কিছুই অতি গোপনে সম্পাদন করতে হবে যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়।

যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্ত মত মাতা কুন্তী ও পাণ্ডবগণ পুরোচন-নির্মিত গৃহেই বাস করতে লাগলেন।

কয়েক দিন পর একজন খনক গোপনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে বলল, সে মহামন্ত্রী বিদুর কতৃক প্রেরিত হয়েছে পাণ্ডবদের হিতসাধনের জন্য। সে জানাল দুরাত্মা পুরোচন আগামী কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে পাণ্ডবদের বাসভবনে অগ্নি সংযোগ করবে বলে স্থির করেছে। নিজের বিশ্বস্ততার প্রমাণ হিসাবে সে বিদুরের উপদেশমত বারণাবতে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে বিদুরের ম্লেচ্ছ ভাষায় সর্তকবাণী শুনে যুধিষ্ঠিরের 'বুঝেছি' বাক্যটি উল্লেখ করল।

খনক ভবনমধ্যে পরিখা খনন স্থলে এক বৃহৎ গর্ত প্রস্তুত করল। গর্তের মুখে মাটির সমান সমান এমন একটি ঢাকনা নির্মাণ করল যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে। পাণ্ডবগণ দিনের বেলা বনে বনে মৃগয়া করে রাত্রিতে সুড়ঙ্গের মধ্যে বাস করতে লাগলেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হল। পুরোচন বুঝলেন পাণ্ডবগণ তাঁর অভিসন্ধির কোন আভাসই পান নি। তিনি অগ্নি সংযোগের স্থিরিকৃত দিনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তার পূর্বেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করে সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। নির্দিষ্ট দিনের রাত্রিতে মাতা কুন্তী ভবনে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণগণ বিদায় নিলে এক নিষাদ রমনী পঞ্চপুত্রের সহিত সেখানে উপস্থিত হল। মাতা কুন্তী তাদের উত্তম নৈশভোজে আপ্যায়িত করলেন। আহারান্তে নীষাদী পুত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান করে সেখানেই হতচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। গভীর রাত্রিতে অন্যান্য সকলে নিদ্রামগ্ন হলে যতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করে মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবগণ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নিরাপদ স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। দাহ্য পদার্থে নির্মিত ভবনটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। পুরোচন ও নিষাদী তার পঞ্চপুত্র

সহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল। পুরবাসীগণ জানত না নিষাদী পুত্রদের সঙ্গে সেখানে রাত্রিবাস করছিল। তারা মনে করল মাতা কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবই অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। পরে ছয়টি অগ্নিদগ্ধ কঙ্কাল গৃহমধ্যে পাওয়া গেলে মাতা কুন্তী ও পাণ্ডবদের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রইল না। গৃহের অন্যত্র আর একটি অগ্নিদগ্ধ কঙ্কাল পাওয়া গেলে উহা সকলে পুরোচনের বলে সাব্যস্ত করল। খনক ভস্মীভূত গৃহ পরিস্কার করার নামে সুড়ঙ্গপথটি এমন ভাবে বিনষ্ট করল যে তার অস্তিত্ব কেহই জানতে পারল না। খনকের আসল পরিচয়ও অজ্ঞাত রইল সকলের নিকট।

এদিকে সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে এসে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীসহ গঙ্গা তীরে পৌঁছলেন। সেখানে বিদুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর পূর্বেই একটি যন্ত্রচালিত নৌকা নিয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে বিদুর নির্দেশিত সাংকেতিক ভাষায় বাক্য বিনিময়ে পাণ্ডবদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাঁদের গঙ্গার অপর পারে পৌঁছে দিল। এই ভাবে তাঁদের অজান্তে ধার্তরাষ্ট্রগণের মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার সমস্ত চক্রান্তই যে কেবল ব্যর্থ হল তাই নয়, দুর্যোধন তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী পুরোচনকেও হারালেন।

যথাসময়ে জতুগৃহ দাহের ঘটনা হস্তিনাপুরে পৌঁছল। মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবগণ মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন জেনে কৌরবগণ কপট শোকে নিমগ্ন হলেন। বিদুরও লোক দেখানো অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে দুর্যোধন কর্তৃক সমাতৃক পাণ্ডুপুত্রদের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হল। বলা বাহুল্য, পরিকল্পনা 'সফল' হওয়ায় ধার্তরাষ্ট্রগণের আনন্দের সীমা রইল না।

যে কোন সাধারণ পর্যাপেক্ষকের নিকটও জতুগৃহ দাহের পরিকল্পনাটি অবাস্তব বলে মনে হবে। পাণ্ডবদের হত্যার জন্য বারণাবত নগরে দাহ্য পদার্থ দিয়ে নূতন একটি পৃথক ভবন নির্মাণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। বারণাবতে পৌঁছে যে ভবনে তাঁরা প্রথমে বাস করছিলেন সেখানে অগ্নিসংযোগ করেই কার্য সম্পাদন করা যেত। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল—সবই দুর্যোধন বা পুরোচনের ছিল। কার্যটি এখানে সম্পাদিত করা অসম্ভব বিবেচিত হলে অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করা যেত। জতুগৃহ দাহের পরিকল্পনাটি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের ফসল হতে পারে না। জতুগৃহ নির্মাণ একদিনেই সম্পন্ন হয় নি। এজন্য বেশ কিছু দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নিযুক্ত করতে হয়েছিল। ঘৃত, চর্বি, লাক্ষা ইত্যাদি নানা প্রকার দাহ্য পদার্থ সহ বহু উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল নির্মাণ কার্যের জন্য। এতে লোকের মধ্যে জানাজানি হয়ে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল, বিশেষত দাহ্য পদার্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। এ বিষয়ে ধার্তরাষ্ট্রগণের দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় না। দাহ্য পদার্থ দিয়ে নির্মিত নুতন গৃহ থেকে নির্গত কটু গন্ধ সন্দেহের উদ্রেক করবেই। হলও তাই। গৃহে

প্রবেশ করেই যুধিষ্ঠির দাহ্য পদার্থের গন্ধ পেয়ে দুর্যোধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। আশ্চর্য লাগে দুর্যোধন ও তাঁর পরামর্শদাতারা কী ভাবে এমন অবিবেচকের ন্যায় কাজ করলেন!

জতুগৃহদাহের ঘটনায় দুর্যোধন চরনীতির সঠিক প্রয়োগ করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। পাণ্ডব হিতৈষী মহামন্ত্রী বিদুরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বারণাবতে পাণ্ডবদের গতিবিধি ও তাঁদের সহিত যোগাযোগকারী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংবাদ রাখার চেষ্টা করা হয় নি। পাণ্ডবগণ জতুগৃহে এক বৎসর কাল বাস করেছিলেন। এই গৃহের উপর বিশেষ কোন নজরদারীর ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় না। অথচ এ কাজটি অতি জরুরী ছিল। উপযুক্ত নজরদারীর অভাবেই খনক বিদুরের বার্তা নিয়ে গোপনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হয়েছিল। খনক কর্তৃক জতুগৃহ থেকে সুড়ঙ্গ নির্মাণ বিষয়ে পুরোচনের কোন ধারনাই ছিল না। এ কথা সত্য, খনক অতি সংগোপনে খনন কার্য সম্পাদন করছিল। কিন্তু ও কাজে তাঁর সময়ও লেগেছিল বেশ কিছুদিন। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এ সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল না। পুরোচনের মনে সন্দেহ জাগা উচিত ছিল, পাণ্ডবগণ যাদের বলবীর্য ও বুদ্ধিমত্তার তুলনা নেই, কোন উপায়ে জতুগৃহ থেকে পলায়ন করতে পারেন। সে সন্দেহ দূরদর্শিতার অভাবে তার মনে কখনই জাগে নি। বিদুর কর্তৃক সুদূর হস্তিনাপুর হতে প্রেরিত চরদ্বারা পাণ্ডবদের গঙ্গার অপর পারে নিয়ে যাওয়ার সংবাদও দুর্যোধনের নিকট অজ্ঞাত রইল। অথচ এ সব বিষয়ে গুপ্তচর মারফত পূর্ব সংবাদ সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মনে হয় দুর্যোধনের প্রতি-সংবাদ সংগ্রহ (counter intelligence) ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। তিনি পুরোচন দ্বারা দাহ্য পদার্থ দিয়ে পাণ্ডবদের বাসগৃহ নির্মাণ করেই তাঁদের অগ্নিদগ্ধে মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এর চেয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় আর কী হতে পারে? পরিকল্পনা বহির্ভূত পথে অন্য কিছু ঘটার সম্ভাবনা বিষয়ে দুর্যোধন সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন এবং সে জন্য সম্ভাব্য নূতন পরিস্থিতির মোকাবিলায় কোন উপায় অবলম্বনের কথা তিনি চিন্তাই করেন নি। এর ফলেই বিদুর কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা সমূহ বিনা বাধায় সম্পন্ন হতে পেরেছিল।

আরও কয়েকটি বিষয়ে ধার্তরাষ্ট্রগণের গুরুতর বিচ্যুতি ঘটেছিল। ভস্মীভূত জতুগৃহ হতে সর্বসমেত সাতটি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে পুরোচনের একটি। জতুগৃহের বহির্বাটীতে পুরোচন বাস করত। কঙ্কালটি সেখানেই পাওয়া যায়। ঘটনার পর পুরোচনকে কোন স্থানেই দেখা যায় নি। এতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় কঙ্কালটি পুরোচনেরই। বাকী ছয়টি কঙ্কাল কাদের সে সম্বন্ধে ভালভাবে তদন্ত না করেই পুরবাসীগণ সেগুলিকে মাতা কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের বলে মনে করল এবং সেইমত সংবাদ রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রেরণ করা হল। ধার্তরাষ্ট্রগণ সহজেই তা বিশ্বাস করে

নিলেন। বিশেষজ্ঞ দিয়ে কঙ্কালগুলির কোনরূপ পরীক্ষা করান হল না। নিষাদরা খর্বাকৃতি। অন্যদিকে পাণ্ডবগণ ছিলেন দীর্ঘদেহী। কঙ্কালগুলির ভালভাবে পরীক্ষা হলে এই পার্থক্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহ অনায়াসে নির্ধারিত হত এবং এগুলি যে মাতা কুন্তী ও পাণ্ডবদের নয় সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। ভস্মীভূত জতুগৃহ ও তার সন্নিহিত এলাকা যত্নসহকারে অন্বেষণ করলে সুড়ঙ্গ নির্মাণের চিহ্ন খনিক কর্তৃক নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উহার কিছু না কিছুর অস্তিত্ব নজরে পড়া অসম্ভব ছিল না। কারণ খনকের হাতে সময় ছিল অল্প। সুড়ঙ্গ নির্মাণের সবরকম প্রমাণ এই অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস করা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্ত থেকে মাতা কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব হেঁটে গঙ্গার পার পর্যন্ত এসেছিলেন। পথে তাঁদের পদচিহ্ন নিশ্চয়ই ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এ সম্বন্ধে কোন তদন্তই হয় নি। গৃহের মেঝেতে সুড়ঙ্গের প্রবেশ মুখের চিহ্ন পাওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তা কারও চোখে পড়ল না। ধার্তরাষ্ট্রগণের অপদার্থতার যেন কোন সীমা নেই।

জতুগৃহ দাহের ঘটনায় আমরা বিদুরকে একজন দক্ষ গোয়েন্দার ভূমিকায় দেখতে পাই। গঙ্গায় জলক্রীড়ার সময় ভীমকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টার মধ্যে তিনি ধার্তরাষ্ট্রগণের বিশেষ করে দুর্যোধনের পাণ্ডব বিরোধী মনোভাবের এক নগ্নরূপ দেখতে পান। কোনরূপ সন্দেহ যাতে না জাগে সেজন্য তাঁর নির্দেশে পাণ্ডবগণ তখন সমস্ত ঘটনাই গোপন রাখেন। বিদুর নিশ্চিত ছিল ধার্তরাষ্ট্রগণ অচিরেই নূতন কোন চক্রান্ত করবেন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে। সে জন্য তিনি পরিস্থিতির উপর সতর্কদৃষ্টি রাখছিলেন। যখন ধার্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসনের প্রস্তাব করল তখন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের মারফত তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারা, তাহা জানতে পারলেন। তিনি প্রকাশ্যে প্রস্তাবের বিপক্ষে কোন মত প্রকাশ করলেন না। উদ্দেশ্য ধার্তরাষ্ট্রদের সন্দেহমুক্ত রাখা পাণ্ডবদের সম্বন্ধে। বারণাবতে রওনা হবার প্রাক্কালে সাংকেতিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দিলেন তাঁদের আসন্ন বিপদের কথা ও জীবন রক্ষার উপায়। খনককে পাঠিয়ে জতুগৃহ থেকে সুড়ঙ্গ কেটে মাতা কুন্তী ও পাণ্ডবদের উদ্ধার করলেন। জতুগৃহ ধ্বংস হল পাণ্ডবদের আগুনেই। আর মৃত্যু হল দুর্যোধনের বিশ্বস্ত অনুচর পাপাত্মা পুরোচনের। যতই অনৈতিক হোক নিষাদী ও তার পাঁচপুত্রের মৃত্যু ধার্তরাষ্ট্রগণকে ভুল পথে চালিত করে পাণ্ডবদের পলায়ন নিরাপদ করেছিল। তা না হলে দুর্যোধনের চরদের হাতে পাণ্ডবদের জীবন বিপন্ন হতে পারত। বিদুর আর এক অনুচর দ্বারা মাতা কুন্তী ও পাণ্ডবদের নৌকা যোগে গঙ্গার অপর পারে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। বিদুরের পরিকল্পনাটি নিখুঁত ছিল; সম্পাদিতও হয়েছিল পরিচ্ছন্নভাবে। কোন অবস্থাতেই কোন বাধার সৃষ্টি হয় নি। পাণ্ডবদের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলে বিদুরের অভিনয় সময়োপযোগী হয়েছিল।

জতুগৃহ দাহের ঘটনা চরনীতি ও মন্ত্রণা সংগুপ্তির সহিত শঠে শাঠ্যং নীতির এক বিরাট সাফল্যের নিদর্শন। মহাজ্ঞানী বিদুরই এই সাফল্যের প্রধান দাবিদার। বিদুরের উপদেশ পুঙ্খপুঙ্খানুরূপে পালন করে মৃত্যুর হাতছানি থেকে নিজেদের রক্ষার মধ্যে যুধিষ্ঠির যে স্থৈর্য, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তাও কম প্রশংসনীয় নয়। বস্তুত বিদুরের পরিকল্পনার সফল পরিণতি যুধিষ্ঠিরের সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। সুযোগ্য বীর ভ্রাতাদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা যে তাঁর কাজকে সহজ করে তুলেছিল তা বলাই বাহুল্য।

গঙ্গার এ পারে এসে মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবগণ এক গভীর বনে প্রবেশ করলেন। সেখানেও তাঁদের সতর্কতার অভাব ছিল না। দুর্যোধনের চরগণ যে তাঁদের অনুসরণ করতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা সর্বদা সজাগ ছিলেন। বনবাস কালে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ভীমকে আক্রমণ করলে সে ভীমের হাতে নিহত হয়। হিড়িম্বর ভগিনী হিড়িম্বা ভীমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে স্বামীরূপে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তার আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে মাতা কুন্তী এই বিপদে সম্মতি দিলে দুজনের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বার গর্ভজাত ঘটোৎকচ নামে ভীমতুল্য এক মহাবলশালী পুত্র পাণ্ডবদের সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করল।

নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে পাণ্ডবগণ জটা বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করে তপস্বীর বেশে নানা দেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে পিতামহ ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা হল। তিনি পাণ্ডবদের ছদ্মবেশে থাকতে বললেন। পরে তাঁরা ব্যাসদেবের নির্দেশে একচক্রানগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন।

এক-চক্রানগরের নিকটস্থ বনে বকরাক্ষস নামে এক রাক্ষসের বাস। সেই এই নগর শাসন করত। পালা ক্রমে একজন লোক মহিষ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বক রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হত এবং বকরাক্ষস তাদের হত্যা করে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত তাদের মাংস আহার করত। একদিন পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের পালা এলে পরিবারের সকলে আর্তনাদ করে উঠল। মাতা কুন্তী সব শুনে ব্রাহ্মণ ও তাঁর পরিবারের সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন, আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে একজন রাক্ষসের নিকট যাবে এবং তাকে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে নিরাপদে ফিরে আসবে। আমার পুত্র বীর্যবাণ, মন্ত্রসিদ্ধ ও তেজস্বী। কিন্তু এ কথা কাহাকেও প্রকাশ করবেন না।

মাতা কুন্তীর আদেশে মধ্যম পাণ্ডব ভীম খাদ্যাদি নিয়ে বক রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হলে দুজনের মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে বক রাক্ষসকে হত্যা করে ভীম তার মৃতদেহ নগরের দ্বার দেশে ফেলে গোপনে বাহ্মণের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবদের নির্দেশে ব্রাহ্মণ নগরবাসীদের মধ্যে প্রচার করলেন তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ

হয়ে এক মন্ত্রসিদ্ধ মহাত্মা বক রাক্ষসকে হত্যা করেছেন।

এইভাবে ভীম ও অন্যান্য ভ্রাতাদের প্রকৃত পরিচয় সকলের নিকট অজ্ঞাত রইল। ব্রাহ্মণের রটনাই পুরবাসীগণ বিশ্বাস করল। মন্ত্রণা সংগুপ্তির নীতিসমূহ পাণ্ডবগণ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের এ কাজ সহজ হয়েছিল যেহেতু জতুগৃহ ভস্মীভূত হওয়ার পর তাঁদের গতিবিধির উপর কোনই নজরদারি ছিল না। হিড়িম্ব ও বক রাক্ষস সম্ভবত অত্যাচারী কোন ভূম্যাধিকারী ছিলেন। এদের মৃত্যু নিশ্চয়ই স্থানী জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কে তাদের ন্যায় বলশালীদের হত্যা করতে পারে সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিচক্ষণ গুপ্তচর এ রহস্যের সমাধান করতে পারত এবং ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয়ও প্রকাশ পেত। ধার্তরাষ্ট্রগণের ব্যর্থতায় পাণ্ডবগণ নিশ্চিত বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন। কৌরবদের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের সাফল্য অব্যাহত রইল।

একচক্রানগরে বাস করার সময় পাণ্ডবগণ জানতে পারলেন পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠিত হবে। সেই সময় পিতামহ ব্যাসদেব পুণরায় সেখানে উপস্থিত হয়ে জানালেন মহাদেবের বরে দ্রৌপদীর পঞ্চপতি লাভ হবে। তিনি পাণ্ডবদের পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে পেতে উপদেশ দিলেন। সেইমত মাতা কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডব পাঞ্চাল রাজ্যে এসে ভার্গব নামে এক কুম্ভকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তাঁরা নিজেদের ব্রহ্মচারী বলে পরিচয় দিয়ে ভীক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণের বেশে পঞ্চপাণ্ডব স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত আসনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁরা দেখলেন দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতাগণ, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি বহু পাণীপার্থী রাজা নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে নিজ নিজ আসনে আসীন আছেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের বাসনা ছিল তিনি নিজ দুহিতা দ্রৌপদীকে পাণ্ডুতনয় শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের হাতে সমর্পণ করবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁর আদেশে উপযুক্ত বাণ সহ এক সুদৃঢ় ধনু নির্মিত হল। আর শূন্যে স্থাপিত হল এক লক্ষ্যবস্তু ছিদ্রযুক্ত ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের উপর। ঘোষণা করা হল যিনি ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বাণ চালিয়ে লক্ষ্য বস্তুকে পরপর পাঁচবার বিদ্ধ করতে পারবেন তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করবেন। পাঞ্চাল রাজের বিশ্বাস ছিল অর্জুন ভিন্ন অন্য কেউই এই দুরুহ কাজটি সম্পাদন করতে পারবেন না।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনী দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলেন। তিনি স্বয়ংবর সভার শর্তাবলী ঘোষণা করে উপস্থিত রাজন্যবর্গকে আহ্বান করলেন লক্ষ্য ভেদে অগ্রসর হতে। দুর্যোধনাদি বহু রাজা লক্ষ্য ভেদ করা তো দূরের কথা ধনুতে জ্যা পর্যন্ত আরোপণ করতে সক্ষম হলেন না।

অবস্থা দেখে অনেকে ধনুর ধারে কাছেও গেলেন না। কর্ণ তখন অগ্রসর হয়ে ধনুতে জ্যা আরোপণ করে যেই লক্ষ্যে বাণ নিক্ষেপ করবেন তখনি দ্রোপদী ঘোষণা করলেন তিনি সূতপুত্রকে স্বামীত্বে বরণ করবেন না। কর্ণ ধনু নামিয়ে রেখে নিজ আসনে চলে এলেন। উপস্থিত সকল রাজন্যবর্গ লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হলে সভাস্থ অন্যান্যদের আহ্বাণ করা হল লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হতে। ব্রাহ্মণ বেশী অর্জুন অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হলেন। দ্রৌপদী অর্জুনের গলায় বরমাল্য পরালে উপস্থিত রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণদের উপর আক্রমনোদ্যত হলেন। কর্ণ অর্জুনকে এবং মদ্ররাজ শল্য ভীমকে আক্রমণ করলেন। কর্ণ অর্জুনকে চিনতে না পেরে তাঁকে বিপ্রশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে তাঁর শরনিক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অর্জুন নিজেকে একজন ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি তাঁর গুরুর নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেছেন। এই বলে অর্জুন শর নিক্ষেপ করে কর্ণের ধনু ভেঙ্গে ফেললেন। ভীমও মল্লযুদ্ধে শল্যকে পরাজিত করলেন। কৃষ্ণ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের চিনতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণ অগ্রসর হয়ে রাজাদের বললেন এঁরা ধর্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। তাঁরা তখন নিবৃত হলেন।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে নিজেদের বাসস্থানে ফিরে এসে মাতা কুন্তীকে বললেন তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন। দ্রৌপদীকে না দেখেই কুন্তী পুত্রদের 'যা এনেছ তা সকলে ভাগ করে নাও' এই বাক্য উচ্চারণ করলেন। মাতৃবাক্য বৃথা হয় না। যুধিষ্ঠির বুঝলেন দ্রৌপদী তাঁদের সকলেরই ভার্যা হবেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ বলরাম পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন জতুগৃহ দাহ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তাঁদের সমৃদ্ধি কামনা করে গোপনে থাকতে বলে কৃষ্ণ ও বলরাম বিদায় নিলেন। পরে পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেলে ব্যাসদেবের মধ্যস্থতায় তাঁদের সকলের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন হল।

স্বয়ংম্বর সভায় ধার্তরাষ্ট্রগণ ব্রাহ্মণ বেশী পঞ্চপাণ্ডবদের চিনতে পারেন নি। তাঁরা জতুগৃহদাহে পাণ্ডবদের মৃত্যু সম্বন্ধে এতই দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন যে স্বয়ংম্বর সভায় তাঁদের উপস্থিতির সম্ভাবনার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। লক্ষ্য ভেদ করা ও পরে রাজন্যবর্গের বাধাদান বিনষ্ট করে দ্রৌপদীকে স্বয়ংম্বর সভা থেকে উদ্ধার করা যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পক্ষে কী ভাবে সম্ভব হতে পারে সে বিষয়ে ধার্তরাষ্ট্রগণের কিছুটা সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু তাঁরাই যে পঞ্চপাণ্ডব সে কথা ঘৃণাক্ষরেও ধার্তরাষ্ট্রগণের মনে উদয় হয় নি। দ্রৌপদীর বিবাহের পর গুপ্তচর মারফত তাঁরা জানতে পারলেন ব্রাহ্মণদের প্রকৃত পরিচয়। তাঁরা জানলেন যে ব্রাহ্মণ লক্ষ্যভেদ করেছেন ও কর্ণকে পরাজিত করেছেন তিনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন; আর যিনি মদ্ররাজ শল্যকে পরাজিত করেছেন তিনি দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম। গুপ্তচরগণ পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে

দ্রৌপদীর বিবাহের সংবাদও তাঁদের জানাল। এই সংবাদ পেয়ে সকলে বুঝতে পারলেন জতুগৃহ দাহে পাণ্ডবদের জীবন নাশ হয় নি। তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই ঘটনা দুর্যোধনের চরদের আরও একটি বড় ব্যর্থতার সাক্ষ্য। তারা পাণ্ডবদের গতিবিধি, একচক্রানগরে অবস্থান ও স্বয়ংম্বর সভায় যোগদান প্রভৃতি কোন সংবাদই পূর্বে সংগ্রহ করতে পারে নি। স্বয়ংম্বর সভায় ব্রাহ্মণদের শৌর্যবীর্য দেখেও তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে চরদের কোন সন্দেহ জাগে নি, এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে? অথচ এই সব গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহই তাদের প্রধান কর্তব্য। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের প্রকৃত পরিচয় পূর্বে জানতে পারলে দুর্যোধনের পক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে নূতন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হত।

অন্যদিকে পাণ্ডবদের সতর্কতার অভাব ছিল না। সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন; ব্রাহ্মণদের ছদ্মবেশ ত্যাগ করেন নি। কর্ণের সঙ্গে শর যুদ্ধের সময় অর্জুন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করেছিলেন। স্বয়ংম্বর সভায় কৃষ্ণের অভিনয় সঠিক হয়েছিল। তিনি পাণ্ডবদের চিনতে পেরেও তখন তা প্রকাশ করেন নি। স্বয়ংম্বর অনুষ্ঠানের পরও তিনি পাণ্ডবদের নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন; কারণ বিপদের আশঙ্কা তখনও দূর হয় নি। পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে পাঞ্চাল রাজ যখন নিজ কন্যা দ্রৌপদীকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করলেন তখনই তাঁরা বিপন্মুক্ত হলেন। তখন পাণ্ডবগণ আর সহায়হীন নন। সকল পাঞ্চালরাজ্যের শক্তি এখন তাঁদের পিছনে। শক্তিধর পাণ্ডবগণ তাঁর সহায় হওয়ায় পাঞ্চালরাজেরও আর কোন আশঙ্কা রইল না শত্রুদের থেকে। পাণ্ডবদের মন্ত্রণা সংগুপ্তিই এই সফল পরিণতির প্রধান কারণ। জতুগৃহের মরণ ফাঁদ থেকে উদ্ধার পেয়ে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করে আজ পাঞ্চালরাজের অতি আপন জন। এখানে পাণ্ডবদের আরও একটি বড় লাভ হল। তা হল কৃষ্ণের সখ্যতা। এখন থেকে কৃষ্ণই হলেন পাণ্ডবদের প্রধান সহায় ও উপদেষ্টা। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল কুলের ঐক্যতার মধ্যে এক নূতন শক্তিকেন্দ্রের উদ্ভব হল। পরে এই শক্তিকেন্দ্র অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল কৃষ্ণ ও মৎসকুলের সক্রিয় সহযোগিতায়। পরবর্তী ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি প্রভাবিত করতে এই সম্মিলিত শক্তিকেন্দ্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

দ্রৌপদী লাভে বঞ্চিত হয়ে দুর্যোধন ভ্রাতা ও অন্যান্যদের সঙ্গে অতি বিষন্ন মনে হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে পাঞ্চালরাজ ও তাঁর যুদ্ধবিশারদ পুত্রদের সংযুক্তিতে তাঁদের মনে সাতিশয় ভীতির সঞ্চার হল। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংকল্প সকলও শিথিল হয়ে পড়ল।

এদিকে স্বয়ংম্বর সভার সমস্ত ঘটনাবলী জ্ঞাত হয়ে বিদুরের আনন্দের সীমা নেই।

তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যঙ্গচ্ছলে বললেন কৌরবেরাই বিজয়লাভ করেছেন। এতে ধৃতরাষ্ট্রের ধারণা হল পুত্র দুর্যোধনই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। তিনি আদেশ দিলেন এখনই যেন দুর্যোধন সালংকারা দ্রৌপদীকে তাঁর নিকট উপস্থিত করেন। যখন বিদুর জানালেন পঞ্চপাণ্ডব বরমাল্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন তখন ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মনের ভাব গোপন রেখে বাইরে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন স্বীয় পুত্রদের চেয়ে তিনি পাণ্ডুপুত্রদেরই বেশী স্নেহ করেন। পাণ্ডুপুত্রদের হাতে তাঁর 'দুরাত্মা' পুত্রদের নিস্তার নেই সে অভিমতও প্রকাশ করলেন।

অতঃপর দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, এখন শত্রুপক্ষের স্তুতিবাদ করার সময় নয়; তাঁদের যাতে দমিত রাখা যায় সেই উপায় উদ্ভাবন করাই এখন প্রধান কর্তব্য। দুর্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন। বললেন-বিদুর যাতে তাঁদের অভিসন্ধি না বুঝতে পারেন সে জন্যই তিনি তাঁর সম্মুখে পাণ্ডবদের প্রশংসা করে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে দুর্যোধন তখন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের উপায়গুলি ব্যাখ্যা করলেন। এগুলি হল—(১) বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে কুন্তীর (পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী) তিন পুত্রের সহিত মাদ্রীর (পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী) দুই পুত্রের বিভেদ সৃষ্টি করা, (২) পাঞ্চালরাজ, তাঁর পুত্র ও অমাত্যবর্গকে বহু ধনরাশি প্রদান করে বশীভূত করা; উদ্দেশ্য তাঁরা যেন যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন অথবা পাণ্ডবদের যেন পাঞ্চাল রাজ্যেই বাস করতে প্রভাবিত করেন। তাঁদের যেন কোন অবস্থাতেই হস্তিনাপুরে আসতে না দেওয়া হয়। এর ফলে পাণ্ডবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা পাঞ্চাল রাজ্যেই থেকে যাওয়া সমীচীন মনে করবেন। (৩) উপায় নিপুন ব্যক্তিদ্বারা কুন্তীর তিন পুত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, (৪) বহুপতিত্বের নানা দোষ উল্লেখ করে দ্রৌপদীর মন বিষিয়ে দেওয়া, (৫) দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা, (৬) ছদ্মবেশী আততায়ী দ্বারা ভীমের জীবন নাশ করা। ভীমই পাণ্ডবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান। অর্জুন ভীমের সাহসেই ধার্তরাষ্ট্রদের অবজ্ঞা করেন। ভীম নিহত হলে পাণ্ডব পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন তাঁরা রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরুৎসাহ বোধ করবেন। (৭) পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করে কৌরবদের নির্দেশমত চললেও তাঁদের সুযোগমত বিনষ্ট করে ফেলা। (৮) সুন্দরী নারী প্রেরণ করে পাণ্ডবদের প্রলোভিত করা যাতে দ্রৌপদীর মন তাঁদের প্রতি বিরুপ হয়ে উঠে। (৯) কর্ণকে পাঠিয়ে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর আনয়ন করে কোন উপায়ে তাঁদের হত্যা করা।

দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন উপায়গুলির মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় সেইটি প্রয়োগ করতে। কর্ণকেও উপায়গুলি বিবেচনা করতে বললেন।

কর্ণ বললেন, দুর্যোধন, কৌশলদ্বারা পাণ্ডবদের বিনষ্ট করা নিরর্থক। পূর্বেও বহু উপায় দ্বারা তাঁদের নিগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। পাণ্ডবগণ সহায়সম্বলহীন অবস্থায় হস্তিনাপুরেই ছিলেন; তখন তুমি তাঁদের কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হও নি। এক্ষণে তাঁরা পাঞ্চালরাজের সহায়তায় বলীয়ান হয়ে তাঁরই রাজ্যে বাস করছেন। আমার মনে হয় তোমার বর্ণিত উপায়গুলি দ্বারা তাঁদের কোনই ক্ষতি করা যাবে না। নিশ্চয় করে বলা যায় কোন প্রকার প্রলোভনেই তাঁদের মন কলুষিত হবে না। যাঁরা এক পত্নীতে অনুরক্ত তাঁদের ভ্রাতৃপ্রেম গভীর হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্য তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সহজ ব্যাপার নয়। আর দ্রৌপদীও পাণ্ডবদের হীনাবস্থা জেনেই তাঁদের পতিত্বে বরণ করেছেন। এখন তিনি প্রলোভনের বশে তাঁদের প্রতি বিরূপ হবেন তা ভাবা যায় না। বিশেষতঃ বহুপতি লাভ নারীদের অতীব কাম্য। দ্রৌপদী সেই ঈপ্সিত বস্তুলাভ করেছেন বলতে গেলে বিনা চেষ্টায়। মনে হয় কোন কিছুতেই পতিদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষভাব আসবে না। পাঞ্চালরাজ ধার্মিক ও নির্লোভ। কোন অর্থের প্রলোভনেই তিনি নিজ জামাতা পাণ্ডবদের পরিত্যাগ করবেন না। পাঞ্চাল রাজপুত্রগণ গুণবাণ ও পাণ্ডবদের প্রতি অনুরক্ত। তাঁরাও সব সময় তাঁদের সঙ্গেই থাকবেন। এমতাবস্থায় কোন বিশেষ উপায় দ্বারা যে পাণ্ডবদের বিনষ্ট করা সম্ভব হবে তা মনে হচ্ছে না।

এরপর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে কর্ণ বললেন, তাত, পাণ্ডবগণ এখনও রাজ্যহীন ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল। পাঞ্চালরাজও তেমন শক্তিশালী নন। কৃষ্ণের নেতৃত্বে দুর্দ্ধর্ষ যাদব বাহিনী এখনও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদেব পক্ষে যোগদান করে নি। এখনই পাঞ্চাল-পাণ্ডবদের উপর আক্রমণের প্রকৃষ্ট সময়। শত্রুপক্ষ দুর্বল থাকতেই তাকে আক্রমণ করা উচিত। পাণ্ডবদের প্রতি সাম, দান ও ভেদ নীতি প্রযুক্ত হলেও নিষ্ফল হবে। কেবল সম্মুখ সমরেই তাঁদের পরাজিত করা সম্ভব।

দুর্যোধন ও কর্ণের প্রস্তাব সমূহ ধৃতরাষ্ট্র মন দিয়ে শুনলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। তিনি এ বিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও বিদুরের সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পাণ্ডব দমনে দুর্যোধন—বর্ণিত উপায়গুলি যে বাস্তববুদ্ধিসম্মত নয় তা সহজেই অনুমেয়। যাঁদের বিরুদ্ধে উপায়গুলি প্রয়োগ করা হবে তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল সংবাদ সংগ্রহ করা উচিত ছিল। দুর্যোধনের সে ধৈর্য ছিল না। এমন কি তিনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের বিশ্বস্ত সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করলেন না। পাণ্ডবভ্রাতাদের ঐক্যবদ্ধতা, পাঞ্চালরাজের লোভহীনতা ও দ্রৌপদীর পতিপরায়ণতা সম্বন্ধে দুর্যোধনের সম্যক উপলব্ধি ছিল না। তিনি প্রধানতঃ অর্থের প্রলোভনে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থ দিয়ে

যে সব সময় কাজ হয় না তা তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে উপায়ের তারতম্য স্থির করতে অক্ষম হয়েছিলেন। সে দিক থেকে বিচার করলে কর্ণের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। তিনি দুর্যোধনের উপায়গুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল। কারণ শত্রুপক্ষ তখনও তেমন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। সম্মিলিত কৌরব বাহিনীর নিকট তাদের পরাজয় অসম্ভব নয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নৈতিকতার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর রাজ্যের যুবরাজ। তাঁর ও তাঁর ভ্রাতাদের এই রাজ্যের উপর বৈধ অধিকার আছে। তাঁরা এ পর্যন্ত কৌরবদের কোন বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। বরঞ্চ কৌরবপক্ষই নানা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁদের বারণাবত নগরে নির্বাসিত করে জতুগৃহ দাহে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে পাণ্ডবগণ নিজ শক্তিবলে পাঞ্চালরাজ দুহিতা দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। এখন প্রকাশ্য যুদ্ধে তাঁদের বিনষ্ট করার চেষ্টা কেবল ন্যায়নীতি বিরুদ্ধই নয়, বর্বরোচিতও।

ন্যায়সঙ্গত কারণেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম কর্ণের যুদ্ধপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করে পাণ্ডবদের অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের প্রস্তাব করলেন। দ্রোণাচার্য, বিদুর প্রভৃতি অন্যান্য গুরুজনরা ভীষ্মের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানালেন। এ নিয়ে কর্ণের সহিত অন্যান্যদের নানা বাগবিতণ্ডা সংগঠিত হল। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঞ্চালরাজ্যে পাঠিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রদের মহাসমাদরে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন। কৌরবপক্ষের আবার হার হল। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাদের অবসান কল্পে ধৃতরাষ্ট্র পিতামহ ভীষ্মের প্রস্তাব মত হস্তিনাপুর রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করে পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থ নামক স্থানে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন।

।। চার ।।

পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে বহু সৌধসমন্বিত স্বর্গধামতুল্য এক নগর স্থাপন করলেন। কৃষ্ণের প্রস্তাবমত নগরের নাম করণ হল ইন্দ্রপ্রস্থ। একদিন দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করে নিভৃতে পাণ্ডবদের বললেন, বৎসগণ, তোমরা এমন নিয়ম কর যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয়। তখন পাণ্ডবগণ নিয়ম করলেন দ্রৌপদী এক ভ্রাতার গৃহে এক বৎসর অবস্থান করবেন এবং এই সময়ের মধ্যে যদি অন্য কোন ভ্রাতা তাঁদের দৃষ্টিগোচরে আসেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বার বৎসর

বনবাসে অতিবাহিত করতে হবে।

একদিন দস্যু কর্তৃক উৎপীড়িত ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য অর্জুন অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির যে গৃহে বাস করতেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এতে স্বীকৃত নিয়ম ভঙ্গ হলে তিনি বার বৎসরের জন্য বনে গমন করলেন। এই বনবাসের সময় অর্জুন নাগরাজ কন্যা উলুপী, মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও বাসুদেব কন্যা কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অর্জুন ভ্রাতাদের মধ্যে গৃহীত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করলেন সত্য; কিন্তু এই বিবাহের ফলে পাণ্ডবদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল বহুল পরিমানে। যাদব কুলের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়ে তাঁদের মিত্রবর্গও তাঁদের সহায় হলেন। বার বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এদিকে দানব স্থপতি মহাশিল্পী ময়দানব খাণ্ডবদাহের (অগ্নির অনুরোধে অর্জুন কর্তৃক অগণিত বন্যপ্রাণীসহ খাণ্ডব বন অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়) সময় অর্জুনদ্বারা জীবন রক্ষা পেয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইন্দ্রপ্রস্থে এক ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মনিময় সভাগৃহ নির্মান করেন। বহু ধুমধাম সহকারে পূজাদি সম্পন্ন করে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে এই নবনির্মিত সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

দেবর্ষি নারদ পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, সুরক্ষা, চরনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় প্রশ্নোচ্ছলে বুঝিয়ে বললেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির নারদ বর্ণিত উপদেশসমূহ অনুসরণ করে রাজকার্যে মন দিলেন। অচিরেই সমগ্র রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হল। যুধিষ্ঠিরকে প্রজাসাধারণ পিতার ন্যায় ভক্তি করতে লাগল। তাঁর আর কোন শত্রু রইল না। তিনি অজাতশত্রু বলে খ্যাত হলেন। যুধিষ্ঠিরের সস্নেহ ব্যবহার, ভীমসেনের প্রজাপালন, অর্জুনের শত্রুদমন, সহদেবের ধর্মানুশাসন এবং নকুলের স্বাভাবিক নম্রতা জনপদে সকল ভয়ভীতি দূর করল। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ফলে রাজ্যে অর্থলগ্নি, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হল। প্রজাসাধারণের সহযোগিতার কারণে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাপীড়ণ বন্ধ হল চিরদিনের জন্য। দুর্নীতিমুক্ত রাজকর্মচারীসকল জনসেবায় আত্মনিয়োগ করল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে দস্যু তস্করাও নিজেদের কুকার্য পরিত্যাগ করে নানা হিতকর কাজে যোগদান করতে লাগল। সকল প্রকার রাজদ্রোহিতার অবসান হয়ে অধিকৃত রাজ্যসমূহে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে এল।

সহজেই অনুমেয় যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাগণ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। এ জন্য তাঁদের নানা উপায়ে ভালমন্দ সব বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে হত। চর নিয়োগ ছিল এর মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান উপায়। বিশ্বস্ত

গুপ্তচরগণ নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সংবাদ সংগ্রহ করে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করত। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের বিশেষ করে ভীমসেন ও অর্জুনের সহায়তায় সংগৃহীত সংবাদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। বহু ক্ষেত্রে প্রজাসাধারণ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত সংবাদ রাজা বা তাঁর প্রতিনিধির গোচরে আনতেন। উচ্চ মনোবল সম্পন্ন গুপ্তচরদের কাজকর্মে বিচ্যুতি ছিল না বললেই চলে। তাদের কার্যাদির তদারকি ব্যবস্থাও ছিল উন্নতমানের। অবশ্য সবই সম্ভব হয়েছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নীতিপরায়ণতার জন্য, যার মূল কথা ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

রাজ্যের সমৃদ্ধি দর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সার্বভৌমোচিত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বাসনা করলেন। ভ্রাতা, মন্ত্রী ও পণ্ডিতদের মতামত গ্রহণ করে তিনি কৃষ্ণকে দ্বারাবতী নগর হতে আনয়ন করে এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ সব শুনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত গুণাবলীই আপনার মধ্যে বিদ্যমান; কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বাধা আছে। বৃহদ্রথপুত্র মগধরাজ জরাসন্ধ এখন অতি পরাক্রান্ত। বহু রাজাকে তিনি নিজবশে আনয়ণ করেছেন। মধ্যভারতের প্রতাপশালী চেদিরাজ শিশুপাল তাঁর জামাতা ও সেনাপতি। পূর্বাঞ্চলে শোণিতপুরের বাণ, পুণ্ড্ররাজ্যের বাসুদেব প্রভৃতি প্রতাপশালী নৃপতিগণ তাঁর মিত্র। আমিও জরাসন্ধের ভয়ে জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পশ্চিমে পালিয়ে এসে দুর্গম পর্বত সঙ্কুল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। জরাসন্ধ মহাদেবের বরে ছিয়াশিজন রাজাকে বন্দী করে রেখেছেন এবং আর চৌদ্দজন রাজাকে পেলেই সকলকে বলিদান দিয়ে এক পাশবিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। আমার মনে হয় প্রথমে জরাসন্ধকে বধ না করে আপনার রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত হবে না।

কৃষ্ণের কথা শুনে ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই অতি বলশালী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হন না। জরাসন্ধকে তাই কৌশলে হত্যা করতে হবে। আমরা ছদ্মবেশে জরাসন্ধের প্রাসাদে প্রবেশ করব এবং তাঁকে একাকী পেয়ে হত্যা করব।

এরপর কৃষ্ণ জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে বললেন, মগধরাজ বৃহদ্রথ কাশীরাজের যমজ দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বহুদিন গত হলেও তিনি পুত্রলাভে বঞ্চিত রইলেন। এমন সময় গৌতমপুত্র চণ্ডকৌশিক মুনি মগধরাজ্যে আগমন করলে মহারাজ বৃহদ্রথ তাঁকে বিবিধ উপহারে পরিতুষ্ট করেন। রাজা নিঃসন্তান জেনে দয়াপরবশ হয়ে চণ্ডকৌশিক মুনি একটি মন্ত্রপূত আম্রফল তাঁকে প্রদান করে বললেন তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আম্রফলটি দুভাগ করে দুই মহিষী ভক্ষন করে গর্ভবতী

হলেন। যথাসময়ে তাঁরা দুজনে এক চক্ষু, এক বাহু, এক পদ ও অর্দ্ধমুখ ও নিতম্ববিশিষ্ট দুটি শরীর খণ্ড প্রসব করলেন। এরূপ অদ্ভুতদর্শন শরীরখণ্ড দেখে মহিষীরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হলেন এবং তাঁদের আদেশে ধাত্রিরা এগুলিকে বাইরে ফেলে দিল। এমন সময় জরা নামে এক রাক্ষসী যেই শরীরখণ্ড দুটিকে সংযুক্ত করল অমনি এক মহারণ-পরাক্রান্ত রাজকুমার উৎপন্ন হল। নবজাত শিশু সজল মেঘের ন্যায় গর্জন করে কাঁদতে লাগল। সংবাদ পেয়ে রাজা ও দুই রাজমহিষী শিশুকে মহানন্দে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। যেহেতু স্বীয় পুত্র জরারাক্ষসী কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে সেজন্য রাজা বৃহদ্রথ তার নাম রাখলেন জরাসন্ধ। কিছুদিন বাদে চণ্ডকৌশিক মুনি পুনরায় মগধরাজ্যে আগমন করে রাজা বৃহদ্রথকে বললেন, নবজাত কুমার অশেষ বিক্রম ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে। কোন রাজাই তার ন্যায় বলশালী হতে পারবেন না। যিনি এর শত্রুতা করবেন তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এমন কি দেবতাদের অস্ত্রাঘাতেও তার কোন ব্যথা অনুভব হবে না। এই কুমার দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভে সমর্থ হবে।

চণ্ডকৌশিক মুনির ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর মগধরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে জরাসন্ধ মহাবলে বলীয়ান হয়ে সকল রাজার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেন।

কৃষ্ণ এরপর জরাসন্ধের বধের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বললেন, জরাসন্ধের প্রধান দুই সহচর হংস ও ডিম্ব মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে; জরাসন্ধের জামাতা অত্যাচারী কংসও আমার হাতে নিহত। জরাসন্ধ বধের এটাই প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে তাঁকে বধ করা যাবে না, মল্লযুদ্ধের আশ্রয় নিতে হবে। আমি কৌশলজ্ঞ, ভীমসেন বলবান আর অর্জুন আমাদের রক্ষাকর্তা। আমরা তিনজন একত্র হলে এক মহাশক্তির উদ্ভব হবে এবং তার সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করা একটুও কঠিন হবে না। আমরা তিনজন একসঙ্গে নির্জনে জরাসন্ধকে আক্রমণ করলে তিনি অবশ্যই আমাদের মধ্যে একজনকে যুদ্ধের জন্য বেছে নেবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিজ বলবীর্যে উত্তেজিত হয়ে তিনি আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বলবান সেই ভীমসেনকেই মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করবেন। আর আমি নিশ্চিত, মহাবল ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করতে সক্ষম হবেন। মহারাজ, যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে তবে ভীমসেনকে আজ্ঞা করুন আমার সঙ্গে গমন করতে।

যুধিষ্ঠির সম্মত হলে কৃষ্ণ, ভীমসেন ও অর্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে বহু পথ পরিক্রমা করে মগধরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ করলেন ভিন্ন পথে এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত করে। প্রধান প্রবেশদ্বার বর্জন করলেন। প্রবেশের

সময় সে স্থানে রক্ষিত এক বৃষরূপধারী দৈত্যের চর্মদিয়ে প্রস্তুত তিনটি ভেরী ধ্বংস করে ফেললেন। ভেরী তিনটি আঘাত করলে একমাস ব্যাপী এক গম্ভীর ধ্বনি সৃষ্টি হত।

রাজধানীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বুঝতে পারলেন জরাসন্ধের কোন অমঙ্গল সংঘটিত হতে যাচ্ছে। অমঙ্গল রোধে ব্রাহ্মণদের নির্দেশে জরাসন্ধকে হস্তিপৃষ্ঠে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করান হল। এদিকে কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন নগরে প্রবেশ করে মালাকারদের নিকট হতে বলপূর্বক মাল্য ও অন্যান্য অঙ্গরাগ সংগ্রহ করে নিজেদের সজ্জিত করে নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণদের অবারিত দ্বার। তাই তাঁরা কোন বাধার সম্মুখীন হলেন না। নানা মহল অতিক্রম করে তাঁরা অবশেষে যজ্ঞশালায় জরাসন্ধের সমীপে উপস্থিত হলেন। জরাসন্ধ তখন একটি ব্রতাচরণের জন্য উপবাসে ছিলেন। তিনি তাঁদের অর্ঘ্যাদি দিয়ে পূজা করে স্বাগত জানালেন ও তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ ভীমার্জুনকে দেখিয়ে বললেন, এঁরা নিয়মে আছেন; এক্ষণে কোন কথা বলবেন না। পূর্ব রাত্রি গত হলে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। জরাসন্ধ সেইমত তাঁদের যজ্ঞাগারে রেখে স্বীয় ভবনে গমন করলেন এবং অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পুনরায় সেখানে উপস্থিত হলেন। পূজাদি সমাপন করে জরাসন্ধ বললেন, স্নাতক ব্রাহ্মণেরা সভায় যোগদানের সময়েই কেবল মালা চন্দন ধারণ করেন। আপনাদের এ বেশ দেখে আশ্চর্যবোধ করছি। আপনারা রক্তবস্ত্র পরিধান করেছেন এবং মাল্য ধারণ ও চন্দনাদি অনুলেপন করেছেন, অথচ আপনাদের বাহুতে জ্যা চিহ্ন বর্তমান। আপনাদের সত্য পরিচয় প্রদান করুন। আপনারা প্রধান দ্বার দিয়ে না এসে অন্য পথে চৈত্যপর্বত ভঙ্গ করে এসেছেন। আর আমার অর্ঘ্যাদি উপহারই বা প্রত্যাখ্যান করলেন কেন?

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করতে পারেন। মালাদি ধারণেও তাঁদের কোন বাধা নেই। আমরা ক্ষত্রিয়, বাহুবলই আমাদের প্রধান সম্পদ। যদি বাসনা হয় অদ্যই আমাদের বাহুবলের পরিচয় পেতে পারেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুগৃহে গোপনে ও মিত্রগৃহে প্রকাশ্যে প্রবেশ করেন। আমরা আপনার পূজা গ্রহণ করি নি; কারণ আমরা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে শত্রুগৃহে প্রবেশ করেছি।

জরাসন্ধ বললেন, বিপ্রগণ, আমি কোনদিন আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না। কী জন্য আপনারা আমাকে শত্রুজ্ঞান করছেন? আমি স্বধর্মে নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নি।

কৃষ্ণ জরাসন্ধের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগগুলি ব্যাখ্যা করে বললেন, আপনি বহু নিরপরাধ ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করে রেখেছেন মহাদেবের নিকট বলি দেবার উদ্দেশ্যে। আপনার এই পাপকার্য আমরা কিছুতেই সংঘটিত হতে দেব না। সে জন্য

আপনাকে সংহার করতে গোপনে আমরা আপনার আলয়ে এসেছি। আমি বসুনন্দন কৃষ্ণ, আর এঁরা দুজন পাণ্ডুর পুত্র। বন্দী রাজাদের মুক্ত না করলে আমাদের সহিত সংগ্রামে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আপনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বাহুযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

কৃষ্ণের পূর্বানুমানে সত্যে পরিণত হল। জরাসন্ধ তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বলবান ভীমসেনকেই মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন। দুজনের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ চলল তের দিন ধরে। চর্তুদশ দিবসে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ভীমসেন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে জরাসন্ধকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেললেন।

জরাসন্ধ নিহত হলে কৃষ্ণ সকল বন্দী রাজাদের মুক্ত করে দিলেন। মগধরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন জরাসন্ধপুত্র সহদেব। এঁরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবিত রাজসূয় যজ্ঞে যোগদানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

জরাসন্ধ বধের ঘটনার মধ্যে আমরা রাজনীতি, সুরক্ষা ও চরনীতি সম্বন্ধে বেশ কিছু সফল প্রয়োগ দেখতে পাই। এই সাফল্যের পিছনে আছে কৃষ্ণের গভীর দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম উপায়-জ্ঞান ও অসম সাহসিকতা। এ সবই মূল্যহীন হত যদি কৃষ্ণ জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, রাজধানীর সুরক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য বহু বিষয়ে পূর্বসংবাদ সংগ্রহ না করতেন। প্রধানতঃ দুটি কারণে কৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনা করেন। [এক] নির্বিঘ্নে যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবিত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কৃষ্ণ বুঝেছিলেন মহাপরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ (তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৩ অক্ষৌহিনী)কখনই অন্য কোন রাজাকে রাজশূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে দেবেন না। এ কারণে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য জরাসন্ধের অপসারণ অপরিহার্য। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করা অসম্ভব। জরাসন্ধ নিধনের জন্য কৃষ্ণকে তাই ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। অবশ্য ঝুঁকি কম ছিল না। জরাসন্ধকেই তাঁর প্রতিদ্বন্দীকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। জরাসন্ধ অনায়াসে মল্লযুদ্ধে কৃষ্ণ বা অর্জুনকে আহ্বান করতে পারতেন। এর পরিণাম কী হত তাহা সহজেই অনুমেয়। এঁদের দুজনের মধ্যে কেহই জরাসন্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতেন না। আবার জরাসন্ধ মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব গ্রহণ না করতেও পারতেন। অন্যপক্ষ যখন ছলনার আশ্রয় নিয়েছে তখন তার মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব অগ্রাহ্যের মধ্যে কোন অযৌক্তিতা থাকত না। তিনি প্রকাশ্যে নিজসৈন্যদলের সাহায্যে তাঁদের বিনষ্ট করতে পারতেন। কিন্তু জরাসন্ধ ছিলেন সরল যোদ্ধা। ক্ষত্রীয় ধর্ম স্মরণ রেখে উপবাসে থেকেও মল্লযুদ্ধেই সম্মত হলেন। তাও আবার মহাবীর ভীমসেনের সঙ্গে—যিনি শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ। ভীমসেনের হস্তে নিজ রাজধানীতে তাঁর অধীনস্থ মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপ্রধান এ অন্যান্য পুরবাসীদের সম্মুখে তিনি নিদারুণ দৈহিক উৎপীড়ণের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত দেহে প্রাণত্যাগ করলেন। জরাসন্ধের এই বিভৎস মৃত্যু আমাদের মনে গভীর

দুঃখ ও সহানুভূতি সৃষ্টি না করে পারে না। নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি ক্ষাত্রধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। নিজের চেয়ে দুর্বল কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তিনি ক্ষাত্রধর্ম বিরুদ্ধ বলে মনে করেছিলেন। যাহোক, এই ঘটনায় কৃষ্ণের বিঘোষিত নীতিই সাফল্য মণ্ডিত হল; শত্রু বলবান হলে সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হয়ে কৌশলে তাকে বিনষ্ট করতে হবে। আর জরাসন্ধের নিধনে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান বাধা দূর হল।

[দুই] জরাসন্ধের কারাগার থেকে বন্দী রাজাদের মুক্তি। বন্দী রাজাদের সংখ্যা একশত হলে তাঁদের সকলকে বলি দেওয়া হতো মহাদেবের উদ্দেশে। কৃষ্ণ বদ্ধ-পরিকর ছিলেন এই বিভৎস নরবলি বন্ধ করতে। এ কাজ প্রশংশনীয় সন্দেহ নেই। বন্দী রাজাদের মুক্তির ফলে পাণ্ডবপক্ষের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল।

অন্য আরও একটি প্রচ্ছন্ন অথচ বিশেষ কারণ ছিল। কৃষ্ণ বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলেন তাঁর চিরশত্রু মগধরাজ জরাসন্ধের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। এই সুযোগ উপস্থিত হল যখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার বাসনা করলেন। রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না যতদিন জরাসন্ধ জীবিত আছেন। আবার ভীমার্জুনের সহায়তা ভিন্ন জরাসন্ধ নিধন সম্ভব নয়। তাই যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে মগধরাজ্যে এলেন জরাসন্ধকে হত্যা করতে। পরিকল্পনা মত ভীমসেনের হাতে জরাসন্ধের মৃত্যু হল। এই মৃত্যুতে কৃষ্ণের অবশিষ্ট একমাত্র মহাশত্রুর পতন ঘটল। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি ও সহযোগী রাজন্যবর্গ। কেবল বুদ্ধির বলে কৃষ্ণ আপন উদ্দেশ্য সফল করলেন কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ না করেই। এই দিক থেকে বিচার করলে তাঁর সাফল্যের তুলনা নেই।

মথুরায় অবস্থান করার সময় থেকেই কৃষ্ণ জরাসন্ধের বধোপায় চিন্তা করছিলেন। যখন দেখলেন তাঁকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করা যাবে না তখন কৃষ্ণ সুপরিকল্পিতভাবে মথুরা পরিত্যাগ করে পশ্চিমে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সমরবিদ। নিজের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জরাসন্ধ ও তাঁর মিত্র রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহে অগ্রসর হলেন। তিনি জানতেন ভবিষ্যতে জরাসন্ধ বধের সুযোগ উপস্থিত হলে এ সব তথ্য তাঁর প্রয়োজন হবে। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি সংগ্রহ করলেন বহু প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ও অত্যাচারের কাহিনী, মগধরাজ্যের মন্ত্রী, অমাত্য ও প্রজাসাধারণের মনোভাব, রাজ্যের সৈন্যদলের পরিমান, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রসজ্জা ও মনোবল, রাজধানী গিরিব্রজের গোপন প্রবেশ পথ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা, মিত্ররাজাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রভৃতি। সহজেই অনুমেয় এই তথ্যগুলির একটি বড় অংশ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অভিজ্ঞ গুপ্তচর নিয়োগ করে। এই বিরাট

তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুতির ব্যাপারে কৃষ্ণ নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়াও মিত্ররাজা ও জরাসন্ধের শত্রুদেরও অবশ্য কাজে লাগিয়েছিলেন। মনে হয় গুপ্তচরদের নির্দেশমতই কৃষ্ণ ভীমার্জুনকে নিয়ে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ না করে অন্য পথে যেখানে সুরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল ছিল সেপথে প্রবেশ করেছিলেন। এই পথে স্থাপিত তিনটি ভেরীর সংবাদও তিনি নিশ্চয়ই গুপ্তচরদের থেকেই পেয়েছিলেন। শত্রুর অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে পূর্ব সতর্ক সংকেত দেওয়ার জন্য সম্ভবত ভেরী তিনটি এই প্রবেশ পথে স্থাপিত হয়েছিল। ভীমার্জুন কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ভেরীগুলির কার্যকারিতা নষ্ট হয় ও তাঁদের বিনা বাধায় রাজধানীতে প্রবেশ সম্ভব হয়।

জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা যায়। জরাসন্ধের রাজধানীতে প্রবেশ করে কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের পক্ষে বলপূর্বক মালাকারদের নিকট হতে পুষ্পাদি সংগ্রহ করা সঠিক হয় নি। এর ফলে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অন্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারত। কৃষ্ণের ন্যায় একজন অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এমন কাঁচা কাজের আমরা কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। কৃষ্ণ বা ভীমার্জুনের হাতে কি কোন অর্থ ছিল না পুষ্পাদি খরিদের জন্য? স্নাতক ব্রাহ্মণ হিসাবে....চেয়েও পুষ্পাদি সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল না? প্রবেশ পথের নির্বাচন সম্বন্ধেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কৃষ্ণ কি ভীমার্জুনকে নিয়ে স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে প্রধান দ্বার দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারতেন না? তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাঁদের গতিবিধিতে কোন বাধা ছিল না। প্রধান দ্বার দিয়ে প্রবেশের সময়ও তাঁদের কোন বাধা আসত বলে মনে হয় না। আমরা দেখেছি তাঁরা বিনা বাধায় এই ছদ্মবেশেই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে মহলের পর মহল পার হয়ে যজ্ঞশালায় জরাসন্ধের সমীপে উপস্থিত হন।

জরাসন্ধের ত্রুটিবিচ্যুতির অন্ত ছিল না। তাঁর গুপ্তচরগণ কৃষ্ণের পরিকল্পনার বিষয় দূরে থাক ভীমার্জুন সহকারে তাঁর রাজধানীতে প্রবেশের কোন সংবাদও সংগ্রহ করতে পারে নি। কোথাও কোন বাধা না পেয়ে তাঁরা একেবারে রাজপ্রাসাদের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন জরাসন্ধের সম্মুখে। রাজপণ্ডিতগণ অবশ্য চারিদিকে নানা অশুভলক্ষণ দেখে জরাসন্ধকে বিপদ মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু রাজপ্রশাসন থেকে রাজ্যের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের কোন বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয় নি। রাজধানীর সুরক্ষা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয় নি। এমন কি জরাসন্ধের নিজ নিরাপত্তা বিষয়েও চরম উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনকে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে দিল। তাঁদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনও বোধ করল না। অপরিচিত তিনজন স্নাতক ব্রাহ্মণ কর্তৃক মালাকারদের নিকট হতে পুষ্পাদি সংগ্রহের

ঘটনা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিল। এরূপ কর্ম ব্রাহ্মণোচিত নয়। সেজন্য তাঁদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এ সংবাদ কর্তৃপক্ষের নিকট অজ্ঞাত রইল। রাজধানীতে নিযুক্ত জরাসন্ধের গুপ্তচরগণও এ বিষয়ে কোন কিছু জানতে পারল না। এখানে আরও একটি বড় অসংগতি চোখে পড়ে। দ্বিতীয়বার মধ্যরাত্রে যজ্ঞশালায় এসে জরাসন্ধ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাঁরা প্রধান দ্বার দিয়ে না এসে চৈত্য পর্বত ভঙ্গ করে অন্য পথে রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন। এতে মনে হয় কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের আগমন সংবাদ তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন প্রতিব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হল না তার কোন ব্যাখ্যা নেই। জরাসন্ধ কি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন? তাও মনে হয় না যখন দেখি উপবাসে থেকেও একনাগাড়ে তের দিন তিনি ভীমসেনের সহিত মল্লযুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে কেবল এই বলা যায় জরাসন্ধের শাসনযন্ত্র সজাগ থাকলে এমন সহজভাবে সুদূর ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে এসে তিনজন পরদেশী নিরস্ত্র ব্যক্তি রাজপ্রাসাদে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারতেন না। তাঁরা পূর্বেই রাজধানীর নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে আবদ্ধ হতেন। জরাসন্ধের জীবনও রক্ষা পেত। কিন্তু রাজপ্রশাসনের লজ্জাকর কর্তব্যবিচ্যুতির জন্য কৃষ্ণের জরাসন্ধ বধ পরিকল্পনা সাফল্য মণ্ডিত হল।

কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করে যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত ঘটনাবলী জানালেন। জরাসন্ধবধের সংবাদে যুধিষ্ঠির মহা আনন্দিত। সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তিনি তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে গমন করতে অনুজ্ঞা করলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে এলেন।

॥ পাঁচ ॥

রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি পর্বে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে বহু রাজন্যবর্গকে পরাভূত করে তাঁদের বশ্যতা আদায় করলেন। সংগৃহীত হল অজস্র ধনরত্ন ও নানা উপঢৌকন।

কৃষ্ণ এই সময় ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু হল। আমন্ত্রিত হয়ে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণাচার্য, ধার্তরাষ্ট্রগণ এবং ছেদিরাজ শিশুপালসহ বহু নৃপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে উপস্থিত হলেন। যজ্ঞের দিন ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তেজ ও পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ হিসাবে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি নিবেদন করলে কৃষ্ণের চির শত্রু শিশুপাল ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে কৃষ্ণের প্রতি নানা কটুবাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন। শিশুপাল কৃষ্ণকে সংগ্রামেও আহ্বান করলেন। কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন আপন

পিসতুতো ভাই শিশুপালের একশত অপরাধ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। সেই একশত অপরাধ পূর্ণ হলে কৃষ্ণ তাঁর সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরচ্ছেদ করলেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহই শিশুপালের পক্ষে এগিয়ে এলেন না। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হলে যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন।

শিশুপালের সীমাহীন আত্মম্ভরিতা ও অন্ধ কৃষ্ণ-বিদ্বেষ তাঁর বিচারশক্তি নষ্ট করে ফেলেছিল। ফলে তিনি সত্যাসত্য নির্ণয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। ভীষ্ম ও কৃষ্ণের সতর্কবাণী তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উন্মত্তের ন্যায় বিষোদ্গার করতে লাগলেন। তিনি ভুলে গেলেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আস্ফালন করছেন সেখানে উপস্থিত আছেন মহাবীর পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের অগণিত মিত্র রাজন্যবর্গ। আর আছেন স্বয়ং কৃষ্ণ যিনি শৌর্যে বীর্যে অদ্বিতীয়। বলবানের প্রতি নীতিশাস্ত্রোক্ত উপদেশ তিনি ভুলে গেলেন। যেখানে কৌশলে কার্যোদ্ধারের বিষয় চিন্তা করা উচিত ছিল সেখানে তিনি সমস্ত বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি দিলেন। তিনি কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের শক্তি সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কোন সংবাদ সংগ্রহ না করেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন। কৃষ্ণের জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি। কৃষ্ণ নিন্দায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তিনি কৃষ্ণের হাতেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। এ যেন এক আত্মহনন। শিশুপালের মৃত্যুতে আর একটি কৃষ্ণ-বিরোধী শক্তির অবসান ঘটল। শান্তিবান হলেন পাণ্ডবগণ।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদান করতে গিয়ে দুর্যোধন অপূর্ব কারুকার্যময় যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ দেখে অবাক হলেন। সভাগৃহের অনেক কিছুই তিনি হস্তিনাপুরে দেখেন নি। স্ফটিকময় দৃষ্টিবিভ্রমকারী মহলগুলি পরিদর্শনের সময় তিনি জলকে স্থল মনে করে বসন ভিজিয়ে ফেললেন। আবার অন্যত্র স্থলকে জল মনে করে বসন উঠিয়ে চলতে লাগলেন। দ্বার মনে করে অগ্রসর হতে গিয়ে দেওয়ালে মস্তক ঠেকে আঘাত পেলেন। অন্যস্থলে খোলা দ্বার বন্ধ মনে করে ফিরে এলেন। ভীমার্জুন ও দ্রৌপদী দুর্যোধনের দুরাবস্থা দেখে হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না। এই ভাবে বিড়ম্বিত হয়ে অতি বিষণ্ণ মনে দুর্যোধন অন্যান্যদের সহিত হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। শুরু হল পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের নূতন ষড়যন্ত্র।

শকুনি দুর্যোধনকে তাঁর বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মাতুল, আজ সমগ্র পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের পদানত। রাজসূয় যজ্ঞও তিনি সম্পন্ন করলেন। প্রকাশ্য সভায় শিশুপালকে হত্যা করা হল; কিন্তু কেউই এর প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন না। যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করে বিভিন্ন দেশের নৃপতিগণ তাঁকে কত যে ধনরত্ন উপহার দিলেন তার শেষ নেই। এসব দেখে আমি ঈর্ষানলে জর্জরিতে হচ্ছি। আমি

আত্মহত্যায় জীবন বিসর্জন দেব স্থির করেছি। পূর্বে পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মনে হয় পুরুষকার চেয়ে দৈবই প্রবল। সেজন্য পাণ্ডবদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে; আর আমরা হীনবল হয়ে পড়ছি। মাতুল, এই অবস্থায় মৃত্যুই আমার শ্রেয়। আপনি আমার মনোবেদনার কথা পিতার গোচরে আনুন।

শকুনি উত্তরে বললেন, বৎস, পাণ্ডবরা নিজ শক্তিবলে পৈতৃকরাজ্যের বিস্তার করে সমৃদ্ধিশালী হয়েছেন। এতে তোমার দুঃখ করার কোন কারণ নেই। তুমিও সহায় সম্বলহীন নও। আমরা সকলে একত্রে তোমার জন্য সমস্ত বসুন্ধরা জয় করতে পারি।

শকুনির কথায় আশ্বস্ত হয়ে দুর্যোধন বললেন, মাতুল, আপনাদের সাহায্যে আমি সমগ্র পৃথিবী জয় করব। পাণ্ডবরা আমার বশীভূত হবে।

শকুনি নিজের পরিকল্পনা প্রকাশ করে বললেন, বৎস, কৃষ্ণ ও দ্রুপদ রাজার সহায়তায় পাণ্ডবগণ অজয়ী হয়ে উঠেছেন। দেবতাদের পক্ষেও সম্ভব নয় তাঁদের পরাভূত করা। যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত করতে হবে অন্য উপায়ে। যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়া ভালবাসেন। কিন্তু খেলার অভিজ্ঞতা নেই। আমি দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষজ্ঞ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আমন্ত্রণ কর। ক্ষত্রীয় রীতি অনুসারে তিনি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। আমি তোমার পক্ষে কপট দ্যূতে অনায়াসে তাঁকে পরাস্ত করব এবং তাঁর সমস্ত রাজ্য সম্পদ জয় করে তোমাকে প্রদান করব। এই উপায়েই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।

শকুনির নিকট সব শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তোমার ঐশ্বর্যের কোনই অভাব নেই। তোমার ভ্রাতাগণ ও মিত্রবর্গও কোন অপ্রিয় কার্য করছেন না। তবুও তুমি দিন দিন বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশকায় হয়ে পড়ছ। তোমার মনে কিসের এত দুঃখ?

দুর্যোধন উত্তরে বললেন, তাত! আমি কাপুরুষের ন্যায় কেবল বিষয় ভোগে মত্ত আছি ও ক্রোধানলে দগ্ধ হচ্ছি। যিনি প্রজা বশীভূত ও শত্রুদমনে সমর্থ তিনিই যথার্থ পুরুষ। যুধিষ্ঠিরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে আমি ভোগ্যবস্তু হতে কোন তৃপ্তি পাচ্ছি না। তাত! মাতুল শকুনি দ্যূত ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ। তিনি আমার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত করে তাঁর রাজ্য সম্পদ আমার জন্য হরণ করবেন স্থির করেছেন। আপনি অনুমতি দিন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্যূত ক্রীড়া বিষয়ে মহামন্ত্রী বিদুরের মতামত জানতে চাইলেন। বিদুর দ্যূত ক্রীড়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। বললেন, এতে ভ্রাতাদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র সেইমত দুর্যোধনকে জানালে তিনি ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়লেন। বললেন, মহারাজ, দেখছি নিজস্বার্থ রক্ষায় আপনার কোন আগ্রহ নেই। আপনি প্রজ্ঞাবান হয়েও আপন পুত্রদের স্বকার্য সাধনে বাধার সৃষ্টি করছেন।

ক্ষত্রিয়দের পররাজ্য জয়ই প্রধান বৃত্তি। এর মধ্যে ন্যায় নীতির কোন প্রশ্ন নেই। শত্রু বা মিত্রের কোন সংজ্ঞা নেই। যার কাজে সন্তাপ সৃষ্টি হয় তিনিই শত্রু। আমি স্থির করেছি হয় পাণ্ডবদের রাজ্য সম্পদ লাভ করব, নয়তো যুদ্ধেপ্রাণ বিসর্জন দেব। মহারাজ, বিদুর সব সময় পাণ্ডবদের পক্ষাবলম্বন করে থাকেন। তিনি যে দ্যূত ক্রীড়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবেন তা সহজেই অনুমেয়। আপনি মাতুলের প্রস্তাব মত দ্যূত ক্রীড়ার জন্য সভাগৃহ নির্মাণের অনুমতি দিন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্যূত ক্রীড়ার অনুমতি দিয়ে সভাগৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন। আর বিদুরকে প্রেরণ করলেন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানাতে।

পরবর্তী ঘটনা আমরা সকলেই জানি। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত হস্তিনাপুর আগমন করলেন। যথাসময়ে নবনির্মিত সভাগৃহে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, মহামন্ত্রী বিদুর ও অন্যান্য গুরুজন ও সভাসদদের উপস্থিতিতে দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হল। শকুনি দুর্যোধনের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে খেলতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য সম্পদ হারিয়ে একে একে ভ্রাতাদের ও পরে দ্রৌপদীকে পণ রেখে শকুনির নিকট হেরে গেলেন। দুর্যোধনের অদেশে ভ্রাতা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে বলপূর্বক সভাগৃহে নিয়ে এলেন। এমন কি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টাও হল। সভাস্থ সকলে হাহাকার করে উঠলেন। বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র বিকর্ণ দ্রৌপদীর অবমাননার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। দুর্যোধন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তাঁদের অগ্রাহ্য করলেন। কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিবলে শেষে দ্রৌপদী চরম লজ্জা থেকে উদ্ধার পেলেন। পিতামহ ভীষ্ম বা অন্য কেহই দ্রৌপদীর সাহায্যে এগিয়ে এলেন না (পৃঃ ৩-৪)। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে ভীষ্ম দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করলেন। পরে দ্রৌপদীর প্রার্থনায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ও পঞ্চপাণ্ডবকে সমস্ত দায়বদ্ধতা হতে মুক্তি দিয়ে তাঁদের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন।

এইভাবে পাণ্ডবদের রাজ্য সম্পদ অধিকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে দুর্যোধন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দ্যূত সভায় তাঁদের অপমানের জন্য পাণ্ডবগণ আমাদের কখনই ক্ষমা করবেন না। দ্রৌপদীর নিগ্রহের কথা তাঁদের মনে সব সময় জাগরুক থাকবে। তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেনই। আমরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পুনরায় দ্যুত ক্রীড়ায় যোগ দেব। পণ থাকবে বিজিত পক্ষ বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে থাকবে। আপনি অনুমতি দিন। দ্যূত ক্রীড়ায় দক্ষ শকুনির সাহায্যে আমরা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য সম্পদ অধিকার করতে পারব।

পত্নী গান্ধারীসহ অন্যান্যদের নিষেধ উপেক্ষা করে দুর্যোধনের পীড়াপীড়িতে ধৃতরাষ্ট্র পুনর্বার দ্যূত ক্রীড়ায় সম্মতি দিলেন। খেলার ফলাফল আমরা জানি। শকুনির কপট দ্যূতে হেরে গিয়ে সর্ত অনুযায়ী দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত যুধিষ্ঠির বনবাসে গমন করলেন। হস্তিনাপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত বহন করে চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ উদিত হল। দ্যূতক্রীড়ার ঘটনার মধ্যে কুরু-পান্ডব যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

মহামন্ত্রী বিদুর সহ ভীষ্মাদি গুরুজনগণ সকলেই দ্যূত ক্রীড়ার বিরোধী ছিলেন। বিদুরের প্রতিবাদই সবচেয়ে মুখর ছিল। কিন্তু বিদুর কেবল প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকলেন। দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাবের পিছনে পান্ডবদের রাজ্য সম্পদ অধিকার করার দুর্যোধনের গূঢ় অভিসন্ধি সম্বন্ধে তাঁর কোন সুস্পষ্ট পূর্ব সংবাদ ছিল বলে মনে হয় না। দ্যূত ক্রীড়ার ক্ষতিকর পরিণাম বিষয়েই তিনি যেন কেবল উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন দ্যূতক্রীড়া ভ্রাতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি এ বিষয়ে সতর্কও করেছিলেন। রাজ্যের মহামন্ত্রী হিসাবে তাঁর একাজ সঠিক হয়েছিল। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটু অনুধাবন করলেই তিনি বুঝতে পারতেন হঠাৎ দ্যূত ক্রীড়ার প্রস্তাবের পিছনে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কেবল খেলার জন্য এ প্রস্তাব করা হয় নি। দুর্যোধন যে অতি বিষণ্নমনে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন তা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের ঘন ঘন নিভৃত আলোচনার কথাও তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। এই আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিদুরের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবে কিন্তু এর কোন প্রতিফলন দেখা গেল না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের একজন অংশীদার ছিলেন। হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদেই এত সব কান্ড কারখানা সম্পন্ন হল বিদুরের অজান্তে। এটা সত্যই এক আশ্চর্যের বিষয়। দ্যূত ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ কুটবুদ্ধিসম্পন্ন পান্ডবদের মহাশত্রু শকুনি দুর্যোধনের হয়ে দ্যূত ক্রীড়ায় অংশ নেবেন — এর চেয়ে সন্দেহজনক বিষয় আর কী হতে পারে? এই সব তথ্যের ভিত্তিতে গুপ্তচর দ্বারা দুর্যোধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উদঘাটন করা অসম্ভব ছিল না। বাস্তবে কিন্তু তাই সম্ভব হল। দ্যূতক্রীড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত গোপনই থেকে গেল। মন্ত্রণা সংগুপ্তির এটা কৌরবদের একটি বড় সাফল্য। অন্যদিকে পান্ডবদের বিশেষত বিদুরের এটা একটি বড় ব্যর্থতাই বলা যায়। এ বিষয়ে বিদুরের ব্যর্থতাই শতগুণে বেশী। কারণ ষড়যন্ত্র যেস্থানে সংঘটিত হচ্ছিল সেই রাজপ্রাসাদেই তিনি অবস্থান করছিলেন। বিদুরের এই উদাসীনতা বা অক্ষমতার আমরা কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। বিদুর কিন্তু বারণাবতে জতুগৃহ দাহে মাতা কুন্তীসহ পান্ডবদের পুড়িয়ে মারার দুর্যোধনের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বাহ্নে জেনে তাঁদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। মনে হয় দ্যূত ক্রীড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্বাহ্নে জানতে পারলে বিচক্ষণ বিদুরের পক্ষে কোন বিশেষ উপায় অবলম্বনে সমস্ত ষড়যন্ত্র

বানচাল করা কঠিন হত না। কিন্তু মহাভারতের কবির পরিকল্পনায় দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও ভার্য্যা ও ভ্রাতাদের সহিত বনবাসে গমন একটি প্রধান ঘটনা। নানা অসংগতি থাকা সত্ত্বেও এই মূল ঘটনাকে ভিত্তি করেই তিনি পরবর্তী কাহিনীসমূহ, অপূর্ব দক্ষতার সহিত উপস্থাপনা করেছেন। বিদুরের 'ব্যর্থতার' কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

কপট দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সম্পদ গ্রাস করার সমর্থনে দুর্যোধন নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর মতে ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য হল পররাজ্য জয় করে নিজের অধিকার বিস্তার করা; এখানে নৈতিকতার কোন স্থান নেই। সম্মুখ যুদ্ধে কার্যোদ্ধার না হলে কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। এই কৌশলগত কারণেই দুর্যোধন মাতুল শকুনির প্রস্তাবমত কপটতার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এই নীতির প্রয়োগ কৃষ্ণ ও পান্ডবগণও বহুবার করেছেন। তখনকার সমাজে ক্ষাত্রধর্মের এই বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য ছিল না। কুরু-পান্ডব সম্পর্ক এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল, তখন তাঁদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যুধিষ্ঠিরের প্রতিপত্তি ও সম্পদ দেখে দুর্যোধনের ঈর্ষান্বিত হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না। তদুপরি তাঁর মন বিষিয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থে নানাভাবে বিড়ম্বিত ও অপমানিত হয়ে। এমতাবস্থায় দুর্যোধনের প্রতিহিংসা স্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শকুনির কপট দ্যুতক্রীড়ার প্রস্তাবে দুর্যোধন তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এক সহজ উপায় দেখতে পেলেন।

দ্যুত ক্রীড়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তখনকার দিনে অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। সেজন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দ্যুত ক্রীড়ার আমন্ত্রণ সহজ মনেই গ্রহণ করলেন। শকুনি দুর্যোধনের পক্ষে খেলবেন এ শর্ত স্বীকার করে নিয়েই যুধিষ্ঠির খেলতে বসলেন। এতে দুর্যোধনের কোন দোষ ছিল না। খেলার উন্মাদনায় তিনি সব কিছু এমনকি ভ্রাতাদের ও ভার্য্যা দ্রৌপদীকেও হারালেন। এই শোচনীয় বিপর্যয়ের জন্য যুধিষ্ঠির একাই দায়ী। বাস্তবিক পক্ষে যুধিষ্ঠিরের নিজেরই বাসনা ছিল দ্যুত ক্রীড়ায় হারিয়ে দুর্যোধনের রাজ্য ও ধনসম্পদ গ্রাস করা। কিন্তু তিনি ছিলেন দ্যুত ক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, কেবল খেলতে ভালবাসতেন। অন্যদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শকুনি যিনি কেবল খেলায় অভিজ্ঞই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মর্মজ্ঞ, পণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ। এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট যুধিষ্ঠিরের ন্যায় একজন সাধারণ জুয়াড়ী যে হেরে যাবেন তা সহজেই অনুমেয়। তবে প্রকাশ্য সভাগৃহে দ্রৌপদীর নিগ্রহ (যদি এমন ঘটনা সত্যই সংঘটিত হয়ে থাকে, মনে হয় দ্যুত ক্রীড়া একবারই হয়েছিল) কেবল নিন্দনীয় নয়, ক্ষমাহীনও বটে। ভীষ্মাদি গুরুজনগণ নীরব থেকে দুর্যোধনের অপকর্মকেই সমর্থন করে গেলেন। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সর্বতোভাবে তিনি হস্তিনাপুর রাজ সিংহাসন রক্ষা করবেন। ভাগ্যের পরিহাস তাঁরই সম্মুখে সংঘটিত দ্যুত ক্রীড়া ও দ্রৌপদীর নিগ্রহ শেষে কুরুবংশের ধ্বংস ডেকে আনল। ভীষ্মের দৃঢ় মনোভাবের অভাবেই দ্যুতক্রীড়ার এমন লজ্জাকর পরিণতি হল। এজন্য

কেবল দুর্যোধন ও তাঁর সহযোগিদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

ধার্তরাষ্ট্রগণের পক্ষে দ্বিতীয়বার দ্যূত ক্রীড়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছিল। এ বার স্থির হল যিনি পরাজিত হবেন তাঁকে বার বৎসর বনবাসে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। এবারও শকুনিই দুর্যোধনের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে খেললেন। আগের খেলায় শকুনির কপটতার কথা যুধিষ্ঠির এত সহজে ভুলে গেলেন কেন? এবারও হার হল এবং এরজন্য যুধিষ্ঠির নিজেই দায়ী। দুর্যোধন ঠিকই বুঝেছিলেন প্রথম খেলায় পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও অপমানে পান্ডবপক্ষ কখনই ক্ষমা করবেন না; তাঁরা এর প্রতিশোধ নেবেনই। এমতাবস্থায় পান্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আবার হারিয়ে বনবাসে পাঠানো ছাড়া দুর্যোধনের অন্য পথ খোলা ছিল না। তিনি মনে করেছিলেন এই সময়ের মধ্যে তিনি পান্ডবদের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন। সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল আমরা জানি।

দ্যূত ক্রীড়ায় শকুনির অসাধারণ দক্ষতার বিষয় হস্তিনাপুর রাজসভার সকলেই জানতেন। পান্ডবদেরও তা অজানা থাকার কথা নয়। কপটতার আশ্রয় না নিয়েও শকুনির পক্ষে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করা অসম্ভব ছিল না। এ সব জেনেও যুধিষ্ঠির অবিবেচকের ন্যায় সেই শকুনির সঙ্গেই খেলতে বসলেন। নিশ্চিতই এ বিষয়ে সংবাদের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। সে জন্য যুধিষ্ঠির ভূল পদক্ষেপ নিয়ে পরাজয় বরণ করলেন। চরনীতির সঠিক প্রয়োগের অভাবেই দ্যূতক্রীড়ার ঘটনায় পান্ডবগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। তাঁদের অনুগামী হলেন কুল পুরোহিত ধৌম্যসহ বহু ব্রাহ্মণ। অবশেষে তাঁরা কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বনে এসে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে অস্থিরমতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পান্ডবদের বনগমণে বিচলিত হয়ে বিদুরকে বললেন, বিদুর, তুমি নির্মল বুদ্ধির অধিকারী, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তোমার অবগত আছে। তদুপরি তুমি কুরুপান্ডবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তুমি আমাকে এমন উপদেশ প্রদান কর যাতে উভয় পক্ষেরই উপকার হয়।

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার শত্রুগণ কপটতার আশ্রয় নিয়ে দ্যূত ক্রীড়ায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছে। আপনি পান্ডবদের তাঁদের রাজ্য সম্পদ প্রত্যর্পণ করুন। আমার মতে দুর্যোধনের দুষ্কর্মের প্রতিবিধান এভাবেই সম্ভব। আপনি যদি আপনার পুত্রদের মঙ্গল কামনা করেন তবে পান্ডবদের সন্তুষ্টি বিধান করুন। অন্যথায় কুরুকুলের ধ্বংস অনিবার্য। ভীমার্জুন ক্রুদ্ধ হলে কোন শত্রুর নিস্তার নেই। দুর্যোধন, শকুনি ও কর্ণ পান্ডবদের আনুগত্য স্বীকার করুক, আর দুঃশাসন দ্রৌপদী ও ভীমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান করে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

বিদুরের উপদেশ ধৃতরাষ্ট্রের মনঃপূত হল না। তিনি বললেন, বিদুর, মনে হচ্ছে তুমি পান্ডবদের হিতার্থেই এ সকল কথা বলছ। আমি কেমনে পান্ডবদের জন্য আপন পুত্রদের পরিত্যাগ করব? তোমার উপদেশ কপটতাপূর্ণ। তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে কাম্যক বনে পান্ডবদের নিকট চলে এলেন। সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে ধর্মনন্দন! তোমায় কয়েকটি উপদেশ প্রদান করছি; মন দিয়ে শ্রবণ কর। যিনি শত্রুদের ক্লেশ সহ্য করেও ক্ষমার মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা করেন তিনিই মহান। তিনিই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করতে সমর্থ হন। যিনি মিত্রদের সহিত সমভাবে বিষয় ভোগ করেন, তিনি বিপদের সময়েও তাঁদের সহায়তা প্রাপ্ত হন।

বলা বাহুল্য বিদুরের উপদেশ সমূহ সকল রাজা বা শাসকবর্গেরই প্রনিধানযোগ্য।

বিদুরের অনুপস্থিতিতে ধৃতরাষ্ট্র অস্থির হয়ে পড়লেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি সারথী সঞ্জয়কে কাম্যক বনে পাঠিয়ে বিদুরকে হস্তিনাপুর নিয়ে এলেন। দুজনের মনোমালিন্য দূর হল।

বিদুরের প্রত্যাবর্তনে দুর্যোধন শঙ্কিত হলেন। তাঁর ধারণা হল পান্ডব হিতৈষী বিদুর কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে পিতা ধৃতরাষ্ট্র পান্ডবদের বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনের সঙ্গে তাঁর আশঙ্কার কথা আলোচনা করলেন। তিনি তাঁদের জানালেন পান্ডবগণ প্রত্যাবর্তন করলে তিনি আত্মঘাতী হবেন।

শকুনি সব শুনে বললেন, এ বিষয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পান্ডবগণ সকলে সত্যপরায়ণ। তাঁরা কখনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন না। আর যদি তাঁরা তোমার পিতার ইচ্ছাতে প্রত্যাবর্তন করেনই, তবে আমরা গোপনে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করব।

কর্ণ বললেন, পান্ডবগণ শর্ত ভঙ্গ করে বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করলে কপট দ্যূত ক্রীড়ায় আবার আমরা তাঁদের পরাজিত করব।

শকুনি ও কর্ণের অভিমত দুর্যোধনের মনঃপূত হল না। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে কর্ণ বললেন, আমার একটি অভিমত আছে, শ্রবণ করুন। পান্ডবগণ এখন শোকে কাতর। তদুপরি মিত্র বিহীন অবস্থায় বনবাসে আছেন। তাঁদের বিনষ্ট করার এটা প্রকৃষ্ট সময়। চলুন আমরা সশস্ত্র হয়ে তাঁদের আক্রমণ করি।

কর্ণের সহিত একমত হয়ে সকলে পান্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা এটা জানতে পেরে তাঁদের নিবারণ করলেন।

দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে শর্তমত পান্ডবগণ বনবাসে গমন করেছেন বার বৎসরের জন্য। শর্তভঙ্গ করে বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন এমন কোন ইঙ্গিত তাঁরা কোন সময়েই দেননি। এমতাবস্থায় পাণ্ডবদের হত্যার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবেই নীতিবিরুদ্ধ। সম্মুখ যুদ্ধে তাঁদের বিনষ্ট করা সম্ভব হত কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। স্পষ্টতঃই

ভীম অর্জুনের শক্তির সম্যক অনুধাবন না করেই দুর্যোধন এমন একটি হঠকারিতার আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন। কৌশলে কার্যোদ্ধারের কথা তিনি ভুলে গেলেন। তীব্র পাণ্ডব বিদ্বেষের কারণে কৌরবদের মন ছিল ভীষণভাবে কলুষিত। সে জন্য তাঁরা সুস্থ বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সশস্ত্র আক্রমণের এই সিদ্ধান্ত চর নীতিরও বিরোধী। ব্যাসদেবের হস্তক্ষেপে পাণ্ডববধের পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। হয়তো এর ফলে কৌরবগণ আর একটি ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেলেন।

এরপর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করে পুত্র দুর্যোধনকে শাসনে রাখতে উপদেশ দিলেন। অন্যথায় কৌরবদের প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মৈত্রেয় মুনিও ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে উপদেশ দিলেন। তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তা করতে বারণ করে বললেন, পাণ্ডবগণ সত্যাশ্রয়ী ও অমিত বিক্রমের অধিকারী। তদুপরি কৃষ্ণ তাঁদের সহায়। কোন অবস্থাতেই তাঁদের পরাভূত করা যাবে না। আমার বাক্য অগ্রাহ্য করলে যুদ্ধে ভীম তোমার ঊরুভঙ্গ করবেন।

এসব উপদেশ দুর্যোধনের মনে কোন দাগ কাটতে পারল না। তিনি পাণ্ডবদের অনিষ্ট সাধনে নানা ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত হলেন।

কাম্যক বনে অবস্থানকালে ভীমের হস্তে বকরাক্ষস ভ্রাতা রাক্ষসী মায়া বিদ্যাধরী মহাবীর কির্মীর ভীমের হস্তে নিহত হয়। বিদুর সব সংবাদই রাখতেন। তাঁর কাছে কির্মীর নিধন সংবাদ পেয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। কির্মীর নিধনের মধ্যে যেন তিনি ভীমের হস্তে নিজ পুত্রদের মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেলেন।

দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের বনবাসের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ তাঁর মিত্রদের সঙ্গে কাম্যক বনে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় আগমন করলেন দ্রৌপদীর আত্মীয়বর্গও। সকলে উপবেশন করলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধর্মরাজ,মহাপাপী দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের অকাল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা আপনার শত্রুদের পরাজিত করে আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করব। সনাতন ধর্ম মতে দুষ্টলোকের অনুগামীরাও বধ্য।

কথা বলতে বলতে কৃষ্ণ ক্রোধানল সম্বলিত হয়ে উঠলেন। মনে হল সর্বলোক ভস্মীভূত হয়ে যাবে। অর্জুন কৃষ্ণের পূর্ব কর্মসমূহ কীর্তন করে তাঁকে প্রশমিত করলেন। শান্ত হয়ে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ,তুমি আর আমি অভিন্ন. তোমাকে দ্বেষ করলে আমাকেও দ্বেষ করা হয়। তুমি নর, আমি নারায়ণ। আমরা নরনারায়ণ-রূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি।

অতঃপর দ্রৌপদী কৃষ্ণের স্তব করে সখেদে বললেন, হে কৃষ্ণ, তুমি সর্বলোকের অধিকর্তা। সে জন্য প্রণয়পূর্ব তোমাকে আমার দুঃখের কথা বলছি। এই বলে দ্রৌপদী দ্যূত সভায় তাঁর লাঞ্ছনা বিগ্রহের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। পরিশেষে বললেন, হে কেশব, এক্ষণে বোধ হচ্ছে আমি পতিপুত্র হীনা; আমার বন্ধু নেই, ভ্রাতা নেই, পিতা নেই, তুমিও নেই। সর্বসমক্ষে আমার নিগ্রহে তোমাদের উপেক্ষা ও আমার দুরাবস্থায় কর্ণের বিদ্রুপ — এই দুঃখ আমার হৃদয়কে অহর্নিশ দগ্ধ করে চলেছে।

দুঃখিতা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, হে ভাবিনী, তুমি নিশ্চিত জেনো যারা তোমায় অপমান করেছে তারা সকলেই অর্জুনের শরে নিহত হবে। পাণ্ডবদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। আর শোক করো না। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় আমি রাজমহিষীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করব।

ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, ভগিনী, আমি দ্রোণকে বিনাশ করব; শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীম দুর্যোধনকে ও অর্জুন কর্ণকে সংহার করবেন। কৃষ্ণ বলরামের সহায়তায় আমরা দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাস্ত করতে পারব।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকেবললেন, আমি তখন দ্বারকায় ছিলাম বলেই আপনাদের এই দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। দ্যূত সভায় নিমন্ত্রিত না হলেও আমি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে সকলকে বুঝিয়ে দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু শিশুপাল পুত্র শাম্ব পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। আমি শাম্বরাজের রাজধানী শৌভনগর বিনষ্ট করতে গিয়েছিলাম। সেজন্য আমি দ্যূত সভায় যেতে পারিনি।

আলোচনা শেষে পাণ্ডবদের আশ্বস্ত করে কৃষ্ণ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রাজ্যে প্রস্থান করলেন।

কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হল দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের নিগ্রহকারী কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং এই যুদ্ধে কৌরবগণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য রাজাদের এই গুরুত্বপূর্ণ সভার পূর্ণ বিবরণ দুর্যোধন কি তাঁর গুপ্তচরদের দ্বারা সংগৃহিত করতে পেরেছিলেন? মনে হয় না, কারণ কাহিনীর বিবরণে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। বনবাস কালে বহু কালজ্ঞ মুনিঋষি যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করেছিলেন পাণ্ডবগণ বর্তমান দুর্ভোগ অন্তে বিজয়ী হয়ে হৃতরাজ্য ফিরে পাবেন। তখনকার দিনে সত্যাশ্রয়ী এমন কালজ্ঞ মহাপুরুষদের ভবিষ্যদবাণী বা বর মিথ্যা হত না। ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে এ সবের মূল্য ছিল অপরিসীম। এ বিষয়েও দুর্যোধন উদাসীন ছিলেন বলে মনে হয়। বনবাসের প্রথম দিন থেকেই পাণ্ডবদের গতিবিধি, কার্যকলাপ, মন্ত্রণা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর কড়া দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। বনবাসে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিজ অনুগামী ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ করিয়ে, ছদ্মবেশে গুপ্তচর নিয়োগ করে ও অন্যান্য বহু উপায়ে দুর্যোধনের পক্ষে পাণ্ডবদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল না। কৃষ্ণ ও অন্যান্য মিত্র রাজন্যবর্গের কার্যকলাপও তাঁদের রাজধানীতিতে নিযুক্ত চরদের সাহায্যে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। পাণ্ডবগণ কৌরবদের উপর যে প্রতিশোধ নেবেনই সে বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত ছিল না। তাঁরা যে এজন্য নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করবেন তাও সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দুর্যোধন বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয়না। দিলেও পদক্ষেপগুলি কার্যকর হয়নি। পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েই যেন তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। বারণাবতের ব্যর্থ পরিকল্পনা থেকে দুর্যোধন কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেননি।

এরপর পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সরস্বতী নদীর তীরে এক মনোরম স্থানে আশ্রয় স্থাপন

করে বাস করতে লাগলেন। একদিন সেখানে মহামুনি মার্কণ্ডেয়র আবির্ভাব ঘটল। যথাবিহিত পূজিত হয়ে মহামুনি পাণ্ডবদের দিকে দৃষ্টিপাত করে হেসে উঠলেন। যুধিষ্ঠির এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বৎস, কোন আনন্দবশে আমি হাসিনি, আমার হঠাৎ সত্যব্রত দাশরথি রামচন্দ্রের কথা মনে পড়ল। তিনি প্রজ্ঞাবান ও ইন্দ্রতুল্য শক্তিমান হয়েও পিতার আদেশে বনবাসে গমন করে অশেষ দুঃখভোগ করেছিলেন। তুমিও ক্লেশকর বনবাসের শেষে রামচন্দ্রের ন্যায় নিজ শক্তিতে পুণরায় রাজ্যশ্রী লাভ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একদিন পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী নিজেদের মধ্যে বনবাসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, বনবাসে আমাদের এই নিদারুণ দুরাবস্থার জন্য যারা দায়ী সেই শত্রুদের কি আপনি সত্যই ক্ষমা করবেন? ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নেই বলেই সকলেই জানে, কিন্তু আপনাকে দেখে তার ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে। যে ক্ষত্রিয় মহাকালে তেজ প্রদর্শন না করে লোকে তাকে অবজ্ঞা করে। একদিন দানবরাজ বলি ধর্মজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ক্ষমা ও তেজের মধ্যে কোনটি শ্রেয়ষ্কর। প্রহ্লাদ বলেছিলেন, কেবল ক্ষমা ও তেজের দ্বারা কোন শুভফল সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা প্রদর্শন করে সে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না, শত্রু তাকে অনায়াসে পরাভূত করে। সেইরূপ রাজগুণ সম্পন্ন ক্রোধী ব্যক্তি যদি সর্বদা তেজ দ্বারা পরিচালিত হয় তবে সে নিজ শত্রু বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে অধঃপতিত হয়। প্রহ্লাদ বলিকে স্থান কাল পাত্র ভেদে তেজস্বিতা বা মৃদুভাব আশ্রয় করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। মহারাজ, আমার মনে হয় আপনার এখন তেজ প্রকাশ করার সময় এসেছে। পররাজ্য লোভী ধার্তরাষ্ট্রগণ আপনার অশেষ ক্ষতি সাধন করেছে। তাদের ক্ষমা করা কোনক্রমেই উচিত হবে না।

দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা প্রদান করে যুধিষ্ঠির বললেন, প্রিয়ে, সমস্ত অশুভ ঘটনা ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করতে পারে তারই মঙ্গললাভ হয়। আর অমঙ্গল আশ্রয় করে তাকেই, যে ক্রোধ সম্বরণ করতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতগণ ক্রোধশূন্য ব্যক্তিকেই তেজস্বী বলে বর্ণনা করেছেন। ক্ষমাগুণই সত্যপরায়ণ ব্যক্তির একমাত্র পরিচয়। আমি কীভাবে ক্ষমা পরিত্যাগ করতে পারি? আমার বিশ্বাস শান্তিকামী পিতামহ ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও অন্যান্য গুরুজনদের চেষ্টায় ধার্তরাষ্ট্রগণ তাঁদের বর্তমান বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করে আমাদের হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করবেন। লোভের বশে চালিত হলে তাঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুর্যোধন রাজকার্যে অযোগ্য। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা নেই। আমি যোগ্যতায় ধার্তরাষ্ট্রদিগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেজন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করেছে। আমি ক্ষমা অবলম্বন-করেই থাকব।

যুধিষ্ঠিরের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, এ পর্যন্ত আপনি সকল কর্ম ধর্মানুসারেই সম্পন্ন করেছেন। ধর্ম ব্যতিরেকে আপনি সবকিছু — এমনকি আপনার ভার্য্যা ও ভ্রাতাদের পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারেন। শুনেছি যে রাজা ধর্ম রক্ষা

করেন, ধর্ম তাঁকে রক্ষা করে থাকেন; কিন্তু দেখছি ধর্ম আপনাকে রক্ষা করছেন না। সরলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি নানা পদ গুণাবলীর অধিকারী হয়েও দ্যুত ক্রীড়ায় আপনার মতিভ্রম কী ভাবে সম্ভব হল তা বোধের অগম্য। আপনার বিপদ ও দুর্যোধনেরসম্পদ দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বর পক্ষপাতশূন্য নন। এই অপক্ষপাতিতার জন্য আমি বিধাতাকে তিরস্কার করছি।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, কল্যানী, আমি শাস্ত্রানুসারে ধর্মাচরণ করি, কোন ফলের আকাঙ্খায় করি না। তোমার অজানা নেই, বহু মুনিঋষি ধর্মসিদ্ধ কর্ম করে দেবতাদের চেয়েও বেশী গৌরব অর্জন করেছেন। ফল দর্শন না হলেও ধর্ম বা দেবতার দোষ দেখা উচিত নয়। তুমি নাস্তিকতা পরিত্যাগ কর। পরম দেবতাকে কোনরূপ অবমাননা করো না।

দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, আমি ধর্ম বা ঈশ্বরের নিন্দা করছি না, দুঃখে অধীর হয়ে আমার মনের অবস্থা জানাচ্ছি মাত্র। আমার আরও কিছু বলার আছে। আপনি অনুগ্রহ করে শুনুন। আমাদের এই বিপদের দিনে আপনি নিশ্চেষ্ট না থেকে পুরুষকার অবলম্বন করে কর্মে প্রবৃত্ত হোন। আজ হোক, কাল হোক, কর্মেই ফললাভ সম্ভব। কেবল দৈবের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না।

যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর বাদানুবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দুরাত্মা দুর্যোধন কপট দ্যূতে আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। প্রতিজ্ঞা রক্ষার নামে সামান্য ধর্মের জন্য রাজ্য সম্পদ হারিয়ে আপনি এই দুঃখ ভোগ করছেন। আপনার আনুগত্য মেনে আমরা বন্ধুদের দুঃখ ও শত্রুদের আনন্দ বর্জন করছি। আপনি ধর্ম ধর্ম করে সর্ব বিষয়ে উদাসীন থেকে পৌরুষবিহীন হয়ে পড়েছেন। যে ধর্ম দ্বারা নিজের ও মিত্রদের দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা ধর্ম নহে, তাহা পাপকর্ম, কুধর্ম। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কাজ এ ত্রিবর্গের সতত সমভাবে অনুশীলন করবে। কোন একটির উপর নির্ভর করবে না। এ কথা সত্য, ধর্মই জগতের মূল, কিন্তু অর্থ ব্যতিরকে ধর্মানুষ্ঠান সম্ভব নয়। বলের দ্বারাই অর্থ সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। আপনি, অর্জুন ও আমার সহায়তায় ক্ষাত্র ধর্মানুসারে ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিনষ্ট করুন। উৎকোচ দ্বারা শত্রুপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সম্ভব। দেবতারা তাঁদের চেয়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন অসুরদের নানা কৌশলে পরাজিত করেছিলেন। আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনি এইসব নীতিসমূহ সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করুন। মহারাজ, রাজ্যের অকালবৃদ্ধবনিতা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা আপনার প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আপনি কালবিলম্ব না করে হস্তিনাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করুন। কৃষ্ণ ও অন্যান্য মিত্র রাজন্যবর্গ ও আপনার বীর ভ্রাতাদের সহায়তায় আপনার পক্ষে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা একটুও কঠিন হবে না।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, ভ্রাতঃ! তোমার বাক্যে ব্যথিত হলেও তোমায় দোষ দিতে পারি না। তোমাদের বর্তমান দুরাবস্থার জন্য আমিই দায়ী। দুর্যোধনের রাজ্য হরণের ইচ্ছায় দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হয়েছিলাম। ধূর্ত শকুনি দুর্যোধনের প্রতিনিধি হিসাবে শঠতার

আশ্রয় নিয়ে দূত্যক্রীড়ায় আমাকে পরাস্ত করল। শকুনির শঠতা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ক্রোধে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে নিজেকে সংযত করতে পারিনি। পুরুষের ধৈর্যলোপ পেলে তার পৌরুষ প্রভৃতি সমস্ত গুণাবলীরই অবলুপ্তি ঘটে। আমারও তাই হয়েছিল। দ্বিতীয়, তার দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অর্জুন বা তুমি কোন আপত্তি তোলনি। এখন প্রতিজ্ঞামত দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হয়ে আমরা বার বৎসরের জন্য বনবাসে আছি। এরপর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। সর্ব সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করে এখন সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কোনক্রমেই উচিত হবে না। তুমি দ্যূত ক্রীড়ার সময় ক্রোধান্বিত হয়ে আমার বাহুদ্বয় ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলে। অর্জুন তোমাকে বাধা দেয়। কেন তুমি প্রতিজ্ঞার পূর্বে ক্রোধ প্রকাশ করলে না? এরফলে হয়তো আমি দূত্যক্রীড়া হতে বিরত হতাম। আমি দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় নীরব ছিলাম। এই দুঃখেই আমার হৃদয় আজ ক্ষতবিক্ষত। শরীরেও বল পাচ্ছি না। তবুও আমি বলব তুমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে না। আমরা আবার সুসময়ের মুখ দেখতে পাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যুধিষ্ঠিরের কথা ভীমের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারল না। ভীমের ক্রোধও প্রশমিত হল না। তিনি বললেন, মহারাজ, জীবন ক্ষণস্থায়ী। হয়তো এই তের বৎসর প্রতীক্ষা করতেই আমরা কালের গ্রাসে পতিত হব। আপনি সংগ্রামে শত্রুনাশ করে স্বোপার্জিত সম্পদ উপভোগ করুন। আমাদের এই ঘোর বিপদে আপনি শুধু কতকগুলি গুরুবচন আওড়াচ্ছেন, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারছেন না। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়ালু হয়ে কীভাবে ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করলেন? আপনি আমাদের এক বৎসর সংগোপনে রাখার অভিলাষ করেছেন। এ যেন তৃণ দিয়ে হিমালয় আচ্ছাদনের চেষ্টা। অর্জুনের ন্যায় কীর্তিমান বীর কীভাবে অজ্ঞাত হয়ে বিচরণ করবেন? সিংহ শিশুসম নকুল সহদেব কেমনে আপন পরিচয় গোপন রাখবেন? দ্রৌপদীর ন্যায় অপূর্ব সুন্দরী নারী কীভাবে আত্মগোপন করবেন? আমি অল্পবয়স থেকেই প্রজামন্ডলীর মধ্যে বিখ্যাত ও পরিচিত হয়ে এসেছি। আমারই বা অজ্ঞাতবাস কীভাবে সম্ভব? আর আপনার কীর্তি ও মাহাত্ম্য সর্বজনশ্রুত। আপনিই বা কোথায় কীভাবে আত্মগোপন করে বাস করবেন? আমি দৃঢ় নিশ্চিত দুর্যোধনের চর অজ্ঞাত অবস্থায় আমাদের খুঁজে বার করবেই এবং আমাদের আবার বনবাসে যেতে হবে। আমরা তের মাস বনবাসে আছি। এই তের মাসকে তের বৎসর মনে করে আপনি হৃতরাজ্য উদ্ধারে অগ্রসর হোন। সংগ্রামই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।

ভীমের বাক্য শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করলেন। অতঃপর বললেন, হে মহাবাহো! তুমি যা বলেছ তা যথার্থ বটে। তবে যে কাজ কেবল সাহসের উপর নির্ভর করে অনুষ্ঠিত হয় তা পাপে পরিপূর্ণ। উত্তম, মন্ত্রণা দ্বারা সর্বদিক বিচার করে পূণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করলে তা সাফল্যমন্ডিত হয়। দৈবের সহায়তাও পাওয়া যায়। তুমি বলদর্পিত হয়ে চপলতাবশতঃ এক দুঃসাহসিক কার্যে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছ। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তোমার সম্যক উপলব্ধি নেই। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এবং দুর্যোধন প্রমুখ

ধার্তরাষ্ট্রগণ সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। নির্বিচারে অস্ত্র নিক্ষেপের ক্ষমতাও তাঁদের অসাধারণ। আমাদের হস্তে নিগৃহীত রাজন্যবর্গ এখন কৌরবদের মিত্র। বহু বীরপুরুষদের দুর্যোধন নানাভাবে সম্মানিত করেছে। তাঁরা কৌরবদের পক্ষে সংগ্রাম করে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য সমদৃষ্টিসম্পন্ন হলেও রাজপ্রদত্ত ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ধার্তরাষ্ট্রদিগের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন সন্দেহ নেই। এঁরা সকলেই দিব্যাস্ত্রে ভূষিত, দেবগণেরও অজেয়। মহারথ কর্ণ অসাধারণ ক্রোধ পরায়ণ। তাঁর দেহ অভেদ্য কবচে আবৃত। তাঁর সম্মুখীন হওয়া সহজসাধ নয়। অন্যদিকে তুমি এখন সহায় সম্বলহীন। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কৌরবদের পরাস্ত করা অসম্ভব মনে হচ্ছে।

যুধিষ্ঠিরের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে ভীম তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন। এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, আমি দিব্য প্রভাবে তোমার মনের অবস্থা জানতে পেরেছি। ভীষ্মাদি বীরগণ যাতে তোমাদের বিপদের কারণ না হন আমি তার উপায় উদ্ভাবন করেছি।

এই বলে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একান্তে ডেকে নিয়ে সর্বসিদ্ধিস্বরূপ প্রতিস্মৃতিনাম্নী বিদ্যা প্রদান করলেন। তিনি জানালেন এই বিদ্যার প্রভাবে অর্জুন দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করে বহু দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হবেন। ব্যাসদেবের উপদেশ মত যুধিষ্ঠিরের কাছে উক্ত রহস্য বিদ্যা অধ্যয়ন করে অর্জুন নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির ও ভীমের যুক্তিতর্কের মধ্যে আমরা ক্ষমা, সত্যরক্ষা, ধর্ম, যুদ্ধ ও গুপ্তচরের ভূমিকা প্রভৃতি নানাবিষয়ের বহু নীতিকথা শুনতে পাই। প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যেই কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে। ক্ষমা সম্বন্ধে দ্রৌপদীর অভিমতই বাস্তবসম্মত। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু যিনি নির্বিচারে ক্ষমা করেন তিনি সকলেরই অবজ্ঞার পাত্র হন এবং শেষে অপার দুঃখে নিমজ্জিত হন। আবার সর্বদা তেজ প্রদর্শন শত্রু বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠে। সেজন্য অতি মৃদুতা ও অতি তেজ — উভয়ই দোষণীয়। কর্মদ্বারাই সাফল্য অর্জন সম্ভব, এজন্য কেবল দৈবের উপর নির্ভর করা অনুচিত — দ্রৌপদীর এই উক্তির মধ্যে সত্যতা আছে। যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতে শকুনির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তবু তিনি ধর্মের নামে রাজ্য সম্পদ হারিয়ে ভার্য্যা ও ভ্রাতাদের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় শর্তানুযায়ী বনবাসে গেলেন। এ যেন এক ছেলেখেলা তাও আবার ধর্মের নামে। ভীম যুধিষ্ঠিরের এই ধর্মজ্ঞানকে নিন্দা করে অন্যায় কিছু করেননি। যুধিষ্ঠির নিজেও দ্যূতসভায় তাঁর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। হৃতরাজ্য উদ্ধারের মানসে কৌরবদের বিরুদ্ধে এখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ভীমের প্রস্তাব বাস্তবসম্মত ছিল না। যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছিলেন সবদিক ভালভাবে বিবেচনা না করে হঠকারিতার বশে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কৌরবদের বলবীর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষের এই যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব

হয়েছিল। পান্ডবগণ তখন সহায় সম্পদহীন বনবাসী। তাঁদের পক্ষে শক্তিশালী কৌরবদের পরাস্ত করা অসম্ভব। যুধিষ্ঠিরের এই যুক্তি ভীমও মেনে নিয়েছিলেন। এখন পান্ডবদের শক্তি সঞ্চয়ের সময় একথা বুঝেই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের নির্দেশমত অর্জুনকে দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন। পান্ডবদের মত সর্বজনখ্যাত ব্যক্তিদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকার অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ভীমের আশঙ্কা অযৌক্তিক ছিল না। দুর্যোধনের চরেরা তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দেবে এবং তাঁদের আবার বনবাসে যেতে হবে — ভীমের এই ধারণা তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচয়। অবশ্য পান্ডবগণ তাঁদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। দুর্যোধনের গুপ্তচরগণ পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। দ্রৌপদী ও ভীমের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই যে জয়ী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নির্দেশিত পথেই পান্ডবদের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছিল তের বৎসর অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগের পর।

দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্জুনের হিমালয় যাত্রার সংবাদ কি দুর্যোধনের কোন গুপ্তচর পেয়েছিলেন ? মনে হয় না। কারণ দুর্যোধনের কোন গুপ্তচর অর্জুনকে অনুসরণ করেনি। অর্জুনকে তাঁর দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় দুর্যোধনের পক্ষ থেকে কোন বাধাও দেওয়া হয়নি। তা দুর্যোধনের একটি ব্যর্থতাই বলা চলে। অন্যদিকে সমস্ত সংবাদটি গোপনে রেখে পান্ডবগণ মন্ত্রণাসংগুপ্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

এদিকে অর্জুন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের মানসে হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হয়ে অবশেষে ইন্দ্রনীল পর্বতে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে এক তপস্বীর বেশে অবস্থান করছিলেন। তিনি অর্জুনের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে প্রসন্ন হয়ে আপন পরিচয় দিয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তাঁর কাছ থেকে সমগ্র অস্ত্রবিদ্যা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে দেবরাজ অর্জুনকে প্রথমে মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে উপদেশ দিলেন। দেবরাজ অদৃশ্য হলে অর্জুনের তপস্যা শুরু হল। একদিন মুক নামক দানব বরাহরূপ ধারণ করে তাঁর উপর আক্রমনোদ্যত হলে অর্জুন তার প্রতি শর নিক্ষেপ করলেন। ঠিক সেই সময় কিরাতবেশীর শঙ্করের শরও বরাহের গাত্র বিদ্ধ করল। কে প্রথমে শর নিক্ষেপ করেছে এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রথমে বাদানুবাদ ও পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে শঙ্কর নিজ পরিচয় দিয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। অর্জুনের প্রার্থনায় শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মশীর নামে পাশুপাত অস্ত্র প্রদান করে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের কৌশল শিখিয়ে দিলেন। শঙ্কর বললেন, পার্থ, মানুষের কথা দূরে থাক, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও পবনও এই অস্ত্রের প্রয়োগ বিধি জ্ঞাত নহেন। এই অস্ত্র অল্প তেজস্ব ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করলে সমস্ত জগত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই অস্ত্রে অবধ্য কেহই নেই।

এই বলে শঙ্কর অর্জুনের অঙ্গ স্পর্শ করে তাঁর সমস্ত ব্যথা দূর করে তাঁকে স্বর্গে গমন করতে নির্দেশ দিলেন।

শঙ্কর প্রস্থান করলে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী। সঙ্গে

যম, বরুন ও কুবের। অর্জুন যমের নিকটদন্ড, বরুণের নিকট পাশ ও কুবেরের নিকট অন্তর্ধান নামক দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র জানালেন অর্জুনকে মহৎ কার্যের জন্য স্বর্গরাজ্যে আসতে হবে এবং সেখানেই তিনি তাঁকে দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রদান করবেন। দেবতারা চলে গেলে মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথে অর্জুন স্বর্গরাজ্যে আগমন করলেন। সেখানে তিনি পাঁচ বৎসর ছিলেন নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করে। গন্ধর্ব চিত্রসেনের নিকট নৃত্য-গীত-বাদ্যও শিখলেন। এক রাত্রে অপ্সরা উর্বসী অর্জুনের গৃহে উপস্থিত হলেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে উর্বশী শাপ দিলেন, অর্জুন সম্মানহীন অবস্থায় নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের সহিত বাস করবেন। দেবরাজ সব শুনে অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বৎস, এই অভিশাপ পরে তোমার উপকারে আসবে, চিন্তা করো না।

একদিন মহর্ষি লোমশ নানাস্থানে ভ্রমণ করে দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শন মানসে ইন্দ্রপুরীতে আগমন করলেন। সেখানে পান্ডুপুত্র অর্জুনকে দেবরাজের সহিত এক আসনে উপবিষ্ট দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেবরাজ তাঁর মনের অবস্থা বুঝে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, ইনি আমার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে এসেছেন বিশেষ কারণবশত অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। নিবাত কবচ নামে পাতালবাসী দানবরা এঁরই হস্তে নিহত হবে। এই কাজ সম্পাদন করে তিনি মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন করবেন। পান্ডবগণ এখন মর্তের কাম্যকবনে অবস্থান করছেন। আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভ্রাতা অর্জুনের মঙ্গল সংবাদ জানিয়ে বলবেন, তিনি অস্ত্রাদি সংগ্রহ করে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন।

ব্যাসদেব পান্ডবদের কার্যকলাপ সবই জানতেন। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অর্জুনের দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের বিষয়ে জানালে তিনি মহা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ধৃতরাষ্ট্র সারথী সঞ্জয়কে বললেন, মনে হয় দুর্যোধন শীঘ্রই রাজ্যচুত হবেন। কৌরবপক্ষে এমন কোন বীর দেখি না যিনি গান্ডীবধারী অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হতে পারেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, মহারাজ, শুনেছি অর্জুন ভগবান শঙ্করকে পরিতুষ্ট করে তাঁর নিকট অমোঘ অস্ত্র লাভ করেছেন। পান্ডবগণ এখন দেবতাদেরও অজেয়। ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত পান্ডবদের হস্তে আপনার পুত্রদের মৃত্যু অবশম্ভাবী সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে বিলম্বে হলেও গুপ্তচরগণ দ্বৈতবনে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য রাজাদের আগমন ও পান্ডবদের সহিত তাদের আলোচনার বিবরণ সংগ্রহ করে হস্তিনাপুর রাজসভায় প্রেরণ করল। কৃষ্ণের ভবিষ্যতবাণী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র হাহাকার করে উঠলেন। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, বিদুর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন আমরা পান্ডবদের দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত করলে, কুরুকূল বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সন্দেহ নেই বিদুরের কথাই কার্যে পরিণত হতে চলেছে।

পান্ডবগণ এখন কাম্যক বনে বাস করছেন। বহুদিন অর্জুন তাঁদের মধ্যে নেই। তাঁর বিরহে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের দুঃখের সীমা নেই। একদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনাকালে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজন, আমরা মহাপরাক্রান্ত হয়েও কেবল আপনার দ্যূত ক্রীড়ার দোষেই এমন দুরবস্থায় পতিত হয়েছি। আমি মনে করি বার বৎসর অতিক্রান্ত

হওয়ার পূর্বেই কৃষ্ণের সহায়তায় আমাদের ধার্তরাষ্ট্রদের বিনষ্ট করা উচিত। তাঁদের বিনষ্ট করে আবার আমরা বনে আগমন করব। এরূপ করলে আমাদের কোন দোষ হবে না। ধার্তরাষ্ট্রদের হত্যাজনিত পাপ আমরা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা স্খালন করতে পারব। কপটচারীদের বিনষ্ট করার মধ্যে আমি কোন অন্যায় দেখি না। আমরা বার বৎসর বনে কাটিয়েছি। এখনও আরও এক বৎসর অতিকষ্টে অতিবাহিত করতে হবে। শাস্ত্রমতে এক আহোরাত্র এক বৎসর বিবেচিত হয়। আর একদিন গত হলেই তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে মনে করতে পারি এবং তখন দুর্যোধনের নিধন সময়ও উপস্থিত হবে। আমি পূর্বে বলেছি এবং এখনও বলছি পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে অজ্ঞাতবাসের সময় দুর্যোধনের চররা আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে না। আমাদের পুণরায় বনবাসে আসতে হবে। আর যদি আমরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণও করতে পারি, দুর্যোধন আবার আমাদের দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করে বনে প্রেরণ করবে। আপনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করুন।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, হে মহাবাহো, তের বৎসর পূর্ণ হলে তুমি সমস্ত অনুচর সহ পাপিষ্ঠ দুর্যোধনকে বধ করতে পারবে। এ জন্য কোন ছলনার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিজ্ঞা মত আমাদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকতেই হবে।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যে ভীম শান্ত হলেন। এমন সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব সেখানে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির তাঁকে তাঁদের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন তাঁর মত অন্য কোন রাজা এমন দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছেন কিনা। মহর্ষি বৃহদশ্ব তখন নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান বর্ণনা করে শুনালেন। আমাদের এ কাহিনী আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ এই কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই কেমনে দময়ন্তী চরণীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিশেষ উপায় অবলম্বনে তাঁর নিরুদিষ্ট পতিকে উদ্ধার করেছিলেন।

নল ছিলেন নিষধদেশের রাজা — রূপ, গুণে, পরাক্রান্তে অদ্বিতীয়। দ্যূত ক্রীড়া ও অশ্বতত্ত্ব বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। দময়ন্তী ছিলেন বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা, অসামান্য গুণবতী ও রূপলাবণ্য সম্পন্না। দেবতারাও তাঁকে দেখে আনন্দিত হলেন। অনেকেই কৌতুহলবশে নলের কাছে দময়ন্তীর ও দময়ন্তীর কাছে নলের প্রশংসা করত। এর ফলে নল ও দময়ন্তী একে অন্যকে না দেখেই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলেন। একদিন নল নির্জন উদ্যানে ভ্রমণ করার সময় কয়েকটি সুবর্ণপক্ষ বিশিষ্ট হংস দেখতে পেয়ে একটিকে ধরে ফেললেন। হস্তে আবদ্ধ অবস্থায় হংস বলল, রাজন্! আমায় বধ করবেন না। আমি আপনার প্রিয় কার্য সাধন করব। আমি রূপেগুণে অদ্বিতীয়া বিদর্ভরাজ কন্যা দময়ন্তীর কাছে আপনার গুণাবলীর কীর্তন করব যাতে তিনি কেবল আপনার প্রতিই অনুরক্ত থাকেন। নল সন্তুষ্ট হয়ে হংসকে মুক্ত করে দিলেন। হংস প্রতিশ্রুতিমত দময়ন্তীর সমীপে উপনীত হয়ে নলের নানা গুণাবলীর উল্লেখ করে বলল, হে রাজকুমারী, আপনি যেমন নারীরত্ন, নলও তেমনই পুরুষশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মিলন সর্বতোভাবে শুভকর। দময়ন্তীর সম্মতি পেয়ে হংস নলকে সব জানাল।

এদিকে বিদর্ভরাজ কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করে বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ জানালেন। দেবর্ষি নারদের নিকট সংবাদ পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম স্বয়ম্বর সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পথে নলের সাক্ষাত পেলেন। তিনিও স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছেন। ভাগ্যের এমনি পরিহাস দেবতাদের আদেশে নল নিজেই দময়ন্তীর সমীপে তাঁদের দূত হিসাবে উপস্থিত হলেন। দময়ন্তী অপরিচিত নলকে দেখে বললেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি কে? কী নিমিত্তই বা এখানে আগমন করেছেন? আপনাকে দেখে আমি আমার হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করতে পারছি না। নিজের পরিচয় গোপন রেখে নল বললেন, হে কল্যাণী, আমি দেবদূত। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম তোমাকে ভার্য্যারূপে পেতে অভিলাশী। তুমি এঁদের মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ কর। আমি দেবতাদের প্রভাবেই সকলের অলক্ষিতে এই পুরমধ্যে প্রবেশ করেছি। দময়ন্তী বুঝতে পারলেন এই দেবদূতই নিষধরাজ নল। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে দেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করব। নল প্রত্যুত্তরে বললেন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দেবতাদের দূতরূপে এখানে এসেছি। এখন আমি আপন স্বার্থসাধনে কীভাবে প্রবৃত্ত হব? দময়ন্তী বললেন, আমি এক নির্দোষ উপায় নির্দেশ করছি। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিন। আমি আপনাকে চিনে নিয়ে আপনার কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করব।

স্বয়ম্বর সভায় দময়ন্তী উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে পাঁচজনের চেহারার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পেলেন না। সকলকেই নল বলে মনে হল। নলকে চিনতে না পেরে দময়ন্তী দেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, আমি নিষধরাজকে পতিত্বে বরণ করেছি। অন্য পুরুষ গ্রহণ করে আমি যেন পাপাচারিণী না হই। আমায় আর্শীবাদ করুন আমি যেন নলকে চিনে নিতে পারি। ইন্দ্র প্রমুখ চারজন দেবতা দময়ন্তীর বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নলরূপ দেহ ধারণ করে সয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর করুণ প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয় দেবগণ নিজ নিজ বেশ ধারণ করলে দময়ন্তী নলকে চিনতে পেরে তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করলেন। বিবাহের পর নল দময়ন্তীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন।

দময়ন্তী স্বর্গের দেবতাদের উপেক্ষা করে মর্তের একজন রাজাকে পতিরূপে গ্রহণ করেছেন জানতে পেরে কলি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। দেবতারা জানালেন, দময়ন্তীর কোন অপধার নেই; আমাদের বরেই এই বিবাহ সম্ভব হয়েছে। নল সর্বগুণ সম্পন্ন নরপতি। যে কোন নারীই নলকে পতিরূপে পেতে আগ্রহী। নল ও দময়ন্তীর যিনি ক্ষতি করবেন, তাঁর অশেষ দুঃখভোগ আছে।

দেবতাদের কথায় কলির ক্রোধের কোন উপশম হল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আমি নলকে রাজ্যচ্যুত করে দময়ন্তীর সহিত তার বিচ্ছেদ ঘটাব।

কলি নিষধরাজ্যে আগমন করে নলের দোষ অণ্বেষণে মত্ত হলেন। একদিন নলকে অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা উপাসনা করতে দেখে কলি তাঁর দেহে প্রবেশ করল। এর ফলে

নলের ঘটল বুদ্ধিভ্রংশ। কলির চক্রান্তে ভ্রাতা পুষ্করের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় বসলেন এবং পরাজিত হলেন। শর্তমত তাঁর রাজ্যসম্পদ চলে গেল পুষ্করের হাতে, আর তিনি একবস্ত্রে ভার্য্যা দময়ন্তীর সহিত বনে গমন করলেন।

নল ও দময়ন্তী ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। একদিন কয়েকটি পাখি হঠাৎ ছোঁ মেরে নলের পরিহিত বস্ত্র হরণ করে আকাশে উড়ে গেল। আসলে পাখিগুলি ছিল দ্যূতক্রীড়ার অক্ষ। কলির চক্রান্তেই এসব ঘটল। দময়ন্তীর বস্ত্রে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করে দুজনে এক নির্জন স্থানে সন্ধ্যা আগমনে নিদ্রা গেলেন। নিদ্রাভঙ্গ হলে দময়ন্তী নলকে দেখতে না পেয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। দেখলেন তাঁর বস্ত্রের অর্দ্ধাংশও অন্তর্হিত। নলের অন্বেষণে বেরিয়ে তিনি আর এক বিপদে পড়লেন। এক অজগর তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। সেই সময় একজন ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হয়ে অজগরকে বধ করলে দময়ন্তী প্রাণে রক্ষা পেলেন। কিন্তু ব্যাধ ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। সে কামার্ত অবস্থায় তাঁর দিকে অগ্রসর হলে দময়ন্তী তাকে শাপে ভস্মীভূত করে ফেললেন। নলের অন্বেষণে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দময়ন্তী এক সময় এক আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তাপসগণ তাঁকে জানালেন তিনি শীঘ্রই নিষধরাজ নলের সাক্ষাত পাবেন। এরপর দময়ন্তী একদল বণিককে দেখে তাদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। রাত্রিতে এক জলাশয়ের তীরে অবস্থানের সময় দুইদল হস্তী জলপান করতে এসে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। হস্তিপদপৃষ্ট হয়ে বণিকদের মধ্যে অনেকে হতাহত হলে তারা মনে করলো দময়ন্তীর উপস্থিতির জন্যই তাদের এই দূরবস্থা। অবশিষ্ট বণিকেরা দময়ন্তীকে সেইস্থানে রেখে অগ্রসর হল। দময়ন্তী তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে দিনের শেষে চেদি দেশাধিপতি সুবাহুর রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। রাজমাতা প্রাসাদ থেকে দময়ন্তীকে দেখতে পেয়ে দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে অন্তঃপুরে আশ্রয় প্রদান করলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্তী কেবল বললেন, আমি সদ্‌কুলোদ্ভব পরগৃহস্থ পরিচারিকা। দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যধন হারিয়ে আমার স্বামী একবস্ত্রে বনে গমন করলে আমিও তাঁর অনুগমন করি। বনে অবস্থানকালে সেই বস্ত্রখন্ড হতেও তিনি বঞ্চিত হন। এক রাত্রিতে আমার বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ কেটে নিয়ে আমায় পরিত্যাগ করে তিনি অন্তর্ধান হন। সেই থেকে আমি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

এদিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বনমধ্যে প্রজ্বলিত দাবানলের মধ্যে কর্কোটক নামে ভীষণ দর্শণ এক ভুজঙ্গকে দেখতে পেলেন এবং তার প্রার্থনায় তাকে উদ্ধার করে আনলেন। উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে কর্কোটক নলের মস্তকে দংশন করলে তাঁর পূর্বতন রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল। কর্কোটক সান্ত্বনা দিয়ে নলকে বলল, অন্য কেউ আপনাকে যাতে চিনতে না পারে সে জন্যই আমি আপনাকে দংশন করেছি। যে দুষ্ট শক্তি আপনার ভিতরে প্রবেশ করে আপনার এই দুঃখকষ্টের কারণ হয়েছে, সেই দুরাত্মা আমার বিষে জর্জরিত হয়ে অতি কষ্টে আপনার শরীর মধ্যে বাস করবে। আপনি এখন অযোধ্যা নগরীতে রাজা ঋতুপর্ণের কাছে গমন করুন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, আপনি সারথী, নাম বাহুক। রাজা আপনার গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে আপনার

পরম মিত্র হয়ে উঠবেন। আপনি অচিরেই ভার্য্যা ও রাজ্যসম্পদ ফিরে পাবেন।

কর্কোটকের উপদেশ মত নল অযোধ্যা নগরীতে রাজা ঋতুপর্ণের কাছে নিজেকে একজন অশ্ববিশেষজ্ঞ বলে পরিচয় দিলে তিনি তাঁকে তাঁর অশ্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। নলের সুখ সাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব থাকল না। কিন্তু দময়ন্তী একাকিনী কোথায় কীভাবে আছেন এই চিন্তায় তিনি সদা বিমর্ষ। নিজের প্রকৃত পরিচয় ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী তিনি কাকেও জানালেন না। আরম্ভ হল তাঁর অজ্ঞাতবাস রাজা ঋতুপর্ণের আলয়ে।

বিদর্ভরাজ ভীম জনশ্রুতিতে জানতে পারলেন নল ও দময়ন্তীর ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ। তিনি তাঁদের সন্ধানে নানা স্থানে বহু ব্রাহ্মণদের প্রেরণ করলেন। এদের মধ্যে সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চেদি নগরের রাজ প্রসাদে রাজমাতার সঙ্গে এক নারীকে দেখে দময়ন্তী বলে চিনতে পারলেন। তিনি দময়ন্তীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর পুত্র কন্যা সহ অন্যান্য সকলের কুশল সংবাদ জানালেন। সুদেব রাজমাতাকে দময়ন্তীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করলে রাজমাতাও দময়ন্তীর দেহে জড়ুল চিহ্ন দেখে তাঁকে আপন ভগিনীর কন্যা বলে চিনতে পারলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দময়ন্তী পিতৃভবন প্রত্যাবর্তন করলেন। বিদর্ভরাজ ভীম উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে সুদেবের কাজের স্বীকৃতি দিলেন।

নল বিরহে দময়ন্তীর মনে কোন শান্তি নেই। রাণীর নিকট দময়ন্তীর মনঃকষ্টের কথা শুনে বিদর্ভরাজ নলের অন্বেষণে তার অধীনস্থ ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের আদেশ দিলেন। যাত্রার পূর্বে দময়ন্তী নিজে কাউকেও না জানিয়ে ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে তাঁদের কাজ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, আপনারা বিভিন্ন রাজসভায় এই কথাগুলি বারবার উচ্চারণ করবেন — হে দ্যূতকার, তোমার প্রণয়িনী তোমাতেই অনুরক্ত। তুমি তাঁর বস্ত্রার্ধ ছিন্ন করে নিদ্রিত অবস্থায় একাকিনী অরণ্যে ফেলে কোথায় গিয়েছ? তিনি বস্ত্রার্ধ পরিধান করে তোমার অপেক্ষায় রোদন করছেন। তুমি প্রসন্ন হয়ে তাঁর বাক্যের উত্তর দেও। আপনারা আরও বলবেন, — পত্নীকে রক্ষা করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। তুমি ধর্মজ্ঞ হয়েও কেন অন্যরূপ ব্যবহার করছ। কেউ আপনাদের কথার উত্তর দিলে তাঁর নাম, ধামস্থান, পেশা ইত্যাদি সকল বিবরণ স্মরণ করে আমাকে এসে জানাবেন। আমার নির্দেশেই যে আপনারা এই কথাগুলি বলছেন তা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। কার্য শেষে আপনারা অতি শীঘ্র প্রত্যাগমন করবেন।

বহুকাল গত হলে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ফিরে এসে দময়ন্তীকে বললেন, আমি অযোধ্যা নগরীতে মহারাজ ঋতুপর্ণের সভায় আপনার কথাগুলি ঘোষণা করেছি ; তিনি বা তাঁর পরিষদবর্গের কেউই কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। আমি যখন বেরিয়ে আসছি তখন বাহুক নামে এক রাজপুরুষ নির্জনে আমাকে আহ্বান করলেন। তিনি দেখতে অতি কদাকার ও খর্ববাহু, রাজার সারথীর কাজ করেন। অতিদ্রুত অশ্বচালনায় ও রন্ধনকার্যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রোদন করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর বললেন, 'সতী নারী বিপদে পড়লেও আপন শক্তিতে নিজেকে রক্ষা করেন,

স্বামীদ্বারা পরিত্যক্ত হয়েও ক্রুদ্ধ হন না। নলনৃপতি পক্ষীদ্বারা হৃতবসন হয়ে ব্যথিত মনে অতিকষ্টে দিন যাপন করছেন'। আমি বন্ধুর মুখে এই কথা শুনে আপনাকে জানালাম।

দময়ন্তী এই সংবাদ মাতাকেই কেবল জানালেন, পিতাকে কিছুই বললেন না। মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে সুদেবকে ডেকে এনে বললেন, দ্বিজবর, আপনি দ্রুতগামী যানে এখনই অযোধ্যা নগরীতে গমন করুন। সেখানে রাজা ঋতুপর্ণকে জানাবেন বীদর্ভরাজ কন্যা দময়ন্তীর জন্য পুণরায় স্বয়ংম্বর সভার অয়োজন করা হয়েছে। আপনি দময়ন্তীকে লাভ করতে আগ্রহী হলে এখনই স্বয়ংম্বর সভায় যোগদান করুন। স্বামী নলরাজ জীবিত আছেন কি না সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে দময়ন্তী এই স্বয়ংম্বরে সম্মতি দিয়েছেন।

রাজা ঋতুপর্ণ সুদেবের নিকট এই সংবাদ পেয়ে স্বয়ংম্বর সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে অশ্ববিশেষজ্ঞ ছদ্মনল বাহুকের সারথ্যে বায়ুবেগগামী অশ্বচালিত রথে সুতপুত্র বার্ষ্ণেসের সঙ্গে এক দিনেই বিদর্ভ নগরে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা ঋতুপর্ণ ছিলেন গণনা বিশারদ ও অক্ষ হৃদয়জ্ঞ। তিনি পথিমধ্যে নলের নিকট অশ্বহৃদয় শিখে অক্ষহৃদয় তাঁকে দান করলেন। তখনই কর্কোটক বিষ উদ্ধার করল এবং সেই সঙ্গে কলি নলের শরীর থেকে বেরিয়ে এল। অন্যের অলক্ষিতে কলি নলকে বলল, মহারাজ, আমাকে শাপ দেবেন না, আমি আপনাকে অপার কীর্তি দান করব। যে ব্যক্তি, আপনার নাম কীর্তন করবে তাকে কখনই কলি-ভয় স্পর্শ করবে না।

এই বলে কলি এক বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল।

নল কলির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সন্তাপমুক্ত হলেন; কিন্তু তাঁর রূপ আগের মতই বিকৃত রইল।

রাজা ঋতুপর্ণের রথ মেঘের গর্জনের ন্যায় শব্দ করে বিদর্ভ নগরে পৌঁছলে দময়ন্তী শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন রাজা ঋতুপর্ণের সহিত নলেরই আগমন হয়েছে। কারণ নলচালিত রথের শব্দ তাঁর অতিপরিচিত।

বিদর্ভরাজ ভীম রাজা ঋতুপর্ণকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে স্বাগত জানিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কন্যা বা পত্নী কেউই তাঁকে স্বয়ংম্বর সভার কথা কিছুই বলেন নি। রাজা ঋ তুপর্ণও আশ্চর্য বোধ করলেন না। তিনি রাজধানীতে স্বয়ংম্বর সভার কোন আয়োজনও দেখতে পেলেন না। এই সব চিন্তা করে তিনি বললেন, —আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি।

বিদর্ভরাজ বললেন— আপনি পথশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত। এখন বিশ্রাম করুন, পরে আলে চনা হবে। এই বলে তিনি রাজা ঋতুপর্ণকে অতিথিশালায় প্রেরণ করলেন।

র জধানীতে পৌঁছে নল অশ্বদিগের পরিচর্যা করে অশ্বচালকদের জন্য নির্দিষ্ট ভবনে বিশ্রাম করতে লাগবেন।

এদিকে দময়ন্তী প্রাসাদ থেকে বিকৃত দেহধারী বাহুককে দেখে শোকার্ত হয়ে নলের অন্বেষণে কেশিনী নামে এক দূতীকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কেশিনীকে বললেন, তুমি রথশালায় গমন কর। সেখানে হ্রস্ববাহু ও বিকৃত দেহধারী অযোধ্যানগর হতে আগত

রথ চালককে দেখতে পাবে। তাঁকে বিনীতভাবে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে। কথা প্রসঙ্গে পর্ণাদের বাক্যগুলি ওঁকে শোনাবে ও প্রত্যুত্তর স্মরণ করে আমাকে বলবে।

এই বলে দময়ন্তী পর্ণাদের বাক্যগুলি কেশিনীকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

নির্দেশমত কেশিনী রথ শালায় বাহুককে স্বাগত জানিয়ে ও কুশলাদি জিজ্ঞাদা করে বলল, মহাশয়! আপনি কখন নিজ নগর হতে যাত্রা করেছেন এবং এখানে আগমনের উদ্দেশ্যই বা কি? রাজকন্যা দময়ন্তী এ সংবাদ জানতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

বাহুক বললেন, ভদ্রে! কোশল রাজ দ্বিজমুখে কল্য দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংম্বরের সংবাদ পেয়ে মনের গতি সম্পন্ন অশ্বসমূহের সাহায্যে এখানে আগমন করেছেন। আমিই মহারাজের সারথী।

তাঁদের সঙ্গের তৃতীয় ব্যক্তিটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বাহুক বললেন, এই তৃতীয় ব্যক্তি পূর্বে নলরাজের সারথী ছিলেন, বার্ষ্ণেয় বলে খ্যাত। নলরাজের অবর্তমানে ইনি মহারাজ ঋতুপর্ণের সারথীর পদ গ্রহণ করেছেন। আমি একজন অশ্ববিশেযজ্ঞ বলে মহারাজ আমাকেও তাঁর সারথ্য পদে নিযুক্ত করেছেন। রন্ধন কার্যে পারদর্শিতার জন্য আমি তাঁর রন্ধনশালাতেও নিযুক্ত আছি।

কেশিনী জিজ্ঞাসা করল, নলরাজ কোথায় আছেন বার্ষ্ণেয় কি তাহা জানেন?

বাহুক বললেন, বার্ষ্ণেয় নলরাজের কোন সংবাদ জানেন না। নলরাজ এখন সৌন্দর্যভ্রষ্ট হয়ে ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমন করছেন। শুনেছি বার্ষ্ণেয় নলরাজের সন্তানদ্বয়কে এখানে রেখে গেছেন।

কেশিনী বলল, স্মরণ আছে অযোধ্যানগরীতে একজন ব্রাহ্মণ আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার পত্নী দময়ন্তী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করেছিলেন? আপনি তার উত্তরও দিয়েছিলেন। দময়ন্তী পুনরায় তাহা শ্রবণ করতে উৎসুক।

কেশিনীর বাক্য শ্রবণ করে বাহুক বেশী নলরাজ দুঃখে কাতর হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। নিজেকে অনেকটা সংযত করে তিনি ব্রাহ্মণকে যা বলেছিলেন কেশিনীর কাছে তারই পুনরুক্তি করলেন।

কেশিনীর কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে দময়ন্তীর দৃঢ় ধারণা হল কোশল রাজের রথ চালক বাহুকই তাঁর স্বামী নলরাজ। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তিনি কেশিনীকে পুনরায় বাহুকের নিকট পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেশিনীকে বললেন, তুমি রথশালায় গিয়ে কাছ থেকে বাহুকের সকল কার্য্যাবলীর উপর নজর রাখবে। তিনি আগুন বা জল চাইলেও তা তুমি দেবে না। তাঁর দেহে বা কার্যে কোন লৌকিক বা অলৌকিক লক্ষণ দেখলে আমাকে জানাবে।

নির্দেশমত কেশিনী সব কিছু নিরীক্ষণ করে এসে দময়ন্তীকে বলল, আমি এমন মানুষ কোথাও দেখি নি বা শুনিনি। জল প্রভৃতি অনেক পদার্থ বাহুকের আজ্ঞাবহ। দেখলাম শঙ্কুচিত দ্বার তাঁর আগমনে আপনা থেকেই প্রসারিত হল; তাঁকে অবনত হতে হল না। শূন্য পাত্রগুলি তাঁর দৃষ্টিতে জলপূর্ণ হল। সূর্যকে ধ্যান করা মাত্র জ্বালানি সমূহ আগুনে

জ্বলে উঠল। অগ্নি স্পর্শ করলেও তিনি অদগ্ধ রইলেন। পুষ্প মর্দিত হলেও বিকৃত হল না, বরং অধিক সৌরভ বিস্তার করল। আমি এইসব অদ্ভুত লক্ষণ দেখে তাড়াতাড়ি আপনাকে জানাতে এসেছি।

বাহুকের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে দময়ন্তী কেশিনীকে তাঁর নিকট আর একবার প্রেরণ করে তাঁর রন্ধনকরা মাংস আনয়ন করলেন। সেই মাংস ভক্ষণ করে দময়ন্তী বুঝলেন ইহা নলের দ্বারাই প্রস্তুত হয়েছে। রথচালক বাহুকই যে ছদ্মবেশী নলরাজ সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে দময়ন্তী এবার নিজ সন্তানদ্বয় ইন্দ্রসেনা ও ইন্দ্রসেনকে কেশিনীর সঙ্গে বাহুকের নিকট প্রেরণ করলেন। তাদের দেখে বাহুকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি অঝোরে রোদন করতে লাগলেন। কেশিনীকে বললেন, ভদ্রে, নিজ সন্তানসদৃশ এদের দেখে আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারি নি। এখানে আমি অতিথী। তোমার পক্ষে বার বার আমার নিকট আসা উচিত নয়।

দময়ন্তী মাতাকে সব বিবরণ জানিয়ে বললেন ছদ্মবেশী বাহুকই নলরাজ। বিদর্ভরাজ পত্নীর নিকট এই সংবাদ শুনে তৎক্ষণাৎ বাহুককে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করলেন। দময়ন্তী বাহুকের উদ্দেশে বললেন, হে বাহুক, আমাকে বল, কেন নলরাজ আমাকে বন মধ্যে একাকিনী রেখে পলায়ন করলেন? বিবাহের সময় তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা তিনি কী ভাবে ভুলে গেলেন?

বাহুক বললেন, আমি নিজ দোষে রাজ্য হারাই নি বা তোমাকে পরিত্যাগ করি নি। কলির দুষ্ট প্রভাবে এ সব সংঘঠিত হয়েছে। সেই পাপাত্মা কলি আমার তপস্যার গুণে আমার দেহ থেকে এখন নিক্রান্ত। আমাদের দুঃখের অন্ত হতে আর দেরী নেই। আমি তোমার নিমিত্তই এখানে এসেছি।

দময়ন্তী তখন বনমধ্যে কীভাবে নানা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে চেদিরাজের ভবনে আশ্রয় পেলেন তার বর্ণনা দিলেন। পরে বললেন, আমিই আপনাকে এখানে আনয়নের উদ্দেশ্যে আমার দ্বিতীয় স্বয়ংম্বর সভার কথা ঘোষণা করেছিলাম। আমি শপথ নিয়ে বলছি আমি কোন অসদাচরণ করি নি। কোন পাপ করে থাকলে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু আমার প্রাণ হরণ করুন।

এমন সময় বায়ু অন্তরীক্ষ হতে ঘোষণা করলেন, নল, দময়ন্তীর সব কথাই সত্য। কোন পাপই তাঁকে স্পর্শ করে নি। অনেক দুর্ভোগের পর তোমরা মিলিত হয়েছ। সব সংশয় পরিত্যাগ করে সুখে কালাতিপাত কর।

তখনই আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, দেব দুন্দুভি বেজে উঠল এবং সুগন্ধ বায়ু চারিদিক আমোদিত করল। সকল সংশয় মুক্ত হয়ে নলরাজ দময়ন্তীর হস্তদ্বয় নিজের হাতে গ্রহণ করলেন।

নাগরাজ কর্কোটকের আশীর্বাদে সেই মুহূর্তে নলরাজ নিজের পূর্বের কান্তিময় রূপ ফিরে পেলেন। নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলনে আনন্দ মুখর হয়ে উঠল সমগ্র বিদর্ভনগরী। রাজা ঋতুপর্ণ আনন্দিত মনে উভয়কে অভিনন্দিত করে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

নলরাজ অচিরেই দময়ন্তীকে নিয়ে আপন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুষ্করকে দ্যুত ক্রীড়ায় হারিয়ে হৃতরাজ্য অধিকার করে নিলেন। অবসান হল তাঁদের দুঃখের জীবন।

নলোপাখ্যান শেষ করে ঋষি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, নলরাজের মত তুমিও এই দুঃখ ভোগের পর রাজ্য সম্পদ ফিরে পাবে। তুমি যাতে পুনরায় দ্যুত ক্রীড়ায় পরাজিত না হও সেজন্য আমি তোমায় আমার জ্ঞাত সমগ্র অক্ষ বিদ্যা দান করছি। এই বলে ঋষি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে অক্ষ বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে প্রস্থান করলেন।

নল-দময়ন্তীর এই অপূর্ব উপাখ্যানের মধ্যে আমরা গোপন সংবাদ আদান প্রদানের বেশ কয়েকটি সফল প্রয়োগ দেখতে পাই। এই সাফল্যের পিছনে ব্রাহ্মণ দূতদের এক বড় ভূমিকা ছিল। সময় বিশেষে নারীরাও যে দূতের কাজে সাফল্য লাভ করতে পারে আমরা তারও প্রমাণ পাই। সর্বত্র সম্মানিত ব্রাহ্মণ দূতদের নিয়োগ করেই বিদর্ভরাজ কন্যা দময়ন্তীকে চেদিরাজ ভবন থেকে উদ্ধার করেন। উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে দময়ন্তী পিতার অনুকরণেই সুচতুর ব্রাহ্মণ দূতদের নানা রাজ্যে প্রেরণ করেন নলরাজের সন্ধানে। এ বিষয়ে তিনি একাই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংবাদ সংগ্রহের উপায়গুলি সম্বন্ধেও তিনি পিতা বা অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। এতই ছিল তাঁর আত্মপ্রত্যয়। দ্ব্যর্থবোধক সাংকেতিক ভাষায় যে বাক্যগুলি তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত ব্রাহ্মণদের মুখ দিয়ে কীর্তন করালেন সেগুলির উত্তর নলরাজ ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। বহুলোকের মধ্যে নলরাজকে চিহ্নিত করার এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় আর কি হতে পারে? তাই যখন রাজা ঋতুপর্ণের অশ্বাধ্যক্ষ বাহুকের কাছ থেকে উত্তর এল তখন তাঁর সন্দেহ হল নলরাজই হয়তো বাহুকের ছদ্মবেশে অযোধ্যানগরীতে বাস করছেন। দময়ন্তী জানতেন নলরাজ একজন অশ্ববিশেষজ্ঞ। নলরাজই কেবল বায়ুবেগে অশ্বচালনা করতে সক্ষম। একদিনের সময় দিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে তাঁর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল বাহুকের অশ্বজ্ঞানের পরীক্ষা করা ও তাঁকে বিদর্ভ নগরীতে নিয়ে আশা। এ পরীক্ষায় বাহুক উত্তীর্ণ হলেন যখন একদিনেই তাঁর সারথ্যে রাজা ঋতুপর্ণ বিদর্ভ নগরীতে এসে উপস্থিত হলেন। দময়ন্তীর উদ্দেশ্যও সফল হল। নাগরাজ কর্কোটকের বিষে নলরাজ ছিলেন বিরূপ দেহধারী। তাঁকে নলরাজ বলে চেনা সম্ভব ছিল না। এ জন্য তাঁর গুণাবলীর পরিচয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। প্রথমে দময়ন্তী দূতী কেশিনীকে পাঠালেন রথশালায় বাহুকের নিকট। এখানেও তাঁর শেখানো পূর্বের দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় নানা প্রশ্ন করে কেশিনী বাহুকের কাছ থেকে যে উত্তর আনল তা ব্রাহ্মণ দূত দ্বারা সংগৃহীত উত্তরের সহিত মিশে গেল। দময়ন্তী বুঝতে পারলেন বাহুকই নলরাজ। দময়ন্তী এতেও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি এবার বাহুকের অন্যান্য গুণাবলীর যাচাই আরম্ভ করলেন। নল ছিলেন নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কেশিনী সে শক্তিরও পরিচয় পেল যখন সে দেখল জল, অগ্নি প্রভৃতি অনেক পদার্থই নলের আজ্ঞাবহ। দময়ন্তী নলের রন্ধনপটুতার প্রমাণও সংগ্রহ করলেন কেশিনীর সাহায্যে। এই ভাবে বাহুকের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ

সন্তানদ্বয়কে বাহুকের নিকট প্রেরণ করলেন। তাদের দেখে বাহুক অশ্রুবি সর্জন করতে লাগলেন।

এইভাবে দময়ন্তী অতি নিপুণতার সঙ্গে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাহুকই যে ছদ্মবেশে নলরাজ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। নিজের নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে খুঁজে বার করতে গিয়ে দময়ন্তী যে মানসিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। তাঁর পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। প্রয়োগপদ্ধতির মধ্যেও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল না। সংবাদ সংগ্রহে ব্রাহ্মণ দূত ও নারী দূতীর নিয়োগ যথাযথ হয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় অনুসন্ধান কার্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি। সব কিছুই ঘড়ির কাটার মত চলছিল। তাঁর সাফল্য যেন দক্ষ গোয়েন্দাকেও হার মানায়। বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্না পতিপরায়ণা এই মহিয়সী নারীর প্রতি সহজেই আমাদের মস্তক সম্ভ্রমে নত হয়ে আসে।

।। ছয় ।।

অর্জুন বিরহে দ্রৌপদী ও পান্ডবগণ অতি ভারাক্রান্ত মনে দ্বৈতবনে বাস করছেন। একদিন দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে ধর্মরাজ! তোমার কোন বাসনা থাকলে বল, আমি তা পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। যুধিষ্ঠির বললেন, দেবর্ষি, আপনি আমার উপর প্রসন্ন আছেন এতেই আমি সন্তুষ্ট। তবে আমাদের কিছু দেবার থাকলে আপনি অনুগ্রহপূর্বক তীর্থভ্রমনের ফল ব্যাখ্যা করুন। নারদ তখন নানা উপাখ্যান বর্ণনা করে বললেন, যিনি শুদ্ধমনে তীর্থভ্রমন করেন তিনি পরলোকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিক ফল প্রাপ্ত হন। লোমশ মুনি শীঘ্রই এখানে আসছেন। তাঁর সঙ্গে তোমরা দেশের সকল তীর্থস্থান ভ্রমন কর।

দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করলে পুরোহিত ধৌম্যও বহু তীর্থের বর্ণনা দিলেন। পরে লোমশ মুনি আগমন করে বললেন, বৎস! তোমাদের জন্য আমি সুখবর নিয়ে এসেছি। অর্জুন এখন স্বর্গরাজ্যে আছেন। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব ও অন্যান্য দেবতার নিকট দিব্যাস্ত্র সমূহ লাভ করেছেন। নৃত্য গীতও শিখেছেন বিশ্ববহুর পুত্র চিত্রসেনের নিকট। স্বর্গরাজ্যে তাঁর অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে। একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করেই তিনি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপনাদের জন্য এই বার্তা প্রেরণ করেছেন—'মহাবীর কর্ণ এখন অর্জুনের ষোড়শাংসের এক অংশেরও যোগ্য নন। সময়মত আমি কর্ণের সহজাত রক্ষাকবচ হরণ করে তাঁর শক্তি খর্ব করব'।

অতঃপর পান্ডবগণ আনন্দিত মনে পুরোহিত ধৌম্য, লোমশমুনি ও অন্যান্যদের সঙ্গে বহু তীর্থস্থান দর্শন করলেন। লোমশমুনি তীর্থগুলির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিলেন।

বহু দুর্গমস্থান অতিক্রম করে পান্ডবগণ বদরিকাশ্রমে বাস করছেন। এখানে অবস্থান কালে ভীম একটি পদ্মের অন্বেষণে গভীর বনে প্রবেশ করে নিজ ভ্রাতা রামভক্ত হনুমানের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁর নিকট প্রাপ্ত হলেন বহু উপদেশ, রাজনীতি, সুরক্ষা, চরনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে। ভক্তাগ্রগণ্য মহাজ্ঞানী হনুমানের উপদেশগুলি আজকের দিনেও

প্রণিধানযোগ্য।

পাণ্ডবগণ অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষায় কৈলাশ পর্বতে বাস করছেন। জটাসুর নামে এক রাক্ষসও নিজেকে শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে পান্ডবদের আশ্রয়ে আছে। সকলেই তার ব্যবহার ও কথাবর্তায় সন্তুষ্ট। একদিন ভীম মৃগয়ার জন্য বনে গমন করেছেন। লোমশ মুনি ও অন্যান্য মহর্ষিগণও বিভিন্ন কাজে আশ্রমের বাইরে। এই সুযোগে জটাসুর মায়াবলে বিকট আকার প্রাপ্ত হয়ে পান্ডবদের সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে স্কন্ধে স্থাপন করে প্রস্থানোদ্যত হল। যুধিষ্ঠির জটাসুরকে তিরস্কার করে বললেন, হে মূর্খ, তুমি অতিদুরাচারী, তুমি আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আমাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করছ। তোমার মৃত্যু আসন্ন। তুমি দ্রৌপদীকে স্পর্শ করে বিষপান করেছ।

এই বলে যুধিষ্ঠির নিজ দেহের ভার বর্দ্ধিত করলে জটাসুরের গতি স্তিমিত হল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুল-সহদেবকে আশ্বস্ত করে বললেন, তোমরা শঙ্কিত হয়ো না, আমি জটাসুরের গতিশক্তি হরণ করেছি। ভীম এখনই উপস্থিত হয়ে জটাসুরের বধ করবেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবীর ভীম গদাহস্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে জটাসুর কর্তৃক বন্দীকৃত দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেবকে দেখতে পেলেন। ক্রোধাবিষ্ট হয়ে জটাসুরকে বললেন, পাপিষ্ঠ, এই পাপ কার্যের জন্য তোমার জীবন রক্ষার কোন উপায় নেই। তুই এখন বক-হিড়িম্বার পথে গমন করবি।

জটাসুর দ্রৌপদী ও অন্যান্যদের পরিত্যাগ করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে ভীমকে বলল, আমি কেবল তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তোমার রক্তে আমি অদ্য তোমা কর্তৃক নিহত রাক্ষসদের উদ্দেশে তর্পণ করব।

এরপর ভীষণ বাহুযুদ্ধে ভীমের হস্তে জটাসুর নিহত হল। পান্ডবগণ বিপন্মুক্ত হলেন।

জটাসুর কি কেবল বক-হিড়িম্বার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই দ্রৌপদী ও তিন পান্ডবপুত্রকে অপহরণের চেষ্টা করেছিল? এটা স্পষ্ট এ কাজ সফল হলে দুর্যোধনই উপকৃত হতেন। মনে হয় জটাসুরকে দুর্যোধনের চর হিসাবে পান্ডবদের দলে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছিল। তার মায়াবিদ্যা ভালভাবে জানা ছিল। সেজন্য তার পক্ষে ভেক ধরা বা কোন অলৌকিক কর্ম করা কঠিন ছিল না। এমন ব্যক্তিই সে হিসাবে উপযোগী। ভীমের হস্তে পূর্বে রাক্ষসদের মৃত্যুর পর জটাসুরের মন পান্ডবদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে ছিল। দুর্যোধন খুব সম্ভবত এই পান্ডব-বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে মায়া বিদ্যাধরী জটাসুরকে শত্রু পান্ডবদের অনিষ্ট সাধনে নিযুক্ত করেছিলেন। জটাসুর সকলের সম্মানীয় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পান্ডবদের নিকট আশ্রয় চেয়েছিল। এর ফলে কারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে নি। জটাসুর তার মধুর ব্যবহারে আশ্রমের সকলের মন জয় করেছিল। তার কাছ হতে যে কোন বিপদ আসতে পারে তা সকলেরই কল্পনার অতীত ছিল। আঘাত হানার পূর্বে জটাসুরের এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল। এ পর্যন্ত জটাসুরের সকল পদক্ষেপই সঠিক হয়েছিল। কিন্তু জটাসুর বা দুর্যোধন যে ভুল করলেন তা হল পান্ডবদের শক্তির মূল্যায়ণের

বিষয়ে। মনে হয় পান্ডবদের শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব সংবাদ সংগ্রহ না করেই এই দুঃসাধ্য অপহরণের কার্যে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উচ্চতর মায়া বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। এই বিদ্যাবলে তিনি অনায়াসে জটাসুরের গতি শ্লথ করে ভীমকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাকে বাধা দিতে ও বাহুযুদ্ধে নিহত করতে। আশ্চর্য লাগে ভীমের বাহুবলের বহু পরিচয় পেয়েও জটাসুর তাঁর সঙ্গেই আস্ফালন করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। সে যেন নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনল। এই ঘটনায় কৌরবপক্ষের হাত থাকলে (এবং থাকাই স্বাভাবিক) তাঁদের মন্ত্রণার দৈন্যতা আর একবার প্রকাশ পেল। পরিকল্পনাটি ভেস্তে তো গেলই, জটাসুর নিজের জীবন পর্যন্ত হারাল। অবশ্য পান্ডবদের বিচ্যুতিও যে ছিল না তা নয়। জটাসুরের ন্যায় একজন ভয়ঙ্কর শত্রুর তাঁদের আশ্রমে অনুপ্রবেশের সংবাদ পূর্বাহ্নে তাঁরা জানতে পারেন নি। আশ্রমে নূতন যোগদানকারী হিসাবে তার গতিবিধির উপর নজরদারির ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেরকম কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পান্ডব দের তাঁদের শত্রুদের সম্বন্ধে আরও সজাগ থাকা উচিত ছিল।

ইন্দ্রালয়ে পাঁচ বৎসর বাস করে অর্জুন বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করে গন্ধমাদন পর্বতে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হলেন। অর্জুন দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তি ও নিবাতকবচাদি অসুরদের বিনাশ সম্বন্ধীয় স্বর্গরাজ্যের নানা ঘটনাবলী বর্ণনা করে ভ্রাতাদের বললেন, দেবরাজ ইন্দ্র আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন, 'ধনঞ্জয়, সকল দিব্যাস্ত্র এখন তোমারই অধিকারে, কেউই তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য বীরগণ তোমার ষোড়াংসের এক অংশ শক্তিও প্রদর্শন করতে সমর্থ হবেন না'। এই বলে দেবরাজ আমায় এই অভেদ্য বর্ম, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্যবস্ত্র ও গাত্র আভরণ দান করলেন। নিজ হস্তে মস্তকে দিব্য কিরীটী পরিয়ে দিলেন। আমি ইন্দ্রালয়ে পরমসুখে বাস করছিলাম।

যুধিষ্ঠির বললেন, ধনঞ্জয়, তুমি ভাগ্যবলে ভগবান শঙ্কর ও দেবরাজকে সন্তুষ্ট করে এই দিব্যাস্ত্রসমূহ লাভ করেছ। মনে হচ্ছে কৌরবদের পরাজয় আসন্ন। আমি তোমার দিব্যাস্ত্র সমূহ দর্শন করতে অভিলাষী হয়েছি।

পরদিন অর্জুন দিব্য কবচে আবৃত হয়ে ভ্রাতাদের সম্মুখে অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করতে উদ্যত হলে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বারণ করলেন। বললেন, দিব্যাস্ত্রের অযথা প্রয়োগ নিদারুণ ক্ষতি সাধন করতে পারে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই সকল দিব্যাস্ত্রের কার্যকারিতা তোমরা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে। নারদের নিষেধাজ্ঞায় অর্জুন অস্ত্রসমূহ সম্বরণ করে নিলেন।

পান্ডবগণ কাম্যক বনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। একদিন কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হলে অর্জুন তাঁকে দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তির ঘটনাবলী বর্ণনা করলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের কৃতিত্বে মহা আনন্দিত। পরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রসংশা করে বললেন, রাজন, আপনি কোন অবস্থাতেই ধর্ম ভ্রষ্ট হন নি। ধর্মের জন্য আপনি রাজ্য অর্থ সবই বর্জন করেছেন। দ্যুত সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্য দেখে আপনি যে ধৈর্য অবলম্বন করে নীরব ছিলেন তা কেবল আপনার

পক্ষেই সম্ভব। যদি মনে করেন আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হয়েছে তা হলে আমরা এক্ষণেই কৌরবদের বিনষ্ট করে আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পারি।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কেশব, বিপদ আপদ সব সময়ে তুমিই আমাদের ভরসা। প্রতিজ্ঞামত আমরা প্রায় বার মাস বনবাসে কাটিয়েছি; পরে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস যাপন করে আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হব। আমরা যেন তোমারই শরণাগত হয়ে থাকি।

যুধিষ্ঠিরের কথায় বুঝা গেল কৌরবদের বিরুদ্ধে কখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কৃষ্ণের প্রস্তাব তাঁর মনঃপুত হয় নি। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চান না যদিও অর্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তিতে তাঁদের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। সেজন্য তিনি স্থির করলেন দ্যূত ক্রীড়ার শর্তানুযায়ী পান্ডবগণ বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের পরই আত্মপ্রকাশ করবেন। হয়তো ভীমের ন্যায় কৃষ্ণেরও আশঙ্কা ছিল পান্ডবদের পক্ষে কৌরবদের অজ্ঞাতে কোন স্থানেই এক বৎসরের ন্যায় এত দীর্ঘ সময় বাস করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই ঝুঁকি নিয়েও যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা রক্ষায় দৃঢ় সঙ্কল্প রইলেন কৃষ্ণের ন্যায় পরমহিতৈষীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেও। প্রতিজ্ঞা রক্ষায় এমন সিদ্ধান্ত কেবল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষেই সম্ভব। নৈতিকতার প্রশ্ন বাদেও মনে হয় যুধিষ্ঠিরের মনে আরও একটি বিষয় জাগরুক ছিল। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, পান্ডবদের আরও শক্তিশালী না হয়ে অমিতবিক্রমশালী পিতামহ ভীষ্ম-পরিচালিত বিশাল কৌরব সেনার বিরুদ্ধে এখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত হবে না। এই দিক থেকে বিচার করলে যুধিষ্ঠিরের মূল্যায়ণ ভ্রান্ত বলে মনে হয় না। ভীষ্মপ্রমুখ কৌরব পক্ষীয় প্রথমশ্রেণীর বীরগণ সকলেই দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত। তদুপরি পিতৃদত্ত ইচ্ছামৃত্যু বরে ভীষ্ম ছিলেন অবধ্য যতক্ষণ তিনি অস্ত্রধারণ করে থাকবেন। সহজাত অভেদ্য কবচকুন্ডলে আবৃত মহাবীর কর্ণকে বধ করাও অসম্ভব। রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারী দ্রোণাচার্যও অবধ্য বলে পরিগণিত। অজ্ঞাতবাস থেকে মুক্ত হয়ে সমগ্র পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করেই যুধিষ্ঠির পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি যুধিষ্ঠিরের পথেই পান্ডবগণ সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন।

মহর্ষি মার্কন্ডেয় একদিন পান্ডবদের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সকলের অনুরোধে তিনি রাজচরিত্র, ঋষি চরিত্র, কর্মফল, যুগধর্ম প্রভৃতি বহু বিষয় ব্যাখ্যা করে শুনালেন। যুধিষ্ঠিরের এক প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মার্কেন্ডেয় বললেন, রাজন, তুমি সর্বদা দয়াপরবশ হয়ে সততা, নিরপেক্ষতা ও মৃদুতার সঙ্গে প্রজাপালন করে ধর্মের অনুষ্ঠান কর। কখনই অধর্মের পথে যাবে না। ভুলবশত কোন অন্যায় করলে দানদ্বারা তার প্রতিবিধান করবে। আত্মশ্লাঘা করো না। নম্রতার সঙ্গে সকল কার্য সম্পাদন কর। বর্তমান ক্লেশে অভিভূত হয়ো না। আশীর্বাদ করি সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে সুখে কালাতিপাত কর।

যুধিষ্ঠির আশ্বাস দিয়ে বললেন, মহর্ষি! আপনার উপদেশ মত কাজ করতে সতত যত্নবান থাকব।

ইতিমধ্যে একদিন এক ব্রাহ্মণ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে পান্ডবদের বনবাস জনিত নানা দুঃখকষ্টের বর্ণনা দিলেন। সমস্ত বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র গভীর ক্ষেদ প্রকাশ করে বললেন, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে কেবল আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কপট দ্যূতক্রীড়ার আশ্রয় নিয়েছিল। অস্বীকার করে লাভ নেই নিজের কুপুত্রদের বশবর্তী হয়ে আমিও কম অন্যায় করি নি। স্পষ্ট দেখতে পারছি কুরুকুলের বিনাশ কাল উপস্থিত হয়েছে পাপকার্যের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। দিব্যাস্ত্রে বলীয়ান অর্জুনের তেজ কেহই সহ্য করতে পারবেন না।

শকুনি কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতামতের উপর কোনই গুরুত্ব দিলেন না। তিনি দুর্যোধনের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করে তাঁকে বললেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে পান্ডবদের রাজ্যসম্পদ অধিকার করেছ। অগণিত রাজন্যবর্গ তোমার আদেশ পালনে উন্মুখ হয়ে আছেন। শুনেছি পান্ডবগণ এখন শ্রীহীন অবস্থায় বনবাসী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দ্বৈতবনে এক সরোবরের তীরে বাস করছেন। তুমি সাড়ম্বরে সেখানে গমন করে তাঁদের দুঃখদুর্দ্দশা দেখে প্রীতিলাভ কর। তাঁরা তোমার ঐশ্বর্য সম্পদ দেখে গভীরতর শোক সাগরে নিমজ্জিত হবেন। দ্রৌপদী অপূর্ব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা তোমাদের ভার্য্যাদের দর্শন করে নিজের দৈন্যতার জন্য আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দেবেন। বৎস, মনে রেখো শত্রুর দুঃখ দর্শন পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ অপেক্ষাও বেশী প্রীতিকর।

কর্ণও শকুনির সঙ্গে একমত হয়ে দুর্যোধনকে দ্বৈতবনে গমন করতে উপদেশ দিলেন।

শকুনি ও কর্ণের প্রস্তাবে দুর্যোধন মহাসন্তুষ্ট। পরে চিন্তা করে কর্ণকে বললেন, হে অঙ্গরাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পান্ডবদের দুঃখে মর্মাহত। তপোবলে বলীয়ান পান্ডবদের হতে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় তিনি আমাদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন না, বিশেষ করে যদি তিনি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। যাতে মহারাজের অনুমতি পাওয়া যায় সকলে মন্ত্রণা করে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করুন।

তার পরদিন কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, আমরা মন্ত্রণা করে একটি উপায় বের করেছি। আপনি মহারাজের নিকট দ্বৈতবনের সন্নিকটে ঘোষপল্লী পরিদর্শনে যাবার অনুমতি প্রার্থণা করুন। আমাদের বিশ্বাস এতে মহারাজ অমত হবেন না।

ঘোষপল্লী পরিদর্শনের প্রস্তাব দুর্যোদনের মনঃপুত হল। শকুনি ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, ঘোষপল্লীর গোবৎসদিগের বয়স, সংখ্যা ইত্যাদি নিরুপণের সময় উপস্থিত হয়েছে। স্থানটিও মনোরম। দুর্যোধন গোবৎসদিগের তত্ত্বাবধান ও মৃগয়া করতে সেখানে যেতে বাসনা করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন।

এর পূর্বে একজন গোপও শকুনি ও কর্ণের নির্দেশে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে ঘোষপল্লী পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বুঝিয়ে বলল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র উত্তরে বললেন, মৃগয়া উত্তম সন্দেহ নেই। ধেনুদিগের পর্যবেক্ষণও প্রয়োজন। শুনেছি সেখানে পান্ডবগণ বাস করছেন। তাঁরা সকলেই তপোবল সম্পন্ন ও মহাবীর। তদুপরি অর্জুন সম্প্রতি দিব্যাস্ত্রসকল লাভ করে ইন্দ্রালয় থেকে প্রত্যাবর্তন

করেছেন। পান্ডবগণ এখন অজেয়। মৃগয়াকালে তাঁদের কোন অনিষ্ট হলে তোমাদের মহাবিপদ উপস্থিত হবে। আমি এমতাবস্থায় দুর্যোধনকে ঘোষপল্লীতে গমনের অনুমতি দিতে পারি না। ধেনুদিগের পরিদর্শনের জন্য বিশ্বস্ত অন্য লোকদের প্রেরণ করা যেতে পারে।

শকুনি বললেন, আমাদের পান্ডবদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই। আমরা তাঁদের আশ্রমেও যাব না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে অনুমতি দান করুন।

শকুনির বার বার অনুরোধে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্যোধনকে ঘোষপল্লীতে গমনের অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে শকুনি, কর্ণ, ভ্রাতা ও ভার্যাদের সঙ্গে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে দুর্যোধন দ্বৈতবনে উপস্থিত হলেন। এর পরের ঘটনা আমরা অবগত আছি। দ্বৈতবনে গন্ধর্বদের অধিকারস্থ উদ্যান ও সরোবরে গমন করলে কৌরবদের সঙ্গে গন্ধর্বসেনার ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। দুর্যোধন ভ্রাতা ও ভার্য্যাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হস্তে বন্দী হন। এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন গন্ধর্বদের যুদ্ধে পরাস্ত করে দুর্যোধন ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় বন্দীদের মুক্ত করে আনেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যাঁদের দুঃখদুর্দশাকে ব্যঙ্গ করে আনন্দ পেতে এসেছিলেন সেই পান্ডবদের দ্বারাই ধৃতরাষ্ট্রগণের জীবন রক্ষা পেল। এই ঘটনায় জীবনের চরমতম লাঞ্ছণা ও অবমাননা ভোগ করলেন দুর্যোধন। যাহোক তিনি তাঁর উপকারের প্রতিদান স্বরূপ অর্জুনকে কিছু চাইতে করতে অনুরোধ করলেন। অর্জুন পরে তাঁর কাছ থেকে কোন কিছু চেয়ে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দ্বৈতবনের ঘটনার মধ্যে আমরা কৌরবদের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার এক চরম নিদর্শন দেখতে পাই। পরিস্থিতি অনুধাবনের সমস্ত ক্ষমতাই যেন তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। যেখানে সুস্থ বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন সেখানে তাঁরা চপলমতি বালকের ন্যায় কান্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন। মহাবীর কর্ণ যিনি সর্বদা সম্মুখ সমরে শত্রুর মুখোমুখি হতে আগ্রহী, কেমনে এমন একটি জঘন্য প্রস্তাবে রাজি হলেন? বনবাসে পান্ডবদের হীনভাব দেখে বা তাঁদের আপন ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার মধ্যে কী পৌরুষ থাকতে পারে? পান্ডবগণ বনপথে থেকেও কৌরবদের সঙ্গে আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মহাজ্ঞানী কৃষ্ণ বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে তাঁদের সাহায্য করছিলেন। অর্জুন এর মধ্যেই দেবতাদের সন্তুষ্ট করে বহু অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মতে অর্জুনকে পরাভূত করা মর্ত্যের কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এইসব সংবাদ কৌরবপক্ষ অবগত আছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সবকিছু জেনেই দুর্যোধনাদি সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন পান্ডবদের থেকে দূরে থাকতে। কৌরবগণ এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করে বনবাসে পান্ডবদের দীনভাব দেখে এক পৈচাশিক আনন্দ ভোগ করতে সসৈন্যে দ্বৈতবনে উপস্থিত হলেন। অর্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তির বিষয়টিকে কোনরূপ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। দ্বৈতবনের উদ্যান ও সরোবর যে গন্ধর্বদের অধিকারে এবং তাঁদের অনুমতি বিনা সেখানে যে প্রবেশের

নিষেধ আছে — সে বিষয়েও কৌরবদের কোন পূর্ব সংবাদ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলেও উপেক্ষা করেছেন এই ভেবে যে তাঁদের বলবীর্যের সম্মুখ কেহই দাঁড়াতে পারবে না। অথচ গুপ্তচর পাঠিয়ে দ্বৈতবনের সকল সংবাদই তাঁরা সংগ্রহ করতে পারতেন। এ সবই যুদ্ধ ও চরণীতির বিরোধী। সুস্থ মস্তিষ্কে মন্ত্রণা করলে কৌরবগণ প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পারতেন। পাণ্ডবদের রাজ্য অধিকার করে তারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। গন্ধর্বদের হাতে বন্দী ও পরে পাণ্ডবদের দ্বারা উদ্ধার যেন কৌরবদের নির্বুদ্ধিতা ও দম্ভের উপযুক্ত জবাব।

দুর্যোধন নিজের অবমাননায় অধীর হয়ে অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হলেন। শকুনি, কর্ণ ও ভ্রাতাদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আপন সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুত হলেন না। দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে পাতালবাশী দানবগণ দুর্যোধনের আত্মহননের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে মহা বিচলিত হয়ে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করল। যজ্ঞাগ্নি হতে উদ্ভূত এক দেবতা দানবদের আদেশে দুর্যোধনকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করলে তারা বলল, মহারাজ, আপনি পূর্বে বহু অলৌকিক বলবিক্রম প্রকাশ করে আপনার শত্রুদের পরাজিত করেছেন। দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রসাদে আপনার জন্ম। আপনার শরীর সাধারণ মানব শরীর নয়। আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন। দিব্যাস্ত্র বিশারদ ক্ষত্রিয়গণ আপনার শত্রুদের বিনষ্ট করতে এগিয়ে আসবেন। আমরা পান্ডব হিতৈষী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতি গুরুজনদের মনের পরিবর্তন সাধন করে তাঁদের আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রভাবিত করব। আমরা সকল দৈত্য দানবগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব। দেবতারা যেমন পান্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন, সেইরূপ আমরাও আপনার পক্ষে আছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিজগৃহে গমন করুন। আপনি পান্ডবদের বিনষ্ট করে অখন্ড ভূমন্ডলের অধীশ্বর হবেন।

দানবদের বাক্যে দুর্যোধন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এক বৎসর অতিক্রান্ত হলে তিনি রণক্ষেত্রে অর্জুনকে বধ করবেন। এইভাবে হিতৈষীদের অনুরোধে দুর্যোধন অনাহারে আত্মহননের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করলেন। এরপর সকলে হস্তিনাপুর ফিরে এলেন ঘোষপল্লী থেকে।

দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করতে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে বহু নৃপতিদের বশীভূত করে অজস্র ধনদৌলত সংগ্রহ করলেন। দুর্যোধন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, হে কর্ণ! দিগ্বিজয়ে তুমি যে অসামান্য শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছ তা ভীষ্ম, দ্রোণাদির পক্ষেও সম্ভব হয়নি। মনে হচ্ছে আমি আজ পূর্ণ হলাম।

কর্ণের সাফল্যে হস্তিনাপুর নগরবাসীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। পান্ডব হিতৈষীগণ নিরব রইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিমনে কর্ণকে আলিঙ্গন করলেন। শকুনি নিশ্চিন্ত হলেন কর্ণের হস্তেই পান্ডবগণ পরাজিত হবেন।

কৌরবপক্ষের মনোবল এখন যথেষ্ট উন্নত। দুর্যোধন স্থির করলেন যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনিও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। কিন্তু রাজপুরোহিতগণ জানালেন যুধিষ্ঠির

জীবিত থাকতে দুর্যোধনের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান নিয়মবিরুদ্ধ। তদুপরি পিতা ধৃতরাষ্ট্র এখনও বর্তমান। পুরোহিতদের প্রস্তাবমত দুর্যোধন মহাধুমধামের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের সমকক্ষ বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। পান্ডবগণ যজ্ঞদর্শনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের দূতকে জানালেন, আমাদের তের বৎসর নিয়ম অনুসারে বনবাসে থেকে প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হলে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, আমি আপনাকে সত্যিকারের অভিনন্দন জানাব তখনই যখন পান্ডবদের নিধনের পর আপনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। কর্ণের বাক্যে দুর্যোধন মহানন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। কর্ণ দুর্যোধনকে পুণরায় বললেন, মহারাজ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি অর্জুনকে বিনাশ না করে আমি জলগ্রহণ করব না।

যথাসময়ে দূত মারফত পান্ডবগণ কর্ণের অর্জুন বধ প্রতিজ্ঞা জ্ঞাত হলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের দুর্ভেদ্য কবচের কথা চিন্তা করে মহা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি দ্বৈতবন ত্যাগ করে অন্যত্র গমনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ধার্তরাষ্ট্রদিগের মনে পান্ডবদের অনিষ্ট চিন্তার বিরাম নেই। এবার তাঁরা এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। একদিন দুর্বাশা মুনি দশ সহস্র শিষ্য নিয়ে হস্তিনাপুর উপস্থিত হলে দুর্যোধন শাপ ভয়ে শঙ্কিত হয়ে নিজেই তাঁর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হলেন। পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা মুনি দুর্যোধনকে বর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি কর্ণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে বললেন, মুনিবর, কুলশীল সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির এক্ষণে বনে বাস করছেন। আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করুন। ধার্তরাষ্ট্রগণ পরিকল্পনা করেছিলেন বনবাসে বর্তমান অবস্থায় পান্ডবদের শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনির যথোচিত সৎকার করা সম্ভব হবে না এবং তাঁরা দুর্বাশা মুনির শাপে সন্তপ্ত হয়ে গভীরতর দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হবেন।

এর পরের ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা। দুর্বাশা মুনি সশিষ্য কাম্যক বনে পান্ডবদের নূতন বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দ্রৌপদীর পাকশালায় খাদ্যবস্তু কিছুই নেই যা দ্বারা তিনি বিপুল সংখ্যক অতিথিবর্গের ভোজনের ব্যবস্থা করতে পারেন। দুর্বাশা মুনির শাপভয়ে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। অন্য কোন উপায় না দেখে তিনি কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। অচিরাৎ ঈশ্বরাবতার কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে বললেন কৃষ্ণা, আমি ক্ষুধার্থ, আমাকে এখনই কিছু খেতে দাও। দ্রৌপদী কী করবেন ভেবে পেলেন না। কৃষ্ণের আদেশে দ্রৌপদী শূন্য রান্নার পাত্রটি এনে দেখালেন। কৃষ্ণ পাত্রের মধ্যে লেগে থাকা একদানা শাকান্ন উঠিয়ে নিজের মুখে দিয়ে বললেন, বিশ্বাত্মা প্রীত ও তুষ্ট হোন। এই বলে তিনি ভীমকে পাঠালেন অতিথিদের ভোজনের জন্য আহ্বান করতে। দুর্বাশা মুনি শিষ্যগণের সহিত তখন নিকটবর্তী নদীতে স্নান করছিলেন। স্নান থেকে উঠে সকলেই ভুরি ভোজন জনিত উদ্গারে পরম পরিতৃপ্ত বোধ করলেন। আহারের জন্য পান্ডবদের তপোবনে আর প্রত্যাবর্তন করলেন না। কৃষ্ণের দৈববলে পান্ডবগণ দুর্বাশার কোপানল থেকে উদ্ধার পেলেন।

দুর্বাশা মুনিকে সশিষ্য পান্ডবদের আতিথ্য গ্রহণে পাঠিয়ে দুর্যোধন বস্তুতঃ এক মরিয়া

ভাবেরই পরিচয় দিলেন। বারবার পাণ্ডবদের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাণ্ডবদের অনিষ্ট সাধনে তাই তিনি কোন সুযোগই হাতছাড়া করতে চাননি। দুর্বাশা মুনির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সর্বজন বিদিত। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এই মহাযোগীকে সন্তুষ্ট করা সহজ ছিল না। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলেই আশ্রয়দাতাকেও তিনি শাপ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। সে জন্য সকলেই তাঁর সম্বন্ধে ভীষণ ভীত ছিল। বনবাসী পাণ্ডবদের দুর্বাশা মুনির শাপের কোপে ফেলতেই তাঁকে তাঁদের তপোবনে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই কাজটির মধ্যে দুর্যোধনের অপরিণত বালকসুলভ বুদ্ধিরই পরিচয় মেলে। কৌরবগণ যেন পূর্বের অসাফল্য থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে রাজি নন। তাঁদের বোঝা উচিত ছিল এরূপ ছেলেমানুষী উপায়ে দিব্যাস্ত্রে বলিয়ান পাণ্ডবদের কোন ক্ষতি করা যাবে না। বনবাসে থেকেও পাণ্ডবগণ এখন মহাশক্তিশালী। সহজেই অনুমেয় তাঁরা কৌরবদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হচ্ছেন। কৌরবদের উচিত ছিল পাণ্ডবদের কার্যকলাপের উপর বিশেষ নজর রাখা এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিজেদের সমরশক্তি বৃদ্ধি করা। এর জন্য যে সংকল্পের দৃঢ়তা, স্থৈর্য ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন তা যেন তাঁদের ছিল না। অথচ তাঁদের অর্থ সম্পদ লোকবল সবই ছিল। তারা অতি সহজ উপায়ে পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। পরিণাম যা হবার তাই হল। কৌরবদের আবার এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হল। কৃষ্ণের দৈবিক হস্তক্ষেপ না হলেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তপোবনে যে পাণ্ডবগণ দুর্বাশা মুনির কোপ থেকে রক্ষা পেতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের শক্তি সম্বন্ধে কৌরবদের মূল্যায়নের অভাব আবার দৃষ্টিগোচর হল।

।। সাত ।।

এরপর পাণ্ডবগণ আর এক বিপদে পতিত হলেন। পুরোহিত ধৌম্যের তত্ত্বাবধানে দ্রৌপদীকে রেখে পাণ্ডবগণ মৃগয়ার জন্য বনে গমন করেছেন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র কন্যা দুঃশলার পতি সৌবীররাজ জয়দ্রথ কয়েকজন মিত্ররাজার সহিত এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে কাম্যক বনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি পাণ্ডবদের আশ্রমে প্রবেশ করলে দ্রৌপদী তাঁকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করে বসালেন। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর জয়দ্রথ দ্রৌপদীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বললেন, হে বরাণনে, রাজ্যভ্রষ্ট বনচারী পাণ্ডবদের পরিত্যাগ করে আমায় তোমার স্বামীত্বে বরণ কর। কোন বুদ্ধিমতী নারীই সম্পদহীন স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করেন না। আমার রাজ্যে তুমি পরম সুখে বাস করবে।

প্রথমে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে তিরস্কার করলেন তাঁর কুপ্রস্তাবের জন্য। যখন জয়দ্রথ তাতেও নিবৃত্ত হলেন না তখন দ্রৌপদী পাণ্ডবদের আগমন অপেক্ষায় জয়দ্রথকে মিষ্টবাক্যে প্রলোভিত করতে চেষ্টা করলেন। পরে ক্রোধে কম্পিত হয়ে পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্য ও অন্যান্য গুণাবলীর উল্লেখ করে বললেন, হে দুরাত্মন! যেমন নল ও কদলী আপন নাশের জন্য ফলিত হয়, তেমন কর্কটী আত্মবিনাশের জন্য গর্ভধারন করে, সেইরূপ আপনি আত্মহননের জন্যই আমাকে গ্রহণ করতে চাইছেন।

উত্তরে জয়দ্রথ বললেন, হে কৃষ্ণে, পান্ডুপুত্রদের বলবিক্রমের কথা বলে আমাকে দমিত করতে পারবে না। শ্রেষ্ঠকুলে আমার জন্ম; শৌর্য, তেজ, দক্ষতা প্রভৃতি ছয়গুণ আমাতে বিদ্যমান, পান্ডবগণ আমার তুলনায় অতি হীন।

দ্রৌপদী বললেন, কৃষ্ণ ও অর্জুন যার সহায়, আপনার ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষের কথা দূরে থাক, দেবরাজ ইন্দ্রও আমায় হরণ করতে পারবেন না। আপনার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না যখন গান্ডীবধারী অর্জুন, গদাধারী ভীম ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত নকুল ও সহদেব আপনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবেন। আমি পান্ডবগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে মনে স্থান দেইনি।

অতঃপর জয়দ্রথ বলপূর্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করলে তিনি নিতান্ত পীড়িত হয়ে জয়দ্রথের রথে আরোহন করলেন। পুরোহিত ধৌম্য জয়দ্রথকে তিরস্কার করে তাঁর সৈন্যদলের সহিত দ্রৌপদীর অনুগামী হলেন।

এদিকে পান্ডবগণ চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখে বিপদের আশঙ্কা করে শীঘ্র তাঁদের তপোবনে ফিরে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হলেন। দ্রুতগামী রথে পশ্চাদধাবন করে পান্ডবগণ অচিরেই সসৈন্য রথোপরি দ্রৌপদীর সঙ্গে জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। পান্ডবদের আক্রমণের মুখে দাঁড়াতে না পেরে জয়দ্রথ নিজ রথ থেকে নেমে পলায়নপর হলেন। ভীম দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে জয়দ্রথকে বন্দী করে পদ ও মুষ্ঠাঘাতে তাঁকে মূর্চ্ছিত করে ফেললেন। পরে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছায় ভগিনী দুঃশলার বৈধব্যর কথা চিন্তা করে ও দ্রৌপদীর সম্মতি নিয়ে জয়দ্রথের মস্তক মুন্ডন করে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হল।

নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জয়দ্রথ আপন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন না করে গঙ্গাতীরে ভগবান শঙ্করের আরাধনায় নিযুক্ত হলেন। আরাধনায় সন্তুষ্ট শঙ্কর তাঁকে বরদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে জয়দ্রথ পঞ্চপান্ডবদের যুদ্ধে পরাস্ত করার শক্তি প্রার্থনা করলেন। ভগবান শঙ্কর বললেন, তুমি অর্জুন ব্যতীত অন্য পান্ডবদের যুদ্ধে পরাজিত করতে সমর্থ হবে। তুমি হয়তো অবগত নহ পূর্বে নররূপী অর্জুন ভগবান নারায়নের সঙ্গে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলেন। সম্প্রতি আমি তাঁকে আমার পাশুপাত অস্ত্র প্রদান করেছি। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের নিকটও তিনি বজ্র প্রভৃতি বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করেছেন। এক্ষণে ভগবান বিষ্ণু সনাতন ধর্মস্থাপন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ও যদুবংশ ধ্বংসের নিমিত্ত কৃষ্ণরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণ সতত অর্জুনকে রক্ষা করে চলেছেন। মনুষ্য তো দূরের কথা অর্জুন দেবতাদেরও অজেয়।

এই বলে ভগবান অন্তর্হিত হলেন।

দ্রৌপদী হরণের ঘটনায় আমরা জয়দ্রথের নৈতিক অধঃপতন ও অপরিনামদর্শিতার এক চরম নিদর্শন দেখতে পাই। বিবাহের উদ্দেশ্যে বলপূর্বক কুমারীকন্যা হরণ সে যুগের একটি স্বীকৃত প্রথা। কিন্তু বলপূর্বক বিবাহিতা রমণীকে হরণের ঘটনা খুবই বিরল। পান্ডবদের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে জয়দ্রথের পক্ষে দ্রৌপদী হরণের এই অতি

গর্হিত কাজের নিন্দার কোন ভাষা নেই। জয়দ্রথের ন্যায় একজন শৌর্যশালী, বহুগুণান্বিত রাজার পক্ষে এরূপ মতিভ্রম অচিন্ত্যনীয়। মনে হয় দ্রৌপদীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি সকল বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। দ্রৌপদীর সতর্কবাণী তিনি ঔদ্বত্যের সঙ্গে উপেক্ষা করেছেন। পান্ডবদের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে সবকিছু জেনেও তিনি তার উপর কোন গুরুত্ব দেননি। বরং তিনি পাণ্ডবদের শক্তিকে তাচ্ছিল্য করে নিজেকেই অধিক শক্তিমান মনে করেছেন। বিপক্ষের শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া রাজনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভৃতি সকল নীতিরই বিরোধী। সমস্ত বাস্তববুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে কেবল ভাবাবেগে চালিত হয়ে জয়দ্রথ পাণ্ডবদের হাতে নিজের পরাজয় ও অপমান নিজেই ডেকে এনেছেন। পাণ্ডব ভগিনী দুঃশলার স্বামী বলে জয়দ্রত জীবনে রক্ষা পেলেন।

॥ আট ॥

এদিকে পাণ্ডবদের বনবাসের দীর্ঘ বার বৎসর প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। দেবরাজ ইন্দ্র স্থির করলেন তিনি কর্ণের অভেদ্য কবচকুণ্ডল হরণ করবেন ভবিষ্যৎ যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিজয় সুনিশ্চিত করতে। সূর্য এই সংবাদ জেনে স্বপ্ন যোগে কর্ণকে সতর্ক করে বললেন, বৎস কর্ণ, দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে পাণ্ডবদের হিতার্থে তোমার কবচকুণ্ডল হরণ করতে তোমার সমীপে উপস্থিত হবেন। এই কবচ কুণ্ডলের জন্যই তুমি সকলের অবধ্য। সেজন্য কোন অবস্থাতেই তুমি তোমার স্বর্ণময় কবচকুণ্ডল দেবরাজকে দান করবে না।

কর্ণ সব শুনে সূর্যকে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোন ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করলে আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দান করতে পারি। দেবরাজ ব্রাহ্মণ বেশে কবচকুণ্ডল প্রার্থণা করলে আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করব। অন্যথায় আমার অকীর্তি সমস্ত জগতে প্রচারিত হবে। আমি অকীর্তিমান হয়ে জীবন ধারণ করতে চাই না।

সূর্য বললেন, মহাবীর অর্জুন তোমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু কবচকুণ্ডলদ্বারা তোমার দেহ আবৃত থাকায় দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যেও অর্জুনের পক্ষে তোমায় পরাজিত করা সম্ভব হবে না। কবচকুণ্ডল হাতছাড়া করলে তুমি তোমার মৃত্যুকেই ঠেকে আনবে। আর যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তোমায় কবচকুণ্ডল দান করতেই হয় তবে তুমি অগ্রে দেবরাজের নিকট একশত্রুঘাতিনী অমোঘ শক্তিঅস্ত্র প্রার্থনা করবে।

যথা সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে কর্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করলে সূর্যের উপদেশমত তিনি একশত্রুঘাতিনী শক্তিঅস্ত্র প্রার্থনা করলেন। দেবরাজ প্রার্থনামত কর্ণকে একশত্রুঘাতিনী শক্তি অস্ত্রদান করে বললেন, হে কর্ণ! অন্য অস্ত্রদ্বারা কার্যসিদ্ধি হলে আমার প্রদত্ত এই শক্তিঅস্ত্র প্রয়োগ করবে না, অন্যথায় ঐ অস্ত্র তোমার শরীরে নিপতিত হয়ে তোমায় ধ্বংস করবে।

এরপর কর্ণ অস্ত্রদ্বারা নিজ দেহ থেকে কবচকুণ্ডল কেটে বার করে দেবরাজকে

অর্পণ করলেন। কর্ণের মুখমণ্ডল এতটুকু বিবর্ণ হল না।

কর্ণ ও পাণ্ডবদের জন্মরহস্যের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্যদেবের অর্জুন ও কর্ণের হিতকামনায় উদ্যোগী হওয়ার কারণ নিহিত আছে। কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন ছিলেন যথাক্রমে সূর্য, ধর্ম, পবন ও দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। আর যমজ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব ছিলেন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী নিম্নরূপ।

কৃষ্ণের পিতামহ শূরের পিতৃশ্বসা রাজা কুন্তীভোজ অপুত্রক ছিলেন। সেজন্য শূর নিজকন্যা পৃথাকে পালনের জন্য কুন্তীভোজের নিকট প্রেরণ করেন। কুন্তীভোজের গৃহে সর্বগুণান্বিতা পৃথা সকলের প্রশংসাভাজন হয়ে উঠেন। দুর্বাসামুনি কুন্তীভোজের আতিথ্য গ্রহণ করলে পৃথাকে তাঁর পরিচর্য্যায় নিয়োগ করা হয়। পৃথার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁকে আকর্ষণ মন্ত্র দান করেন। তিনি পৃথাকে বললেন, হে কল্যাণী! এই মন্ত্র প্রভাবে যে কোন দেবতা ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্তী হবেন। পরে একদিন পৃথা কৌতূহল বসে মন্ত্র উচ্চারণ করে সূর্যদেবকে আহ্বান করলে সূর্যদেব তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। সূর্যদেবের সঙ্গে মিলনের ফলে পৃথার গর্ভসঞ্চার হল এবং যথা সময়ে তিনি কুণ্ডল ও অভেদ্য সহজাত বর্মদ্বারা আবৃত এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। এই সন্তান প্রসবের সংবাদ নিজ ধাত্রী ব্যতিরেকে অন্য সকলের কাছেই অজ্ঞাত রইল। কন্যা অবস্থায় গর্ভধারণ গর্হিত মনে করে পৃথা ধাত্রীর সহায়তায় একটি পেটিকায় সদ্যজাত পুত্রকে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সারথী অধিরথ এই শিশুসন্তানকে উদ্ধার করেন। পৃথার এই পুত্রই কর্ণনামে পরিচয় লাভ করেন। কুন্তীভোজের নাম অনুসারে পৃথার আর এক নাম কুন্তী। হস্তিনাপুর রাজ বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র (ঋষি দ্বৈপায়ণের ঔরসে) পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ হয়। মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রী ছিলেন পাণ্ডুর দ্বিতীয় মহিষী।

পাণ্ডুর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরও ছিলেন বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র (ঋষি দ্বৈপায়ণের ঔরসে)। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। সে জন্য দ্বিতীয় পুত্র-পাণ্ডুকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পাণ্ডু ভার্য্যাদের সঙ্গে হিমালয়ের বনে মৃগয়ার জন্য গমন করেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি এক মুনির শাপগ্রস্থ হয়ে ভার্য্যাদের সঙ্গে সহবাসে বঞ্চিত হন। নিঃসন্তান পাণ্ডু অতি দুঃখিত মনে দিন যাপন করতে লাগলেন। পরে একদিন কুন্তী তাঁর আকর্ষণ মন্ত্র প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করেন এবং পাণ্ডুর সম্মতিক্রমে ধর্ম, পবন ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে পর পর তিন পুত্র লাভ করেন। মাদ্রীকে আকর্ষণ মন্ত্র শিখিয়ে দিলে তিনিও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে যথাসময়ে নকুল সহদেব নামে দুই যমজ পুত্র লাভ করেন। হিমালয়ে মুনির অভিশাপ অগ্রাহ্য করে মাদ্রীর সঙ্গে মিলিত হলে পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। মাদ্রী সহমরণে জীবন পরিত্যাগ করেন। পঞ্চপাণ্ডবদের নিয়ে কুন্তী চলে আসেন হস্তিনাপুরে। এর পরই আরম্ভ হয় দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রদের রেষারেষী ও পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ।

কর্ণ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের নিকট অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে অস্ত্র শিক্ষা করে অর্জুনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন। তাঁর ধার্তরাষ্ট্রগণের পক্ষে যোগ দেওয়ার ফলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হয়ে উঠে। কর্ণও পঞ্চপাণ্ডব সকলেই কুন্তীর পুত্র তা তাঁদের নিকট অজ্ঞাত রয়ে গেল।

কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হলে দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্যদেব নিজেদের পুত্র অর্জুন ও কর্ণের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। গোয়েন্দাগিরিতে দেবতারাও কম যান না। তাঁদের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণ পদ্ধতি অবশ্য মর্ত্যের মানুষের চেয়ে ভিন্নতর। স্বপ্নে সাক্ষাৎকার, ছদ্মবেশ ধারণ, মনোবেগে স্থান পরিবর্তন, সূক্ষ্ম দেহে গমন, অন্য দেহে প্রবেশ প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গকারী ইন্দ্রিয়াতীত কার্য্যাবলীতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত। তখনকার দিনে যোগবলেও মানুষ দেবতাদের করায়ত্ব অনেক গুণ অর্জনে সমর্থ হতেন। ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল হরণের পরিকল্পনা সূর্যদেব নিজ শক্তিবলে পূর্বেই জানতে পারেন এবং সেইমত কর্ণকে সতর্ক করে দেন। পিতা হিসাবে সূর্যদেবের পক্ষে পুত্র কর্ণের বিপদে আশঙ্কিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কর্ণের প্রতি তাঁর কবচকুণ্ডলের বিনিময়ে ইন্দ্রের নিকট একশত্রুঘাতিনী শক্তিঅস্ত্র প্রর্থনার উপদেশ যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত ছিল। এই উপদেশের মধ্যে সূর্যদেবের সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিরও পরিচয় মেলে। কর্ণ পিতা সূর্যদেবের এই উপদেশের সারবত্তা বুঝে ইন্দ্রের নিকট একশত্রুঘাতিনী শক্তিঅস্ত্র চেয়ে নিলে সূর্যদেব নিশ্চিন্ত হলেন কবচকুণ্ডল হারিয়েও কর্ণ অর্জুনকে এই অস্ত্রের সাহায্যে বধ করতে পারবেন। কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তিঅস্ত্র কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে বধ করে। অর্জুনের জীবন রক্ষা পায়। পরে অন্যথায় যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে বধ করেন। এই ভাবে সূর্যদেবের পুত্র কর্ণের জীবন রক্ষা ও অর্জুন বধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশ্য প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহজাত অভেদ্য কবচকুণ্ডল দান করে কর্ণের এই মৃত্যু—তাও আবার অন্যায় যুদ্ধে—জগতে তাঁকে মহত্বের শীর্ষে স্থাপন করেছে। আর অর্জুন ? কৃষ্ণ যাঁর নির্দেশে নিরস্ত্র কর্ণকে কাপুরুষের ন্যায় হত্যা করা হল, ইতিহাসে চিরদিন কলঙ্কিত হয়ে রইলেন।

পাণ্ডবগণ আবার দ্বৈতবনে ফিরে এসেছেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমার অরণি ও মন্থ (দুইখণ্ড কাষ্ঠ যাহা ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালা হয়—নিচের কাঠ অরণি, উপরের কাঠ মন্থ) এক বন্য হরিণ শিঙে করে পালিয়ে গেছে। আপনারা তা উদ্ধার করে দিন; অন্যথায় আমার অগ্নিহোত্রের হানি হবে। পাণ্ডবগণ সঙ্গে সঙ্গে হরিণের পশ্চাদধাবণ করলেন; কিন্তু তাঁরা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও হরিণকে বাণবিদ্ধ করতে অসমর্থ হলেন।

এই ব্যর্থতার জন্য পাণ্ডবদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উদিত হল। নকুল যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাজন, সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েও আমাদের কী কারণে এত দুঃখকষ্ট ও ব্যর্থতা সহ্য করতে হচ্ছে? যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, বিপদ নানারূপ ধরে আসে এবং এর কোন সীমা নেই, কারণও অজ্ঞাত। কেবল ধর্মই পাপ ও পূণ্যের ফল ভাগ করে

দেন। তখন ভীম বললেন, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকারী দুঃশাসনকে বধ করিনি; সেজন্যই আমাদের এই দুর্ভোগ। অর্জুন বললেন, সূতপুত্র কর্ণের তীক্ষ্ণ কটুবাক্য সহ্য করেছিলাম বলেই আমাদের এই অবস্থা। সহদেব বললেন, কপট দ্যূতে বিজয়ী শকুনিকে বধ করিনি; আমাদের তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে।

পাণ্ডবগণ তখন ভীষণ পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত। অদূরে একটি সরোবর দৃষ্ট হলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল, সহদেব, ভীম ও অর্জুন পরপর জল আনতে গেলেন; কিন্তু কেউই ফিরে এলেন না। উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের খোঁজে সরোবরে যেয়ে দেখলেন তাঁরা সকলে সেখানে মৃতাবস্থায় পড়ে আছেন। ভ্রাতাদের এই অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ হল দুষ্টমতি দুর্যোধনের আদেশে গান্ধার রাজা শকুনি হয়তো পাণ্ডবদের অনিষ্ট সাধনে নির্জনে এই সরোবর নির্মাণ করে জলে কোন দূষিত দ্রব্য মিশিয়ে রেখেছেন; অথবা দুর্যোধনের গুপ্তচরদের দ্বারাই এই অপকর্ম সাধিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করলেন ভ্রাতাদের শরীর কোনরূপ বিকৃত হয় নি, মুখবর্ণ আগের মতই প্রসন্ন আছে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কালান্তক শম ব্যতিরেকে কে তাঁর এই বীর ভ্রাতাদের সংহার করতে পারে? এইরূপ চিন্তা করে যেই তিনি জলে অবতরণ করতে উদ্যত হলেন তখনই অন্তঃরীক্ষ থেকে এই বাণী শুনতে পেলেন, আমি শৈবাল ও মাংসভোজী বক। এই সরোবর আমার অধিকারে। আমিই তোমার ভ্রাতাদের জীবন হরণ করেছি। জলস্পর্শ করার পূর্বে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে তোমাকেও তোমার ভ্রাতাদের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, এ কাজ কোন পক্ষীদ্বারা সম্ভব নয়। আপনি আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করুন। উত্তর এল, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নহি। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরে জলস্পর্শ করবে। যুধিষ্ঠির সব কয়টি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিলে যক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে মৃত পাণ্ডবদের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। ভীমাদি সকলে গাত্রোত্থান করে সরোবরের জলে তৃষ্ণা নিবৃত্ত করলেন। যক্ষ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, আমি তোমার পিতা ধর্ম। তোমাকে পরীক্ষার জন্য আমি মৃগরূপ ধারণ করে ব্রাহ্মণের মন্থ দণ্ড হরণ করেছিলাম। এখন সেই দণ্ড ফিরিয়ে দিচ্ছি। নিজেদের আসন্ন অজ্ঞাত বাস যাতে কৌরবদের নিকট অজ্ঞাত থাকে যুধিষ্ঠির এই বর চাইলে ধর্ম বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তোমরা বিরাট রাজার রাজধানীতে অজ্ঞাত অবস্থায় বাস কর।

যক্ষ, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরগুলি সত্যই অভিনব ও বহুলাংশে সর্বজনগ্রাহ্য। এর মধ্যে আছে সনাতন ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান ও সুখীজীবন সম্বন্ধে বহু যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে রাজশেখর বসু প্রণীত মহাভারত থেকে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

যক্ষ। ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি কারণে হয়? কোন ধর্মের জন্য তাঁরা সাধু? তাঁদের মানুষভাব কেন হয়? অসাধুভাব কেন হয়?

যুধিষ্ঠির। বেদাধ্যয়ণের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যার ফলে সাধুতা, মরণের জন্য তাঁরা মানুষ; পরনিন্দার জন্য তাঁরা অসাধু হন।

যক্ষ। ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সাধুধর্ম কি? মানুষভাব কি? অসাধুভাব কি?

যুধিষ্ঠির। অস্ত্র নিপুণতাই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব। যজ্ঞই সাধু ধর্ম। ভয় মানুষভাব। শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুভাব।

যক্ষ। পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কে? তৃণ অপেক্ষা বহুতর কি?

যুধিষ্ঠির। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ হতে উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।

যক্ষ। কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে শোক হয় না? কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়?

যুধিষ্ঠির। অভিমান ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, ক্রোধ ত্যাগ করলে লোক ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে লোক সুখী হয়।

যক্ষ। বার্তা কি? আশ্চর্য কি? পন্থা কি? সুখী কে?

যুধিষ্ঠির। এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণ সমূহকে পাক করছে, সূর্য তার অগ্নি, রাত্রিদিন তার ইন্ধন, মাসঋতু তার আলোড়নের দর্বী (হাতা); এই বার্তা। প্রাণীগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে? বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন (বিখ্যাত সাধুজন, অথবা বহুজন) যে পথে গেছেন তাই পন্থা। যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টমভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক অন্ন রন্ধন করে খায় সেই সুখী।

যক্ষ। পুরুষ কে? সর্বধনেশ্বর কে?

যুধিষ্ঠির। পূণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যতকাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে পুরুষরূপে গণ্য হয়। প্রিয় অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, অতীত ও ভবিষ্যৎ যিনি তুল্য জ্ঞান করেন তিনি সর্বধনেশ্বর।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে যক্ষ প্রথমে তাঁকে এক ভ্রাতার নাম বলতে বললেন যাঁকে তিনি জীবিত দেখতে চান। যুধিষ্ঠির নকুলের নামে বললেন। যক্ষ জানতে চাইলেন, তোমার প্রধান অবলম্বন ভীম ও অর্জুনকে ছেড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবন চাচ্ছ কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, ধর্ম বিনষ্ট করলে, ধর্ম আমাকে বিনষ্ট করবে। আমি কদাচ ধর্মকে পরিত্যাগ করব না। কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই আমার জননী। আপনি নকুলকে জীবিত করে উভয়কে পুত্রবতী করুন।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর সমূহ আমাদের স্মরণ করে দেয় সহজ, সরল, সৎ, অলোভী, অহিংসক, অভিমানশূন্য সমত্ববুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই সাধুজনের পথ অবলম্বন করে সুখী জীবন লাভ করতে পারে। এই সত্য যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য, সেই রূপ রাজা বা শাসকবর্গের পক্ষেও প্রযোজ্য। বরং রাজা বা শাসকবর্গের ক্ষেত্রে এই সকল গুণাবলীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ তাঁদের কার্য্যাবলীর উপরই জনসাধারণের

ভালমন্দ নির্ভরশীল। রাজা বা শাসকবর্গ দুরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হলে অধঃস্তন রাজকর্মচারী তথা জনসাধারণও বিপথে চালিত হতে উৎসাহিত হয়। এর ফল হয় সুদূর প্রসারী; সমগ্র শাসন ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়ে। ইতিহাসে এর বহু নজির আছে। সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করতে পারে। সত্যই জয়ের স্তম্ভস্বরূপ। ধর্মের পুত্র যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে স্বাভাবিকভাবেই এই শাশ্বত বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। 'যথা ধর্ম তথা জয়'—এই অমোঘ সত্যই মহাভারতের সমগ্র ঘটনাবলীতে প্রতিফলিত। ধর্ম তাঁর প্রশ্নগুলির সদ উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন পুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর এই বিপদের দিনেও সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। তিনিও এগিয়ে এলেন পুত্রকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। বর দিলেন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস সফল হবে।

ন্যায়-নীতির প্রতীক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় একজন সর্বগুণান্বিত রাজা যে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন ও সকল বিষয়ে সাফল্য লাভ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? বলা বাহুল্য প্রধানত চরনীতির সফল প্রয়োগের জন্যই যুধিষ্ঠিরের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। স্পষ্টতঃই তিনি গুপ্তচরদের ভূমিকা ও মন্ত্রণাগুপ্তি সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের উপদেশ সর্বদা স্মরণে রেখেছিলেন।

পাণ্ডবদের বার বৎসর বনবাস সমাপ্ত হল। এখন তাঁদের দ্যূতক্রীড়ার শর্তানুসারে এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। কাজটি অতি দূরূহ। কৌরব পক্ষ চারিদিকে চর নিয়োগ করে পাণ্ডবদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পাণ্ডবদের অগ্রসর হতে হবে। পাণ্ডবগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা ছদ্মবেশে মৎস্যরাজের রাজধানী বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসে অবস্থান করবেন। স্থির হল যুধিষ্ঠির কঙ্কনামে অক্ষবিশেষজ্ঞ হিসাবে বিরাট রাজার সভাসদের পদ গ্রহণ করবেন। ভীম গ্রহণ করবেন বল্লভ নামে বিরাট রাজার পাকশালার অধ্যক্ষের পদ। অর্জুন নপুংশক বৃহন্নলা নামে রাজ অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের নৃত্য গীতাদি শিক্ষা দেবেন। নকুল অশ্ববিশেষজ্ঞ হিসাবে বিরাট রাজার অশ্বশালার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সহদেব তন্ত্রীপাল নামে বিরাট রাজার গোশালার অধ্যক্ষপদে কাজ করবেন। দ্রৌপদী কেশ সংস্কার কুশলী সৈরিন্ধ্রী বলে পরিচয় দিয়ে রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হবেন।

বিরাট নগরে যাত্রার পূর্বে যুধিষ্ঠির সারথী ইন্দ্রসেন সহ অন্যান্য আশ্রিত লোকজনদের দ্বারকা নগরীতে গমন করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হল তাঁরা যেন ঘৃণাক্ষরেও পাণ্ডবদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কাকেও কিছু না বলেন।

এরপর পুরোহিত ধৌম্য বিরাটনগরে অবস্থান কালে পাণ্ডবদের ইতি কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর তোমাদের পক্ষে অতিব গুরুত্বপূর্ণ। মান অপমান উপেক্ষা করেও তোমাদের এই এক বৎসর ছদ্মবেশে বিরাট নগরে অতিবাহিত করতে হবে। কোন স্থান পরিবর্তনের পূর্বে সর্বদা

রাজার অনুমতি নেবে। রহস্যপূর্ণ কোন বিষয়ে অন্যকে বিশ্বাস করবে না। সব সময় নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে। মনে রাখবে শত্রুপক্ষ তোমাদের অন্বেষণে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। রাজার ব্যবহৃত যান, পালঙ্ক, গজ বা রথে আরোহন করবে না। দুষ্ট লোকদের সম্পর্ক এড়িয়ে চলবে। জিজ্ঞাসিত না হয়ে রাজাকে কোন উপদেশ দেবে না। নীরবে সৎকার করবে। রাজমহিষী বা অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে অযথা বাক্যালাপ করবে না। রাজার শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা করা অতি গর্হিত, মনে রাখবে। রাজার সম্মুখে সামান্য কাজও আগ্রহ সহকারে সম্পাদন করবে। যা রাজার হিতকর তাই শুধু বর্ণনা করবে। কখনই রাজবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। রাজা মিথ্যা কথনে অত্যন্ত বিরক্ত হন, পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের তিনি ঘৃণা করেন। নিজেদের বীরত্ব ও বুদ্ধি সম্পর্কে রাজার নিকট কোন গর্ব করবে না। সর্বদা মনে রাখবে রাজার প্রিয় ও হিতকর কার্য করেই তাঁর বিশ্বাস-ভাজন হওয়া যায়।

পুরোহিত ধৌম্য আরও বললেন, রাজার সম্মুখে নিজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলছি মন দিয়ে শোন। রাজসভায় আসন গ্রহণ করে হস্তপদাদি সঞ্চালন করবে না। সর্বদা স্থিরভাবে অবস্থান করবে। উচ্চস্বরে কথা বলবে না। থুথু ফেলা ও বায়ুনিস্মরণ অতিগোপনে সম্পাদন করবে। কোন হাসির বিষয় উপস্থিত হলে মৃদু হাস্য করবে। অতিহাস্য ও হাস্য সংবরণ উভয়ই অবাঞ্ছনীয়। কখনও রাজার ন্যায় বেশভূষা করবে না। রাজপ্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কার সর্বদা ধারণ করবে। এই ভাবে চিত্ত সংযত করে বিরাটনগরে এক বৎসর অবস্থান কর। পরে রাজ্যলাভ করে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনার উপদেশ আমাদের স্মরণে থাকবে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বিজয়ের উপায় বিধান করুন।

তখন পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদের হিতকামনায় এক যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে অগ্রে নিয়ে যজ্ঞাগ্নি ও ব্রাহ্মণদের প্রদক্ষিণ করে বিরাটনগরের পথে অগ্রসর হলেন। পুরোহিত ধৌম্য পাঞ্চাল নগরে ও অন্যান্যরা দ্বারকায় এসে বাস করতে লাগলেন।

পাণ্ডবদের প্রতি পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশাবলী ছিল সময়োপযোগী ও বাস্তব সম্মত। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের ন্যায় অতি বিশিষ্ট বহু সম্মানিত ব্যক্তিদের পক্ষে এক বৎসর সকলের অজ্ঞাতে বিশেষত দুর্যোধনের চরদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কোন স্থানে বাস করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অজ্ঞাতবাসের সময় পরিচয় প্রকাশ পেলে আবার পাণ্ডবদের বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করতে হবে। অজ্ঞাত বাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন। তাঁরা যেন কোন অবস্থাতেই হঠকারিতার আশ্রয় না নেন। দুর্যোধনের চর বা অন্যান্য দুষ্ট লোকদের থেকে পাণ্ডবদের যে বিপদ আসতে পারে তা মনে করেই তিনি তাঁদের নিরাপদ স্থানে বাস করতে উপদেশ দিলেন। ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে ও ছদ্মপরিচয়ে বিরাট রাজার অধঃস্তন কর্মচারী হিসাবে সুষ্ঠুভাবে কারও কোন সন্দেহের

উদ্রেক না করে কার্যসম্পাদন করা যে সহজ সাধ্য নয় তা ভেবেই তিনি তাঁদের করণীয় ও অকরণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত করলেন। পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশগুলির সারবস্তু হল, আশ্রয়দাতার হিতকর কার্য করে তাঁর বিশ্বাসভাজন হয়ে মান অপমান সহ্য করেও অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাটিয়ে দিতে হবে। আমরা পরে দেখব পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশমত চলেই নানা বিপদ আপদের মধ্যেও নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে পাণ্ডবগণ ধৈর্য, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও মন্ত্রণাগুপ্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। দুর্যোধনের চরগণ বা অন্য কেউই তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে নি। পাণ্ডবদের ন্যায় এমন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এত দীর্ঘকাল সফল আত্মগোপন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

॥ নয় ॥

দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ পরিকল্পনামত বিরাট নগরে যাত্রা করে পথিমধ্যে এক সমীবৃক্ষে নিজেদের সকল অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখলেন। একটি মৃতদেহ বৃক্ষশাখায় স্থাপন করে স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রচার করে দিলেন তাঁরা তাঁদের কুলপ্রথা অনুসারে এক মৃতা বৃদ্ধার দেহ বৃক্ষে বেঁধে রেখেছেন! উদ্দেশ্য কেউ যেন ভয়ে বৃক্ষের দিকে না যায়। এরপর যুধিষ্ঠির নিজেদের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটি গূঢ় নাম স্থির করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত বিরাটনগরে প্রবেশ করলেন।

বিরাটনগরে পৌছে যুধিষ্ঠির প্রথমে দেবী দূর্গার স্তবে ব্রতী হলেন। দেবী স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা নিশ্চিত থাক, বিরাটনগরে বাসকালে তোমাদের পরিচয় কেউই জানতে পারবে না।

যথাসময়ে যুধিষ্ঠির বিরাটরাজ সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেকে কঙ্কনামে ব্যাঘ্রপদী ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি জীবিকার জন্য আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী। পূর্বে আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ছিলাম। দ্যূত ক্রীড়ায় আমার যথেষ্ট নিপুণতা আছে। যুধিষ্ঠিরের বাক্যে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে বিরাটরাজা তাঁকে নিজের সভাসদ পদে নিযুক্ত করতে সম্মত হলেন। তিনিও যে একজন দ্যূতানুরক্ত সে কথাও জানালেন। যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ আমার একটি সর্তআছে। আমি নীচ লোকের সঙ্গে কখনই দ্যূতক্রিয়ায় যোগ দেব না। দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভের সমস্ত অর্থই আমার প্রাপ্য হবে। অন্য কেউ তা দাবী করতে পারবেন না। বিরাট রাজা সম্মত হয়ে বললেন, তোমার অনিষ্টকারীকে আমি প্রাণে বধ করতেও কুণ্ঠিত হব না।

অতঃপর যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার প্রাসাদে পরম সমাদরে বাস করতে লাগলেন। কেউই তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারল না।

ভীমসেন বিরাটরাজ সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার নাম বল্লভ। আমি উত্তম ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করতে পারি। পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের রন্ধনশালায় নিযুক্ত ছিলাম। আমার বাহুবলও অতুলনীয়। আমি হস্তী সিংহাদি পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম

করতে পারি। এক্ষণে আপনার প্রিয়কার্য সম্পাদন করতে বাসনা করি। বিরাটরাজা বললেন, তোমাকে সুপকার বলে বোধ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তুমি নিজ শক্তিতে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করতে সমর্থ। যাহোক তোমার ইচ্ছানুসারে আমি তোমায় আমার রন্ধনশালার দায়িত্ব প্রদান করলাম। ভীমসেন কার্যভার গ্রহণ করে শীঘ্র রাজা ও অন্যান্য সকলের প্রীতিভাজন হয়ে উঠলেন। ভীমসেনের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত রইল।

দ্রৌপদী মলিন বেশে প্রাসাদের সংলগ্ন পথ দিয়ে গমন কালে বিরাটরাজ-মহিষী সুদেষ্ণার দৃষ্টিপথে পতিত হন। সুদেষ্ণা দয়াপরবশ হয়ে দ্রৌপদীকে প্রাসাদে ডেকে এনে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দ্রৌপদী বললেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, কেশসংস্কার, মাল্য রচনা প্রভৃতি নানা কার্যে আমার দক্ষতা আছে। আমি প্রথমে কৃষ্ণ ভার্য্যা সত্যভামা ও পরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী দ্রুপদকুমারীর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এক্ষণে আপনার সমীপে আগমন করেছি। সুদেষ্ণা বললেন, হে ভাবিনী, তোমার ন্যায় অপূর্ব সুন্দরী সর্বগুণলক্ষণ যুক্তা নারীকে পরিচারিকা বলে কিছুতেই ভাবতে পারছি না। তদুপরি আমার ভয় হয় বিরাটরাজা তোমার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে আমাকে ত্যাগ করে তোমাতেই না অনুরক্ত হয়ে পড়েন। দ্রৌপদী সুদেষ্ণাকে নিশ্চিন্ত করে বললেন, বিরাটরাজা বা অন্য কোন পুরুষই আমাকে লাভ করতে সমর্থ হবেন না। পাঁচজন মহাশক্তিধর গন্ধর্ব আমার স্বামী। তাঁরা সর্বদা প্রচ্ছন্নভাবে থেকে আমাকে রক্ষা করে থাকেন। দ্রৌপদীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁকে নিজ পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করলেন। এইরূপ দ্রৌপদী নিজ পরিচয় গোপন রেখে রাজপ্রাসাদে বাস করতে লাগলেন।

এরপর সহদেব গোপবেশ ধারণ করে বিরাটরাজার সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমি অরিষ্ট-নামি বৈশ্য। পূর্বে কৌরবদের গো পরিচর্য্যার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। মহাবীর পাণ্ডবগণ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আমি কর্মশূন্য অবস্থায় অতি দীনভাবে দিন যাপন করছি। আমি আপনার অধীনে কাজ করতে অভিলাষী। বিরাটরাজা প্রথমে সহদেবের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলেন। সহদেব উত্তরে বললেন, মহারাজ, আমি পাণ্ডবদের গো সমূহের সংখ্যা নিরুপণ করতাম। লোকে আমাকে তন্ত্রিপাল বলে জানত। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান গণনা করতে পারি। মহাত্মা কুরুরাজ আমার গুণাবলীর জন্য আমাকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। গোরোগ নিরুপণের সমস্ত ক্ষমতাই আমার আছে। আমি বন্ধ্যা গাভীকেও গর্ভবতী করতে সক্ষম। বিরাট রাজা সহদেবের বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর পশুশালার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করলেন। এই ভাবে সহদেব নিজ পরিচয় গোপন রেখে বিরাটনগরে বাস করতে লাগলেন।

এরপর নপুংসকবেশী অর্জুন বিরাট রাজসভায় উপস্থিত হলেন। নারী বেশী উন্নতকায় অর্জুনকে দেখে সভাস্থ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট। বিরাট রাজা অর্জুনকে বললেন, হে মহানুভব, তুমি নারী বেশ ধারণ করেছ; অথচ তোমার দেহে পুরুষের ন্যায় নানা

অস্ত্রধারণের চিহ্ন বর্তমান। তোমাকে কিছুতেই ক্লীব বলে বোধ হচ্ছে না। অর্জুন বললেন, মহারাজ, নৃত্য-গীত ও বাদ্যে আমার দক্ষতা আছে। আমাকে অনুগ্রহ করে রাজকুমারী উত্তরার নৃত্য শিক্ষিকার পদে নিয়োগ করুন। আমার নাম বৃহন্নলা। আমার এই অবস্থার কারণ স্মরণ করলে আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। বিরাট রাজা সম্মত হয়ে অর্জুনকে উত্তরা ও অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের নৃত্যগীতাদি প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত করলেন। অচিরেই অর্জুন সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহের সৃষ্টি হল না।

নকুল রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমি একজন অশ্ববিশেষজ্ঞ। পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বশালার দায়িত্বে ছিলাম। আমার নাম গ্রন্থিক। আমি আপনার অশ্বপাল হতে বাসনা করি। রাজা বললেন, অশ্ববন্ধন তোমার উপযুক্ত কাজ বলেমনে হচ্ছে না। তবুও তোমার ইচ্ছানুসারে আমি তোমাকে আমার অশ্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলাম। অশ্বশালার সকলেই তোমার অধীন হল। এই রূপে সমাদৃত হয়ে নকুল বিরাট নগরে সকলের অজ্ঞাতে বাস করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির সভাসদের পদ গ্রহণ করে রাজা রাজপুত্র ও অন্যান্য সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। দ্যূত ক্রীড়ায় দক্ষতা থাকার জন্য তিনি প্রতিদিন ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। এই অর্থ তিনি গোপনে ভ্রাতাদের পাঠিয়ে দিতেন। ভীমসেনও পাঠাতেন বিভিন্ন ভক্ষ্যদ্রব্য যুধিষ্ঠিরের ভোজনের জন্য। অর্জুন অন্তঃপুরে প্রাপ্ত পুরাতন বস্ত্রসমূহ বিক্রয় করার নামে ভ্রাতাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। সহদেব গোপবেশে দুগ্ধজাত দ্রব্যসকল ভ্রাতাদের নিকট পৌঁছে দিতেন। রাজদরবার হতে প্রাপ্ত অর্থ নকুল পাঠিয়ে দিতেন ভ্রাতাদের জন্য। দ্রৌপদী সকলের অজ্ঞাতে অতি সাবধানে পান্ডবদের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এইভাবে পান্ডবগণ পরস্পরকে সাহায্য করে অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। ধার্তরাষ্ট্রগণের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে তাঁরা ভার্য্যা দ্রৌপদীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

চতুর্থ মাসে রাজধানীতে ব্রহ্ম মহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মল্লযুদ্ধে জীমুত নামে অতিবিক্রমশালী এক মহামল্ল সহ রাজ্যের বহু প্রতিযোগীর আগমন হল। জীমুত উপস্থিত যোদ্ধাদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলে কেউই তার সম্মুখীন হতে সাহস করল না। বিরাট রাজা তখন ভীমসেনকে আদেশ করলেন মহামল্ল জীমুতের সহিত মল্লযুদ্ধ করতে। রাজার আদেশে ভীমসেন ভীষণ দুঃখিত হলেন। মল্লযুদ্ধে যোগদান না করলে রাজআজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় যা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। আবার যুদ্ধে যোগ দিলে নিজের বাহুবল প্রকাশ হয়ে পান্ডবদের প্রকৃত পরিচয় রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। অগত্যা ভীমসেন মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে জীমুত সহ অন্যান্য সকল মল্ল ও বীরপুরুষদের ধরাশায়ী করলেন। মহামল্ল জীমুত বধে বিরাট রাজা আনন্দিত হয়ে ভীমসেনকে প্রভূত অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। ভীমসেনের তুল্য কোন বীরপুরুষ উপস্থিত নেই দেখে রাজা তাঁকেসিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তির সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত করলেন। এরপর ভীমসেন রাজার

আদেশে অন্তঃপুরে রাজমহিষী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সম্মুখেও সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখাতে লাগলেন।

এদিকে অর্জুন নৃত্য-গীতাদি পরিবেশন করে অন্তঃপুরবাসিনীদের আনন্দবর্দ্ধনে ব্যাপৃত রইলেন। নকুল অশ্বগণকে সুশিক্ষিত করে রাজার নিকট বহু অর্থপ্রাপ্ত হলেন। সহদেবও লাভ করলেন বহু পুরস্কার গোপালকের কাজে দক্ষতা দেখিয়ে। ক্লিষ্টদেহী পান্ডবদের দুরাবস্থা দেখে দ্রৌপদীর মন এক গভীর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

অজ্ঞাতবাসের দশ মাস পূর্ণ হল। একদিন রাজমহিষী সুদেষ্ণার ভ্রাতা বিরাট রাজ সেনাপতি মহাবল কীচক দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললে, হে কল্যানী! তোমাকে দর্শন করে আমি এক দুর্নিবার্য কামজ্বরে জর্জরিত হয়েছি। তুমি নিজেকে সমর্পিত করে আমাকে পরিত্রাণ কর। আমার প্রণয়িণী তোমার দাসী হয়ে থাকবে। আমিও দাসের ন্যায় সর্বদা তোমার আজ্ঞাবহ থাকব। দ্রৌপদী ঘৃণার সঙ্গে কীচকের কুপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বললেন, হে সূতপুত্র, আমি কেশসংস্কারিণী সৈরিন্ধ্রী, হীন জাতিতে আমর জন্ম, আমাকে প্রার্থনা করো না। পরপত্নীতে অভিলাষ মহা অকর্তব্য। কীচক নিবৃত্ত না হয়ে বললেন, আমি এই রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর ও প্রভূত শৌর্যশালী। আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার কোনমতেই উচিত হবে না। কেন তুমি দাসী জীবনযাপন করে জীবন নষ্ট করবে? আমার সমুদয় রাজ্য তোমায় দান করলাম। তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। কীচককে তিরস্কার করে দ্রৌপদী বললেন, হে সূতপুত্র, পাঁচ মহাপরাক্রান্ত গন্ধর্ব আমাকে সর্বদা রক্ষা করে থাকেন। তাঁরাই আমার স্বামী। সৎপথে থেকে নিজ জীবন রক্ষা কর। কেন বৃথা মৃত্যুকে ডেকে আনবে?

দ্রৌপদীকে স্বমতে আনতে ব্যর্থ হয়ে কীচক ভগিনী সুদেষ্ণার শরণাপন্ন হলেন। সুদেষ্ণা কীচকের পীড়াপীড়িতে দ্রৌপদীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুরা আনয়নের অছিলায় কীচকের আলয়ে প্রেরণ করলেন। দ্রৌপদীকে দেখে কীচক তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করলে দ্রৌপদী বলপূর্বক তাঁকে ভূতলে নিক্ষেপ করে দ্রুতবেগে রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। কীচকও সভামন্ডপে এসে বিরাট রাজা, যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সভাসদদের সম্মুখেই দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে ভূতলে ফেলে পদাঘাতে জর্জরিত করলেন। ভীমসেনও তখন সেখানে উপস্থিত। তিনি কীচক বধের ইচ্ছায় রোষাবিষ্ট হয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বার বার নিজ আসন থেকে উত্থিত হবার উপক্রম করলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বাইরে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখে আত্মপ্রকাশ ভয়ে তাঁকে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে বললেন, তুমি কি কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করছ? তুমি কাষ্ঠ বাইরের বৃক্ষ হতে সংগ্রহ করতে পার। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্যার্থ বুঝে কীচকের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রইলেন।

নিগৃহীতা দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করেও বিরাট রাজা বা সভাস্থ অন্য কেউই কীচকের বিরুদ্ধে কিছুই বললেন না। যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন ও অধোমুখে নীরব থাকলেন। দ্রৌপদী বিরাট রাজাকে অধার্মিক বলে তিরস্কার করলে তিনি বললেন, আমি তোমাদের

বিরোধের বিষয় কিছুই অবগত নই। সেজন্য আমার পক্ষে কোন বিচার করা সম্ভব নয়। স্পষ্টতই বুঝা গেল বিরাটরাজার পক্ষে কীচকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। সভাসদদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ কীচকের নিন্দা ও দ্রৌপদীর প্রশংসা করলেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে রাজমহিষী সুদেষ্ণার নিকট গমন করতে নির্দেশ দিলেন। সভাস্থল পরিত্যাগ করার পূর্বে দ্রৌপদী বললেন, যাঁরা জ্যেষ্ঠের দ্যূতক্রীড়া নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করেছেন, আমি তাঁদের নিমিত্ত সতত ধর্মানুষ্ঠান করেছি। অবশ্যই তাঁরা সকল অনিষ্টকারীদের প্রাণ সংহার করে আমার দুঃখ দূর করবেন।

অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে রাজমহিষী সুদেষ্ণা বললেন, দুরাত্মা কীচক কামান্ধ হয়ে তোমাকে অপমান করেছে। যদি ইচ্ছা কর, আমি তাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করব। উত্তরে দ্রৌপদী বললেন, দুরাত্মা কীচক তাঁর অনিষ্টকারীদের হাতে হয়তো অদ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

সেই রাত্রেই দ্রৌপদী গোপনে ভীমসেনের নিকট গমন করে কীচক কর্তৃক তাঁর নিগ্রহের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে বললেন, হে ভীম, তোমার ও ধর্মরাজের সম্মুখেই কীচক প্রকাশ্য সভামন্ডপে আমাকে পদাঘাতে নিগৃহীত করল। পূর্বে তুমি ভয়ঙ্কর জটাসুরের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে। তুমিই ভ্রাতাদের সঙ্গে জয়দ্রথকে পরাজিত করে আমায় উদ্ধার করেছিলে। এক্ষণে আমার অপমানকারী দুরাত্মা কীচককে বধ কর। যদি ঐ দুরাত্মা সূর্যোদয় পর্যন্ত জীবিত থাকে তাহলে আমি বিষপানে প্রাণত্যাগ করব। এই বলে দ্রৌপদী ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শয়ন করে রোদন করতে লাগলেন।

ভীমসেন দ্রৌপদীকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে যাজ্ঞসেনি, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। আমি সবান্ধব কীচককে বধ করব। সমস্ত শোকসন্তাপ পরিত্যাগ করে তুমি কল্য কীচককে তোমার মত পরিবর্তনের কথা জানাবে। রাজভবনের নৃত্যশালায় রাত্রিতে কেউ থাকে না। সেখানে এক রমণীয় শয্যা রাখা আছে। দুরাত্মা কীচককে রাত্রিতে সেখানে আসতে প্রলোভিত করবে। আমি তথায় তাকে সংহার করব সন্দেহ নেই।

ভীমসেন কর্তৃক আশ্বস্ত হয়ে দ্রৌপদী রাত্রি প্রভাতে নিজ আলয়ে ফিরে এলেন। দুরাত্মা কীচক রাজভবনে এসে দ্রৌপদীকে বললেন, রাজার সম্মুখেই তোমাকে পদাঘাত করেছি; কিন্তু রাজা তোমায় রক্ষা করতে পারলেন না। মৎসরাজ্যের আমিই রাজা ও সেনাপতি। তুমি আমার বাক্যে অন্যথা করো না। আমার প্রণয়িনী হও। দ্রৌপদী ভীমসেনের নির্দেশমত বললেন, হে কীচক, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী আছি। কিন্তু তোমার ভ্রাতা বা অন্য কেউই যেন এ বিষয়ে কিছুই জানতে না পারে। পাছে গন্ধর্বদের কোন অপযশ হয় সেই ভয়ে আমি শঙ্কিত আছি। তুমি গোপনে আমার সঙ্গে মিলিত হতে রাজী থাকলে তবেই আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করতে পারি। কীচক সম্মত হলে দ্রৌপদী বললেন, তুমি জান রাজার নাট্যশালায় রাত্রিতে কেউই থাকে না। অন্ধকার

হলে তুমি সেখানে গমন করবে। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।

দ্রৌপদী সুযোগমত ভীমসেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কীচকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার বিবরণ দিয়ে বললেন, হে ভীম, নৃত্যশালায় কীচককে বধ করে আমর দুঃখ দূর কর, নিজ কুলের সম্মান রক্ষা কর, আর আপন প্রিয়স্কর কার্য করে সুখী হও। ভীমসেন দৃঢস্বরে বললেন, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, সেইরূপ আমিও কীচককে নিহত করব। এরপর দুর্যোধনকে বধ করে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করব। ধর্মরাজের কোন অনুরোধেই ক্ষান্ত হব না। থাকুন তিনি বিরাটরাজার প্রিয়পাত্র হয়ে।

পরিকল্পনামত ভীমসেন নারীবেশে নৃত্যশালার পালঙ্কে অবস্থান করে রইলেন। রাত্রি গভীর হলে কামান্ধ কীচক নাট্যশালায় প্রবেশ করে পালঙ্কে ভীমসেনকে দ্রৌপদী ভেবে আলিঙ্গন করলে দুজনের মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে কীচককে নিহত করে ভীমসেন তাঁর হস্তপদাদি দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে এক মাংসপিণ্ডে পরিণত করলেন। এইরূপে দ্রৌপদীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ভীমসেন নিজালয়ে ফিরে এলেন। পরে দ্রৌপদী সভাসদদের মধ্যে ঘোষণা করলেন তাঁর পতিগণ কর্তৃক পরস্ত্রীলোভী কীচক নৃত্যশালায় নিহত হয়েছেন।

কীচকের মৃত্যুর জন্য তাঁর অনুগামীরা দ্রৌপদীকে দায়ী করে তাঁকে মৃতদেহের সঙ্গে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিল। ভীত সন্ত্রস্ত বিরাটরাজার কাছ থেকে এ বিষয়ে সহজেই অনুমতি পাওয়া গেল। দ্রৌপদীকে কীচকের মৃতদেহের সঙ্গে বেঁধে সকলে মহা উল্লাসে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হলে দ্রৌপদী প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়ে পঞ্চপাণ্ডবদের গূঢ় নামে ডাকতে লাগলেন তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য। দ্রৌপদীর বিলাপ শুনে ভীমসেন বেশ পরিবর্তন করে উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় কীচক অনুগামীদের পশ্চাতে ধাবিত হলেন। শ্মশানভূমির নিকট তিনি এক বৃক্ষ উৎপাটিত করে তাদের উপর আক্রমনোদ্দত হলে তারা ভয়ে দ্রৌপদীকে সেখানে ফেলে রেখে পলায়ন করল। তাদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারাল ভীমের আঘাতে। দ্রৌপদী মুক্ত হয়ে ভীমের নির্দেশে প্রাসাদে ফিরে এলেন। প্রাসাদের দ্বারদেশে তিনি ভীমসেনকে দেখতে পেয়ে সাঙ্কেতিক বাক্যে বললেন, যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন সেই গন্ধর্বকে নমস্কার করি। ভীমসেন ঐ ভাষায় উত্তর দিলেন, গন্ধর্বগণ যাঁর বশীভূত, প্রতিশ্রুতিমত কার্য করে তাঁর ঋণমুক্ত হলেন।

প্রাসাদে রাজমহিষী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে বললেন, সৈরিন্ধ্রী, রাজার আদেশ, তুমি এখন এখান হতে বিদায় হও। গন্ধর্বদের কার্যকলাপে রাজা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ছেন। তাঁরা অতি ধূর্ত। তদুপরি তোমার রূপলাবণ্যে পুরুষগণের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্যও তোমার এখানে বাস করা উচিত হবে না। দ্রৌপদী বিনীতভাবে বললেন, দেবী, আর তের দিনের মধ্যেই গন্ধর্বগণ তাঁদের কার্যে সাফল্যলাভ করবেন। এই কয়েকটা দিন আমায় এখানে বাস করার অনুমতি দিন। গন্ধর্বদের সাফল্যে মহারাজেরও শ্রেয়লাভ হবে। সুদেষ্ণা সম্মত হলেন।

এদিকে দুর্যোধনের চরগণ, নগর জনপদ প্রভৃতি বহুস্থান অন্বেষণ করেও পাণ্ডবদের

কোন সন্ধান করতে পারল না। তাদের ধারণা হল পান্ডবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তবে তারা জানাল বিরাটরাজ সেনাপতি মহাবীর কীচক গন্ধর্বদের হাতে নিহত হয়েছেন। দুর্যোধন চরমুখে সব শুনে কিছুক্ষণ নীরব থেকে সভাসদদের বললেন, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর কিছুদিন মাত্র বাকি আছে ; এই সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁরা সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবেন সন্দেহ নেই। পান্ডবদের পুনরায় বনবাসে পাঠিয়ে আমাদের রাজ্যসম্পদ বিপদমুক্ত করতে হবে। এজন্য আপনারা তাঁদের অজ্ঞাত বাসস্থানের সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে নূতন করে উদ্যোগী হোন।

কর্ণ প্রস্তাব দিলেন, মহারাজ, বেশ কয়েকজন দক্ষ অথচ বিশ্বস্ত চরদের ছদ্মবেশে সমৃদ্ধ জনসভা, তীর্থস্থান প্রভৃতি স্থানে পান্ডবদের অন্বেষণে প্রেরণ করা হোক। আর যারা পান্ডবদের উত্তমরূপে জানেন, তাঁরা উত্তমবেশে নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, নগর, আশ্রম ও পর্বতাদিতে পান্ডবদের অনুসন্ধান করুন।

ভ্রাতা দুঃশাসন বললেন, মহারাজ, আমাদের বিশ্বাসভাজন চরদের উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়ে পুনরায় পান্ডবদের সন্ধানে প্রেরণ করা হোক। মহামতি কর্ণের প্রস্তাবমত অন্যান্য চরগণও বিভিন্ন স্থানে গমন করুক। মনে হয় পান্ডবগণ কোন গুপ্তস্থানে বাস করছেন অথবা সমুদ্রপারে গমন করেছেন। এমনও হতে পারে পান্ডবগণ কোন দৈবদুর্বিপাকে পতিত হয়ে জীবন হারিয়েছেন। আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

আচার্য দ্রোণ বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পান্ডবগণ বিনষ্ট হননি। তাঁরা কেবল সযত্ন হয়ে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছেন। সত্ত্বগুণাশ্রয়ী পান্ডবগণ শৌর্যেবীর্যে অতুলনীয়। তাঁদের অন্বেষণ করা কোন সাধারণ লোকের কাজ নয়। যে সকল ব্রাহ্মণ, চর ও সিদ্ধব্যক্তি পান্ডবদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাদেরকেই অনুসন্ধান কার্যে পুনরায় নিয়োগ করা হোক।

পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, পান্ডবগণ সর্বসুলক্ষণযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞানী, সত্যাশ্রয়ী ও সমরাভিজ্ঞ। তাঁরা অবশ্যই কৃষ্ণের অনুগত হয়ে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের মনোবল কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। ধর্মে ও বলের প্রভাবে পান্ডবগণ সতত রক্ষিত। কেউই তাঁদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। পান্ডবদের বিষয়ে আমি কয়েকটি উপদেশ দিচ্ছি। মন দিয়ে শোন। অন্যান্যরা পান্ডবদের আবাস নিরূপণ সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব দিয়েছেন আমি তার সঙ্গে একমত নহি। মহারাজ যুধিষ্ঠির একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি যে দেশে বাস করছেন তথাকার নৃপতিগণও সর্বগুণে ভূষিত হবেন। কোন অন্যায় কার্যই তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হবে না। সমগ্র রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। প্রজাসাধারণও লোভ হিংসা প্রভৃতি কোন অসদগুণের বশবর্তী হবে না। আমার বাক্য সত্য বলে মনে হলে, এই সকল বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে তোমরা ইতিকর্তব্য স্থির কর।

পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে একমত হয়ে দ্রোণাচার্য পুনরায় বললেন, মহারাজ, পান্ডবদের

অজ্ঞাত বাসস্থান নিরূপণের চেষ্টার সঙ্গে আপনার হিতকর কার্যপ্রণালী উদ্ভাবনে মনোযোগ দিন। অতি সামান্য শত্রুকেও উপেক্ষা করা উচিত হবে না; শক্তিশালী পান্ডবদের কথা তো দূরে থাক। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলেই পান্ডবগণ মহা উৎসাহে আবির্ভূত হবেন। সেজন্য আপনার শক্তি বৃদ্ধির উপর কঠোর দৃষ্টি দিতে হবে। মিত্ররাজন্যবর্গদের সঙ্গে আলোচনা করে আপনার সৈন্যদল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন। প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। এ বিষয়টিও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সাম, দান,ভেদ, দন্ড ও কর সংগ্রহ প্রভৃতি উপায় দ্বারা বলবান শত্রুকে ও বলপূর্বক দুর্বল শত্রুকে বশীভূত করুন। সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা মিত্রদের ও মিষ্টবাক্য দ্বারা সৈন্যদলকে সন্তুষ্ট রাখুন। এইভাবে ধন ও বল বৃদ্ধি করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন।

অন্যদিকে কীচক কর্তৃক পরাজিত হয়ে ত্রিপর্তরাজ সুশর্মা বহুদিন দুর্যোধনের আশ্রয়ে বাস করছেন। এক্ষণে কীচকের মৃত্যুতে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই কথা চিন্তা করে সুশর্মা দুর্যোধনকে বললেন, রাজন, বিরাটরাজা তাঁর বীর সেনাপতি কীচকের সাহায্যে আমার রাজ্য অধিকার করেছেন, সেই কীচক আর ইহজগতে নেই; তিনি গন্ধর্বদের হাতে নিহত হয়েছেন। বিরাটরাজও নিজ সেনাপতির মৃত্যুতে নিশ্চয়ই এখন দুর্বল ও হতাশাগ্রস্ত। মনে হয় মৎসরাজ্য আক্রমণ করা উচিত। সহায় সম্বলহীন পান্ডবদের অনুসন্ধানে অর্থ, সময় ও জনবল নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই।

দুর্যোধন কর্ণের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সিদ্ধান্ত মত সুশর্মা ও দুর্যোধন একদিন অন্তর পৃথক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মৎসরাজ্য আক্রমণ করলেন। সুশর্মা বলপূর্বক বিরাটরাজার গো সমূহ অপহরণ করলে দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। পান্ডবদের মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব বিরাটরাজ প্রদত্ত কবচ ও অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বিরাটরাজা সুশর্মা কর্তৃক বন্দী হলে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীমসেন তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধে সুশর্মা পরাজিত হয়ে বিরাটরাজের দাসত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে তিনি মুক্তি পেলেন।

যুদ্ধশেষে বিরাটরাজা পান্ডবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনার প্রসাদেই আমার জীবন ও রাজ্য রক্ষা পেল। আপনিই আমাদের অধিপতি।

তারপরদিন বিরাটরাজা বিজয় উল্লাসে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এদিকে বিশাল কৌরববাহিনী দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি মহারথিদের অধিনায়কত্বে মৎসদেশে উপনীত হয়ে গোপালকদের প্রহার করে বহু সংখ্যক গো হস্তগত করল। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে অর্জুন দ্রৌপদীকে নির্জনে বললেন, তুমি এক্ষণি রাজপুত্র উত্তরকে বল, বৃহন্নলা পূর্বে পান্ডবগণের সারথ্যভার গ্রহণ করে মহাযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। সে জন্য আপনার সারথী হবার উনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

দ্রৌপদীর কথায় অর্জুনকে তাঁর রথের সারথী করে রাজপুত্র উত্তর কিছুদূর গমন

করে বিরাট কৌরবসেনাকে সম্মুখে দেখে ভয়ে পলায়নপর হলেন। অর্জুন নানাভাবে অভয় দিতে লাগলেন উত্তরকে। পরে শমীবৃক্ষ হতে লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে উত্তরকে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে ছদ্মবেশে থাকার কারণ জানালেন। অর্জুন উত্তরকে সারথী করে দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কৌরবসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। রথধ্বজা ও শঙ্খধ্বনি হতে এবং অস্ত্রপ্রয়োগের নৈপুণ্য দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ কৌরব পক্ষীয় মহারথীগণ বুঝতে পারলেন রথোপরি বীর যোদ্ধাই পান্ডুপুত্র অর্জুন। গান্ডীবধারী অর্জুনের শরাঘাতে কৌরব সৈন্য পর্যুদস্ত হল। সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করে প্রধান প্রধান কৌরবপক্ষীয় বীরদের হতচৈতন্য করে ফেলে উত্তরকে দিয়ে তিনি তাঁদের বস্ত্রাংশ কর্তন করে আনলেন রাজকুমারী উত্তরাকে উপহার দিতে। এইভাবে অর্জুন কৌরবদের পরাজিত করে অপহৃত গো সমূহ উদ্ধার করে আনলেন।

যুদ্ধশেষে অর্জুন রাজকুমার উত্তরকে বললেন, পান্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করছেন এ কথা কাকেও প্রকাশ করো না। কৌরবদের পরাজয় ও গোধন উদ্ধার তোমারই কাজ বলে প্রকাশ করবে। অতঃপর অর্জুন দিব্যাস্ত্রসমূহ শমীবৃক্ষে পূর্বের ন্যায় স্থাপন করে বেণীবন্ধন করে পুনরায় বৃহন্নলারূপে রাজপুত্রের অশ্বরশ্মি ধারণ করলেন। রাজপুত্র উত্তর অর্জুনকে সারথী করে রাজধানীর পথে অগ্রসর হলেন।

এদিকে রাজধানীতে বিরাটরাজা রাজকুমারের জন্য চিন্তিত হয়ে বললেন, নপুংসক বৃহন্নলা যাঁর সারথী, তাঁর যুদ্ধে জীবিত থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। যুধিষ্ঠির শুনে বললেন, মহারাজ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বৃহন্নলার সারথ্যে আপনার পুত্র সকল শত্রুকে পরাজিত করতে সমর্থ হবেন। ইতিমধ্যে দূতমুখে যুদ্ধজয়ের সংবাদ পেয়ে মহা আনন্দিত বিরাট রাজা পুত্রের উপযুক্ত সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় বসলেন। ক্রীড়া চলাকালে বিরাট রাজা, কৌরবদের বিরুদ্ধে পুত্র উত্তরের সাফল্যের উল্লেখ করলে অর্জুন বললেন, বৃহন্নলা যাঁর সারথী, তাঁর জয় অবশ্যম্ভাবী। সারথী বৃহন্নলার বার বার প্রশংসায় রুষ্ট হয়ে বিরাটরাজা বললেন, তুমি আমার পুত্রের সাফল্য সম্বন্ধে কোন কথা না বলে আমারই অবমাননা করছ। রাজার সঙ্গে কীভাবে বাক্যালাপ করতে হয় তা তুমি ভুলে গেছ। এবারের মত আমি তোমায় ক্ষমা করছি। যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে পুনরায় বৃহন্নলার প্রশংসা করে বললেন, মহারাজ, বৃহন্নলার তুল্য বাহুবল কাহারও নেই। তিনি দেব, দানব ও মানবদের একসঙ্গে পরাজিত করতে সমর্থ। এবার বিরাটরাজা ধৈর্য হারিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষ দ্বারা নাসিকায় আঘাত করে রক্তপাত ঘটালেন। দ্রৌপদী কালবিলম্ব না করে একটি স্বর্ণপাত্রে সেই রক্ত ধারণ করলেন।

রাজপুত্র উত্তর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করে রক্তাক্ত দেহে যুধিষ্ঠিরকে দেখে সন্তপ্ত হয়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই পাপকার্যের অনুষ্ঠান করেছে? বিরাটরাজা যুধিষ্ঠিরের আঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করলে উত্তর বললেন, মহারাজ, আপনি এঁকে প্রহার করে অতি গর্হিত কাজ করেছেন। ইনি প্রসন্ন না হলে আপনি

ব্রহ্মশাপে সমূলে বিনষ্ট হবেন। বিরাটরাজা ক্ষমা প্রার্থনা করলে যুধিষ্ঠির বললেন, আমি অপনাকে পূর্বে ক্ষমা করেছি। আমার রক্ত মাটিতে পড়লে আপনি অবশ্যই বিনষ্ট হতেন; আপনার রাজ্যও উৎসন্নে যেত।

এই সময় বৃহন্নলা সেখানে উপস্থিত হলেন। বিরাটরাজা তাঁকে অভিনন্দিত করে পুত্র উত্তরকে যুদ্ধজয়ের জন্য নানাভাবে প্রশংসা করলে, উত্তর যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ দিয়ে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্রে এক দেবপুত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি একাকী এই অসাধ্য সাধন করেছেন। বিস্ময়াবিষ্ট বিরাটরাজা সেই দেবপুত্রকে দেখতে চাইলে উত্তর জানালেন তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই পুনরায় আবির্ভূত হবেন। বিরাটরাজা অর্জুনের বৃত্তান্ত কিছুই জানতে পারলেন না।

অর্জুন অন্তঃপুরে যেয়ে কৌরব মহারথীদের অপহৃত বস্ত্রাংশ রাজকুমারী উত্তরাকে প্রদান করলেন। পরে পান্ডবগণ নিভৃতে রাজপুত্র উত্তরের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

পরদিন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজবেশে বিরাটরাজের সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। অর্জুন বিরাটরাজাকে যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, ভীম, নকুল ও সহদেবের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করলেন। উত্তর অর্জুনের পরিচয় দিয়ে বললেন, ইনিই সেই দেবপুত্র যিনি একাকী অসাধারণ শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে বিশাল কৌরববাহিনীকে পরাজিত করে গো-সমূহ উদ্ধার করেছেন। বিরাটরাজা বিস্ময়ে হতবাক। তিনি পান্ডবদের যথোচিত সৎকার করে তাঁর সমস্ত রাজ্যসম্পদ যুধিষ্ঠিরকে দান করলেন। তিনি অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব দিলে অর্জুন উত্তরাকে নিজপুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সম্বন্ধ অনুমোদন করলেন। পরে মহা ধুমধামের সহিত কৃষ্ণ ও অন্যান্য বহু রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। এইভাবে প্রতিজ্ঞামত পান্ডবদের এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের সমাপ্তি ঘটল।

দুর্যোধন প্রশ্ন তুলেছিলেন, অর্জুন অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রকাশ্যে বিরাটরাজের পক্ষে কৌরবদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। সে জন্য পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে এবং তাঁদের পুনরায় বার বৎসর বনবাস ও এক বৎশর অজ্ঞাত বাসে থাকতে হবে। গণনায় দুর্যোধনের অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হয় এবং পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞামত এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ভীষ্মাদি গুরুজনগণ স্বীকার করে নেন।

পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে এক তীব্র স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা করেছিল। কৌরবপক্ষ নানাস্থানে চর নিয়োগ করে পান্ডবদের অজ্ঞাত বাসস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করছিলেন, আর অন্যদিকে পান্ডবগণ তাঁদের অজ্ঞাত বাসস্থান যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে সে বিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পান্ডবগণই জয়ী হলেন। তাঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন প্রতিজ্ঞামত পূর্ণ এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে অবস্থান করে। এই সাফল্যের পিছনে আছে যেমন পান্ডবদের নানা সময়োপযোগী পদক্ষেপ তেমনি

কৌরবদের নিদারুণ ব্যর্থতা পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সংবাদ সংগ্রহে। বাস্তবিকপক্ষে পান্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে চরনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগদ্বারা সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় গোপণতা রক্ষা করেই প্রধানত অজ্ঞাতবাস সফল করেছিলেন। পান্ডবদের সতর্কতা এতই কঠোর ছিল যে দুর্যোধনের চরগণ অসহায়ভাবে নানাস্থানে বিচরণ করেই কেবল সময় নষ্ট করল। কাজের কাজ কিছুই করতে পারল না।

অজ্ঞাতবাসের সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন যুধিষ্ঠির স্বয়ং। এখানে যুধিষ্ঠিরকে আমরা একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দার ভূমিকায় দেখতে পাই। যুধিষ্ঠির ছিলেন সত্য ও ধর্মের প্রতীক। কোন অন্যায় পথে তিনি কার্যোদ্ধারের বিরোধী। পান্ডবদের ন্যায় অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক বৎসরের ন্যায় এত দীর্ঘ সময় যে সকলের অজ্ঞাতে কোন স্থানে বাস করা অতি দুরূহ তা যুধিষ্ঠির ভাল করেই জানতেন। এ বিষয়ে ভীমের আশঙ্কার কথা তাঁর মনে সব সময় জাগরূপ ছিল। সে জন্য তিনি সকল আঁটসাঁট বেঁধেই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিজের শক্তি সামর্থের উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু তিনি জানতেন সকল সাফল্যের জন্য দৈব কৃপার প্রয়োজন আছে। পিতা ধর্ম, পুরোহিত ধৌম্য ও অন্যান্য মুনিঋষিদের ও শেষে স্তবে সন্তুষ্ট করে দেবী দূর্গার আশীর্বাদ ও বর লাভ করেছিলেন অজ্ঞাত বাসের সাফল্যের জন্য। তিনি এও জানতেন দৈবের প্রভাব প্রকাশ পায় পুরুষকারের সাহায্যেই ; কোন উদ্যোগহীন পুরুষ কেবল দৈববলে সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাই অজ্ঞাত বাসের এই দুরূহ কার্যে তিনি প্রধানত নিজ পুরুষাকারের উপর নির্ভর করেছিলেন, দৈবশক্তিকে কোনরূপ খাটো না করে।

যুধিষ্ঠির পিতা ধর্মের নির্দেশানুসারে মৎসরাজ্যে অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করতে স্থির করলেন। পিতার উপদেশ তাঁর সম্পূর্ণ মনঃপুত হয়েছিল, এইজন্য যে মৎসরাজ তখনকার দিনে একজন অতি ধর্মশীল রাজা বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যে স্থানে সামান্যতম অধর্মের গন্ধ আছে সে স্থান ধর্মরাজের বাসস্থান হতে পারে না। সেদিক থেকে পান্ডবদের মৎসরাজ্যে বাসের সিদ্ধান্ত সবদিক থেকে উপযুক্ত হয়েছিল। মৎসরাজ্যে গমনের পূর্বে পুরোহিত ধৌম্যের নিকট প্রাপ্ত উপদেশাবলী স্মরণে রেখে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাগণ ধৈর্য্য ধরে সকল অবমাননা সহ্য করে আশ্রয়দাতার প্রিয়-কার্য সম্পাদন দ্বারা সব সন্দেহের উর্দ্ধে থেকে ছদ্মনামে ছদ্ম পরিচয়ে ছদ্মবেশে দিন যাপন করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুস্থ নেতৃত্বই এর জন্য দায়ী। যুধিষ্ঠির সর্বদা লক্ষ্য রাখছিলেন যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে বিশেষ করে ভীমসেন যেন হঠাৎ কুপিত হয়ে এমন কিছু না করে বসেন যাতে তাঁদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিরাটরাজের সভাগৃহে কীচক কর্তৃক দ্রৌপদীর নিগ্রহের দৃশ্য দেখে ভীমসেন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কীচকের উপরে আক্রমণোদ্যত হতে যাচ্ছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে সাংকেতিক বাক্যে নিবৃত করেন। ভীমসেন যেভাবে বার বার বাইরে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন তা থেকে তিনি বুঝেছিলেন আক্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি বৃক্ষ উৎপাটিত করতে যাচ্ছেন। ঐ সময়

যুধিষ্ঠির হস্তক্ষেপ না করলে ভীমসেন বৃক্ষ উৎপাটন করে কীচক ও তাঁর অনুগামীদের আক্রমণ করতেন এবং ফলে পান্ডবদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত। যার পরিণাম হত সুদূরপ্রসারী।

তখনকার মত সভামন্ডলের উত্তেজনা প্রশমিত করতে যুধিষ্ঠির আরও একটি সময়োপযোগী কাজ করলেন। তিনি দ্রৌপদীকে রাজমহিষীর কাছে গমন করতে নির্দেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির নীরব থাকলে ও দ্রৌপদী সভামন্ডপ ত্যাগ না করলে কীচক হয়তো তাঁকে আরও নিগৃহীত করতেন। সে অবস্থায় ভীমসেনকে কি নিরস্ত রাখা সম্ভব হত? যুধিষ্ঠিরের হস্তক্ষেপে একটি বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হল। এখানেও যুধিষ্ঠির এক প্রখম বাস্তব বুদ্ধি ও প্রত্যুৎমতিত্বের পরিচয় দিলেন।

কীচক বধের পরিকল্পনা করেছিলেন ভীমসেন স্বয়ং। পরিকল্পনার মধ্যে খুঁত ছিল না। ভীমসেনের নির্দেশমত দ্রৌপদী সমস্ত ভাবাবেগ দমিত রেখে কীচকের কুপ্রস্তাবে রাজী হয়ে তাঁকে রাত্রিতে শূন্য নৃত্যশালায় আসতে বললেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে। তবে তিনি শর্ত দিলেন এ কথা যেন কেউই জানতে না পারে। কীচক কর্তৃক আশ্বাসিত হয়ে দ্রৌপদী নিশ্চিন্ত হলেন কীচকের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনি। কীচকের ন্যায় এক বীর যোদ্ধাকে একাকী নৃত্যশালায় এইভাবে প্রতারিত করে নিয়ে এসে দ্রৌপদী তাঁর অভিনয় প্রতিভা, বুদ্ধি ও সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। সত্যই কীচককে বধ করার আর কোন উপায় ছিল না তখনকার পরিস্থিতিতে পান্ডবদের পরিচয় গোপন রেখে। কীচকের মৃত্যু না হলে দ্রৌপদীও তাঁর লোভের শিকার থেকে মুক্তি পেতেন না। মনে হয় যুধিষ্ঠিরও জানতে পারলে কীচক হত্যায় ভীমসেনের পরিকল্পনা অনুমোদন না করে পারতেন না সমস্ত দিক বিবেচনা করে। গন্ধর্বদের হাতে কীচকের মৃত্যু হয়েছে এই কথা প্রচার করে দ্রৌপদী সকলের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন যাতে পান্ডবদের উপর কোন সন্দেহ না জাগে। যখন কীচক অনুগামীরা কীচকের মৃতদেহের সঙ্গে দ্রৌপদীকে বেঁধে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হল তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দেওয়া নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য গূঢ় নামে পান্ডবদের ডাকতে লাগলেন সাহায্যের জন্য। ভীমসেন গূঢ় নাম শুনেই দ্রৌপদীর বিপদের গুরুত্ব বুঝেই তাঁকে উদ্ধার করলেন। ছদ্মনাম বাদেও নিজেদের আরও পাঁচটি গুপ্তনাম রাখার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের দুরদর্শিতার পরিচয় মেলে, আর দ্রৌপদীও ঐ নামে পান্ডবদের সাহায্য প্রার্থনা করে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। এতে কার্যোদ্ধারের সঙ্গে পান্ডবদের পরিচয় গোপন রইল। সকলে মনে করল অদৃশ্যমানে মহাশক্তিধর গন্ধর্বরাই এইসকল অভূতপূর্ব কার্যসকল সম্পাদন করছেন। অন্য বেশধারী ভীমসেনকেও তাঁরা এক গন্ধর্ব বলে মনে করল।

কোন কোন কাহিনীকারের মতে কীচক বধে অর্জুনেরও একটি ভূমিকা ছিল। নৃত্যশালায় যখন কীচকের সঙ্গে ভীমসেনের মল্লযুদ্ধ চলছিল তখন বৃহন্নলারূপী অর্জুন ঢোলক বাজিয়ে যুদ্ধের শব্দ যাতে বাইরে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কীচক ও ভীমসেন উভয়েই অশেষ দৈহিক বলের অধিকারী ছিলেন; মল্লযুদ্ধে তাঁদের

পারদর্শিতাও ছিল অপরিসীম। ভয়ঙ্কর এই মল্লযুদ্ধ চলেছিল বহুক্ষণ ধরে। পরস্পরের আঘাতের শব্দ বাইরে কোন রক্ষী বা অন্য কারও কানে পৌঁছে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারত। অর্জুনের ঢোলক বাদনে এই সম্ভাবনা দূর হয়েছিল। ভীমসেন অনেকটা নিশ্চিন্তে তাঁর কার্যসিদ্ধি করার সুযোগ পেলেন। কীচক নিধনে অর্জুনের সহায়তার মূল্যও কম ছিল না। রাত্রিতে গোপনে নৃত্যশালায় এসে ঢোলক বাজানোর মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল। অর্জুনের ন্যায় বীরের পক্ষেই এমন কাজ সম্ভব।

ভীমসেনকে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু কিছু কাজ করতে হয়েছিল যা তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে পারত। যেমন সর্বসম্মুখে পশুদের সহিত যুদ্ধ ও কীচক অনুগামীদের হাত থেকে দ্রৌপদী উদ্ধারে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটন করে তাদের উপর আক্রমণ। কারণ এমন দৈহিক বলের অধিকারী ভীমসেন ভিন্ন অন্য কেউই ছিলেন না। প্রথম কাজটি রাজআজ্ঞায় সম্পাদিত করতে হয়েছিল; তাঁর নিজের কোন হাত ছিলনা। আর দ্বিতীয় কাজটি করতে হয়েছিল নিতান্ত বাধ্য হয়ে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করতে। সেই সময় অন্য কোন উপায়ে দ্রৌপদীকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। পান্ডবদের সৌভাগ্য ভীমসেনের বলবীর্য দেখেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগেনি।

দ্রৌপদী ও পান্ডবগণ নিজেরাই নিজেদের অজ্ঞাতবাসের নাম ও পেশা স্থির করেছিলেন। যুধিষ্ঠির এ বিষয়ে নিজের মত ভ্রাতাদের উপর চাপিয়ে দেননি। নিজের নাম ও পেশা নির্ধারণেও তিনি ভ্রাতাদের অভিমত গ্রহণ করেননি। নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাম ও পেশা নির্ধারণের এই স্বাধীনতা সবদিক থেকেই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল। এরজন্য সমস্ত কৃতিত্বই যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য। তিনি ইচ্ছা করলেই দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের জন্য অজ্ঞাতবাসের নাম ও পেশা স্থির করে দিতে পারতেন। তিনি জানতেন এ বিষয়টি তাঁদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত; অপরের হস্তক্ষেপে তাঁদের স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রয়োগ ও কর্মসম্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন অক্ষবিদ। সেজন্য তিনি অক্ষবিশারদ হিসাবে বিরাটরাজের সভাসদ হলেন। ভীম ছিলেন ভোজনবিলাসী ও রন্ধনকার্যে পারদর্শী। তাঁর গুণাবলীর জন্য তিনি রাজার রন্ধনশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। তাঁর দেহবল ছিল অসাধারণ। মল্লযুদ্ধেও তাঁর ছিল বিশেষ পারদর্শিতা। তিনি মানুষ ও পশুর সঙ্গে সমানভাবে লড়তে পারতেন। মল্লযুদ্ধেও রাজা তাঁকে নিয়োগ করলেন সকলের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য। অর্জুন স্বর্গরাজ্যে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের নিকট নৃত্য-গীত ও বাদ্যশিক্ষা লাভ করেছিলেন। অপ্সরা উর্বশীর শাপে অর্জুন ক্লীবত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্জুন এ সবের সুযোগ নিয়ে নপুংসক সেজে রাজকুমারী উত্তরা ও অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীদের নৃত্য-গীতাদি শেখানোর কাজে নিযুক্ত হলেন। এরচেয়ে উৎকৃষ্ট ছদ্মবেশ আর কী হতে পারে? নকুল ও সহদেব তাঁদের গুণাবলীর জন্য যথাক্রমে রাজার অশ্বশালার ও পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। দ্রৌপদী নিজেই সৈরিন্ধ্রী নামে রাজমহিষীর কেশ পরিচর্য্যার কাজ বেছে নিলেন। অপূর্ব

বাক্‌চাতুর্য দ্বারা দ্রৌপদী রাজমহিষী ও পান্ডবগণ বিরাটরাজের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের আত্মপ্রত্যয় ও অভিনয় প্রতিভা দেখে আমরা বিস্মিত হই। পান্ডবদের এই সাফল্যের মূলে ছিল পেশা নির্বাচনে তাঁদের স্বাধীনতা।

যুধিষ্ঠির সভাসদের পদ গ্রহণ করে নিজ আরোপিত শর্তানুযায়ী দ্যূতক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতেন কেবল রাজা, রাজপুত্র ও উচ্চপদাধিকারী সভাসদদের সঙ্গে। তিনি কোন নীচ জাতীয় লোকদের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় বসতেন না। দ্যূতক্রীড়ায় অর্জিত সকল অর্থই তিনি নিজের অধিকারে রাখতেন। এইভাবে তিনি তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের সংখ্যা সীমিত রাখতেন ও দূত্যক্রীড়ালব্ধ অর্থ নিয়ে বাগ্‌বিতন্ডা এড়িয়ে চলতেন। এসবেরই উদ্দেশ্য ছিল পান্ডবদের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত রাখা। যুধিষ্ঠিরের ভয় ছিল বেশি লোকের সঙ্গে পরিচয় হলে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। তাঁর এই আশঙ্কার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত রেখে যুধিষ্ঠির গভীর দূরদর্শিতা ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। পান্ডবদের সকল অজ্ঞাতবাসের এটাও একটি কারণ।

বিরাটরাজের অক্ষ নিক্ষেপে যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হতে রক্তপাত হলে দ্রৌপদী তা একটি পাত্রে ধারণ করেন। দ্রৌপদী জানতেন যুধিষ্ঠিরের রক্ত মাটিতে পড়লে এবং তা অর্জুনের দৃষ্টিগোচর হলে প্রতিজ্ঞামত অর্জুন কর্তৃক রক্তপাতকারী বিরাটরাজার জীবননাশ হত। দ্রৌপদীর বুদ্ধির জন্য সে সময় একটি মহা দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। দ্রৌপদীর সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ ও বিরাটরাজের ক্ষমা প্রার্থনায় ঘটনাটির শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে। যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের অপরাধ মার্জনা করলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। পরে পান্ডবদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেলে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে দুই রাজপরিবারের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। পরবর্তীকালে এই মৈত্রীবন্ধন কুরুপান্ডব যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পান্ডবদের বিরাটরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না, তাঁর রাজ্যে আশ্রয় পাবার জন্য যদিও তিনি তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতেন না। সেজন্য মৎসরাজ্য আক্রমণের সংবাদে তাঁরা নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। তাঁরা আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে অগ্রসর হলেন নিজেদের বিপদ ও অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করেও। ভীমসেনই উদ্ধার করলেন বিরাটরাজকে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার হাত থেকে তাঁর সমস্ত সেনাকে পর্যুদস্ত করে। সেইরূপ অর্জুনও একাকী কৌরবসেনাকে পরাজিত করলেন। পান্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। তাঁরা অনায়াসে এত বড় ঝুঁকি না নিতেও পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা করলেন না। আশ্রয়দাতার বিপদের দিনে তাঁরা কেন নীরব থাকবেন? ধর্মাশ্রয়ী পান্ডবদের পক্ষেই এমন কাজ আশা করা যায়। সৌভাগ্যক্রমে পরে দেখা গেল অর্জুন তথা পান্ডবদের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল প্রতিজ্ঞামত পূর্ণ এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ করার পরই। সিদ্ধিলাভ যে ধর্ম ও ন্যায়নীতির ধারক ও বাহকেরই করায়ত্ত তা যেন এই ঘটনায় নূতন করে প্রমাণিত হল।

অজ্ঞাতবাসে দ্রৌপদী ও পান্ডবদের ভূমিকা সবদিক থেকেই সঠিক ছিল। অজ্ঞাতবাস তাঁদের নিকট ছিল এক জীবন মরণ সমস্যা। সেজন্য তাঁরা পুরোহিত ধৌমের উপদেশাবলী ও চরনীতির বিভিন্ন নির্দেশাবলী অনুসরণ করে মন্ত্রণাগুপ্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে অতি সাবধানের সঙ্গে দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও। সফল অজ্ঞাতবাস পান্ডবদের একটি মহান কীর্তি। এই সাফল্য প্রমাণ করল পান্ডবগণ বুদ্ধি, চাতুর্যে ও কৌশলে কৌরবদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এও প্রমাণিত হল পান্ডবগণ অজেয়; তাঁদের হাতে কৌরবদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস নির্ণয়ে কৌরবদের ব্যর্থতার যেন কোন ক্ষমা নেই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে মহাসম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। মর্ত্যের সর্বত্র প্রসারিত ছিল তাঁর সুনাম ও প্রতিপত্তি। ভীমসেনের বলবীর্যের কাহিনী কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হিসাবে অর্জুনের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। শৌর্যবীর্যে নকুল ও সহদেবের খ্যাতিও কম ছিল না। অপূর্ব সুন্দরী দ্রৌপদীর পঞ্চপান্ডবকে পতিত্বে বরণের ঘটনা ছিল না। অপূর্ব সুন্দরী দ্রৌপদীর পঞ্চপান্ডবকে পতিত্বে বরণের ঘটনা সকল রাজ্যে প্রচারিত ছিল। অতি বিশিষ্ট মহামান্য পঞ্চপান্ডব ও ভার্য্যা দ্রৌপদীর পক্ষে কোন স্থানে পূর্ণ এক বৎসর সকলের অজ্ঞাতে অবস্থান করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সেই দুঃসাধ্য কাজটি সংগঠিত হল; দুর্যোধনের চরগণ বহু চেষ্টা করেও পান্ডবদের অজ্ঞাত বাসস্থান নির্ণয় করতে সমর্থ হল না। দুর্যোধন জানতেন অর্জুনের দিব্যাস্ত্রপ্রাপ্তিতে পান্ডবগণ এখন অজেয় হয়ে উঠেছেন; তাঁরা অজ্ঞাতবাসের পর সর্বশক্তি নিয়ে কৃষ্ণ ও অন্যান্য মিত্র রাজন্যবর্গের সহায়তায় কৌরবদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবেন। সে জন্য অজ্ঞাতবাস পাণ্ডবদের ন্যায় কৌরবদের পক্ষে ছিল এক জীবন-মরণ সমস্যা। দুর্যোধন অবশ্যই নানা সম্ভাব্য নগরে প্রান্তরে চর নিয়োগ করে পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল কেন?

দুর্যোধনের চরগণ হস্তিনাপুর এসে প্রথমে সংবাদ দিল পান্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে কোথায় গমন করেছেন তা তারা জানতে ব্যর্থ হয়েছে? অজ্ঞাতবাসে গমনের পূর্বে নাকি এমন ঝড় বৃষ্টি কুঞ্ঝটিকার সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা কিছুতেই দৃষ্টিগোচর করতে পারেনি। জানা যায় বনবাসের শেষকালে কয়েকজন লোককে অদূরে সন্দেহজনকভাবে ঘুরাফেরা করতে দেখতে পেয়ে দ্রৌপদী তা পান্ডবদের গোচরে অনেন। এদের দুর্যোধনের গুপ্তচর সন্দেহে অর্জুন মন্ত্রপূতঃ বাণ প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে তাদের দৃষ্টি বিভ্রম করে দেন। এইভাবে চরদের ফাঁকি দিয়ে তাদের অজ্ঞাতে পান্ডবগণ বিরাট নগর অভিমুখে অগ্রসর হন।

মনে হয় দুর্যোধনের চরগণ গুপ্ত সংবাদ আহরণের নীতিগুলি সঠিকভাবে পালন করেনি। তাদের উচিত ছিল উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে পান্ডবদের সঙ্গে দৃষ্টি সংযোগ

(visual contact) রক্ষা করা। এইভাবে পান্ডবদের অজান্তে তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখলে তাঁদের বিরাটনগরে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হত। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে অসতর্ক হয়ে তারা নিজেদের অবস্থান পান্ডবদের কাছে পূর্বেই প্রকাশ করে দেয়। চরগণ অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টিতে কিছুই দৃষ্টিগোচর করতে না পেরে পান্ডবদের পরবর্তী গতিপথের কোন সংবাদই পায় না। এটাই দুর্যোধনের চরদের প্রথম বড় ব্যর্থতা পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সংবাদ সংগ্রহে।

এখানে আরও একটি বিষয় আলোচনা সাপেক্ষ। দুর্যোধনের অবহিত হওয়া উচিত ছিল অর্জুন যিনি সকল দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত, চরদের উপস্থিতি সন্দেহ না করলেও স্বাভাবিক সতর্কতা হিসাবে বিরাটনগরে যাত্রার পূর্বে এরূপ একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করবেন তাঁদের পরবর্তী যাত্রাপথ সকলের নিকট অজ্ঞাত রাখতে। কিন্তু দুর্যোধনের এরূপ কোন চিন্তা মাথায় আসেনি। তিনি চরদের উপর পান্ডবদের গতিবিধি সংগ্রহের দায়িত্ব ন্যস্ত করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাদের কাজের তদারকির উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা স্থানীয় স্তরে ছিল বলে মনে হয় না। তাদের কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হলে তার প্রতিবিধানে তাৎক্ষণিক কোন নির্দেশ পাওয়া সম্ভব ছিল না। তখনকার দিনে শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে মায়াবিদ্যা প্রয়োগের বেশ প্রচলন ছিল। দুর্যধন নিজে মায়াবিদ্যার অধিকারী ছিলেন। অধীনস্থ লোকদেরও এ বিদ্যা অজানা থাকার কথা নয়। দুর্যোধন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হলে সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতির মোকাবেলায় মায়াবিদ্যা বা অন্য কোন বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের চরদের সঙ্গে প্রেরণ করতে পারতেন। দুর্যোধন, মনে হয়, সকল বিষয়টি অতি সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন; গভীরভাবে কিছুই অনুধাবন করেননি। পান্ডবগণ বুদ্ধিমান ও বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন। প্রতি পদক্ষেপ তাঁরা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেই গ্রহণ করতেন। ফল যা হবার তাই হল। অজ্ঞাতবাসের প্রথম রাউন্ডে কৌরবপক্ষ পান্ডবদের নিকট হেরে গেলেন।

প্রায় একই সঙ্গে দ্রৌপদী ও পান্ডবগণ বিরাটরাজের প্রাসাদে কাজ গ্রহণ করেন। তাঁরা অবশ্য সকলেই ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে ও ছদ্মপরিচয়ে ছিল। তাঁদের ব্যবহার ও কথাবার্তা ছিল অতি মার্জিত। পান্ডবদের দেহসৌষ্ঠবও ছিল অপূর্ব। দ্রৌপদীর সৌন্দর্যের তুলনা ছিল না। এঁরা যে সকলেই উচ্চবংসসম্ভূত সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। প্রথম দর্শনেই রাজা পান্ডবদের ও রাজমহিষী দ্রৌপদীকে আপন করে নিলেন এবং তাঁদের প্রার্থিত পদে নিযুক্ত করলেন কেবল তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে। এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সূচনায় পান্ডবদের একই সঙ্গে হঠাৎ বিরাটনগরীতে উপস্থিতি লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে বাধ্য। দুর্যোধনের চরগণ কিন্তু এইসকল অপরিচিত ব্যক্তিদের আগমন সংবাদের কোন গুরুত্ব দেয়নি। তাদের মনে কোন সন্দেহও জাগেনি। রাজমহিষী ও রাজার কাছে তাঁদের বক্তব্যই সত্য বলে মনে করেছে। এই সংবাদটি তারা হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের গোচরে আনারও প্রয়োজন মনে করেনি। দুর্যোধন এই সংবাদ পেলে অবশ্যই তাঁদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হতেন। তাঁর চরদের তিনি নূতন করে

নির্দেশ দিতে পারতেন নবাগতদের গতিবিধি ও কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখতে। সংবাদের অভাবে এইসকল অবশ্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাগুলি অকার্যকর থেকে গেল। আরও আশ্চর্যের বিষয় চরগণের মনে কোন সন্দেহ জাগল না রাজরন্ধনশালার পাচকরূপী ভীমসেনকে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ও বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটন করে কীচক অনুগামীদের আক্রমণ করতে দেখেও। চরগণ অবশ্যই দ্বিতীয় পান্ডব ভীমসেনের বলবীর্যের বিষয় জ্ঞাত ছিল। একজন সাধারণ রন্ধনশালার পাচকের পক্ষে এমন বীরত্ব প্রদর্শন সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না। কিন্তু এইসকল ঘটনা দুর্যোধনের চরদের মনে কোন দাগ কাটতে সমর্থ হল না। তবে কি দুর্যোধনের চরদের পেশাগত দক্ষতা বলে কিছুই ছিল না? কিন্তু তা বিশ্বাস করতে বাধে। যা সাধারণ নাগরিকদের মনে সন্দেহ জাগায় তা দেখে শিক্ষিত চরগণ কেমনে নির্বিকার থাকতে পারে? তবে কি দুর্যোধনের চরগণ আসলে পান্ডবহিতৈষী মহামন্ত্রী বিদুরের লোক ছিল? বিদুরের লোক বলেই কি তারা পান্ডবদের সম্বন্ধে সকল সংবাদ পেয়েও দুর্যোধনের কাছে তাহা গোপন রেখেছিল? প্রকৃত ঘটনা এমন হওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। চরদের এই নিদারুণ ব্যর্থতা কেবল এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। জতুগৃহ দাহের ঘটনায় আমরা গোপন সংবাদ আদান-প্রদান ও গুপ্তচর পরিচালনায় বিদুরের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি। মনে হয় তিনি পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের স্থান অবগত ছিলেন এবং তাঁদের রক্ষার জন্য নিজের বিশ্বস্ত লোকদের দুর্যোধনের গোয়েন্দা বিভাগে পূর্বেই অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান দুর্যোধন-বিরোধী বিদুরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। বিদুরের উপর এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের ন্যায় পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস নির্ণয়ে কোন মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন। অনুমান সত্য হলে (সত্য হওয়াই স্বাভাবিক) প্রতি সংবাদ (counter intelligence) পরিকল্পনার এমন নিখুঁত সম্পাদন আজকের আধুনিক যুগেও বিরল। পান্ডবদের রক্ষায় বিদুরের এই পরিকল্পনার পিছনে কৃষ্ণেরও হাত থাকা স্বাভাবিক।

কীচকের মৃত্যুসংবাদ অবশ্য চরগণ দুর্যোধনকে জানিয়ে ছিল, কিন্তু এই সংবাদের মধ্যে কোনই নুতনত্ব ছিল না। দ্রৌপদীর রটানো গুজবের ভিত্তিতেই তারা জানাল গন্ধর্বদের হাতে কীচকের মৃত্যু হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে তারা তখনও অন্ধকারে। কীচকের মৃত্যুসংবাদে দুর্যোধনের সন্দেহ হল ভীমই হয়তো এই মৃত্যুর জন্য দায়ী, কারণ কীচকের ন্যায় একজন মহাবীরের নিধন কেবল ভীমের ন্যায় মহাবীরের পক্ষেই সম্ভব। এই মৃত্যুর পিছনে গন্ধর্বদের হাত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করলেন না। আশ্চর্যের বিষয় প্রকৃত তথ্য নিরুপণে কোন চেষ্টাই হল না।

পান্ডবগণ বিরাটনগরের উদ্দেশে যাত্রার পূর্বে তাঁদের আশ্রিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকদের বিভিন্ন মিত্র রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুর্যোধনের চরগণ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কোন সংবাদ আনতে পারে নি। তাঁরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্তলোক। তাঁদের মুখ থেকে যে পান্ডবদের ক্ষতিকর কোন

সংবাদ বের হবে না তা সহজেই অনুমেয়। দুর্যোধনের অনুগত কোন ব্রাহ্মণ পান্ডবদের দলে অনুপ্রবিষ্ট করানো থাকলে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদই সংগ্রহ করা সম্ভব হত। কিন্তু দুর্যোধন সেরূপ কোন পদক্ষেপ নেন নি।

পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কোন সংবাদ না পেয়ে দুর্যোধন প্রথমে পুনরায় চর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে দ্রোণ ও ভীষ্মের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। দ্রোণ ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে পান্ডবদের বাসস্থান নির্ণয় করতে বললেন। তাঁর মতে কোন সাধারণ চরের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। তিনি সেই সঙ্গে দুর্যোধনকে উপদেশ দিলেন ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। ভীষ্ম জানালেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন অধার্মিক ও নীতিভ্রষ্ট রাজ্যে বাস করতে পারেন না। এ কথা মনে রেখে তাঁর অন্বেষণে লোক নিয়োগ করতে হবে। দুর্যোধন এ সব কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। চর নিয়োগের পূর্ব সিদ্ধান্ত, পরিবর্তন করে কীচকের মৃত্যুতে উৎসাহিত হয়ে দুর্যোধন ও সুশর্মারাজ মৎস রাজ্য আক্রমন করে শোচনীয়ভাবে পান্ডবদের হাতে পরাজয় বরণ করলেন। পান্ডবদের শক্তি ও তাঁদের বাসস্থান নির্ণয়ের ব্যর্থতার জন্যই তাঁদের এই বিপর্যয়।

নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে আমরা দেখেছি কেমনে দময়ন্তী নিজ বুদ্ধিবলে দক্ষ ব্রাহ্মণ চরদের নিযুক্ত করে তার নিরুদিষ্ট স্বামী নলরাজের সন্ধান করেছিলেন। একজন নারীর পক্ষে যা সম্ভব হল, দুর্যোধনের ন্যায় একজন মহাপরাক্রান্ত রাজার পক্ষে অমিত সম্পদ ও লোকবলের অধিকারী হয়েও একবৎসরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পান্ডবদের ন্যায় অতি বিশিষ্ট সর্বজন পরিচিত পাঁচজন রাজপুরুষ ও দ্রৌপদীর ন্যায় একজন অপূর্ব সুন্দরী রাজমহিষীর অজ্ঞাত বাসস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হল না। এর চেয়ে লজ্জাকর বিষয় আর কী হতে পারে? চরনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে পান্ডবদের অজ্ঞাত বাসস্থান নির্ণয় অবশ্যই সম্ভব হত। কিন্তু দুর্যোধন ও তাঁর উপদেষ্টাদের নির্বুদ্ধিতা ও শৈথিল্যের কারণে এ বিষয়ে কোন আন্তরিক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পদক্ষেপ গৃহিত হয় নি। উদ্যোগবিহীন কৌরবদের উদ্দেশ্য যে অসফল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

॥ দশ ॥

অজ্ঞাতবাসের অবসানে বিরাটরাজ সভামন্ডলে পান্ডবদের পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ, কৃষ্ণ ও ভ্রাতা বলদেব, যাদববীর সাত্যকি এবং পঞ্চপান্ডব উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার সূত্রপাত করে কৃষ্ণ বললেন, পান্ডবগণ কপট দ্যূতে ধার্তরাষ্ট্রগণের কাছে পরাজিত হয়ে তের বৎসর অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। তাঁরা এখন ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাঁদের হৃতরাজ ফেরত পাবার অধিকারী। কিন্তু দুর্যোধনের অভিপ্রায় সম্মন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। আমি প্রস্তাব করি পান্ডবদের জন্য রাজ্যার্দ্ধ দাবি করে কৌরব সভায় কোন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে সন্ধির জন্য প্রেরণ করা হোক।

বলদেব কৃষ্ণের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, কৌরবগণ অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের ধনসম্পত্তি অপহরণ করেছেন সত্য ; কিন্তু তাঁদের নিষ্প্রয়োজনে উত্তেজিত করা উচিত হবে না। ভুললে চলবে না, দ্যূতক্রীড়ায় সুনিপুণ না হয়েও ধর্মরাজ সুভানুধ্যায়ীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে প্রমত্ত হয়ে স্বেচ্ছায় ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির বিশেষ পারদর্শিতার কথা জেনেও তিনি তাঁরই সঙ্গে খেলতে বসলেনও খেলে হেরে গেলেন। এতে আমি শকুনির কোনই দোষ দেখছি না। আমার বিশ্বাস মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবেন না। সন্ধিদ্বারা প্রাপ্ত ধনসম্পত্তিই সর্বতোভাবে কাম্য। সংগ্রাম দ্বারা প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি অবাঞ্ছিত। যত শীঘ্র সম্ভব একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে গমন করুন।

বলদেবের উক্তির কঠোর সমালোচনা করে মহাবীর সাত্যকি বললেন, অক্ষবিশারদগণ দ্যূতানভিজ্ঞ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করে পরাজিত করেছে ; তা কীভাবে ধর্মসঙ্গত হতে পারে? যদি ধর্মরাজ নিজে ধার্তরাষ্ট্রদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করে পরাজিত হতেন, তবে সেই পরাজয় ধর্মানুগত হত। এখন প্রতিজ্ঞাপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মরাজ কেন দুরাত্মা ধার্তরাষ্ট্রদের নিকট অবনত হবেন? নিজের প্রাপ্য পৈত্রিক রাজ্য তাঁর বলপূর্বক অধিকার করা কর্তব্য। আমাদের বলবীর্যের অভাব নেই।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ বললেন, দুর্যোধন স্বেচ্ছায় কখনই ধর্মরাজকে তাঁর রাজ্য প্রত্যাবর্তন করবেন না। কোন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা দুর্যোধনকে বশীভূত করা যাবে না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভবী মনে হচ্ছে। আমাদের এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আপনারা কালবিলম্ব না করে সৈন্যসংগ্রহে যত্নবান হোন। মিত্র রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করুন। দুর্যোধনও বিভিন্ন রাজাদের নিকট দূতপ্রেরণ করবেন। প্রচলিত নিয়মমত যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন তিনিই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান। এ বিষয়ে আমাদের কোন সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমার সুচতুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত কৌরব সভায় গমন করতে পারেন আমাদের দাবি নিয়ে।

কৃষ্ণ বললেন, দ্রুপদরাজের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই। আমাদের তাঁর উপদেশমতই কাজ করতে হবে। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যাদবদের সমান সম্পর্ক। কৌরবগণ আমাদের সঙ্গে কখনই অশিষ্ট আচরণ করেন নি। দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলে যুদ্ধজনিত কুলক্ষয় থেকে আমরা রক্ষা পাব। সেইমত দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে অগ্রে বিভিন্ন রাজ্যে সাহায্যের জন্য দূত প্রেরণ করে পরে আমাদের আহ্বান করবেন।

কৃষ্ণ দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলে যুধিষ্ঠির বিভিন্ন রাজ্যে সাহায্যে প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করলেন। অচিরেই বহু রাজন্যবর্গ সৈন্যদল নিয়ে বিরাটনগরে উপস্থিত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে কৌরবগণও তৎপর হলেন সৈন্য সংগ্রহে। তাঁদের আহ্বানে বহু নৃপতি সসৈন্য হস্তিনাপুরে সমবেত হতে লাগলেন। এদিকে জ্ঞানবৃদ্ধ দ্রুপদ পুরোহিত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে সশিষ্যে হস্তিনাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যাত্রার পূর্বে দ্রুপদরাজ নিজ পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনি কুরু ও পান্ডবদের বর্তমান সম্পর্কের বিষয় সবই জানেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে তাঁর পুত্রগণ সরলমতি যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য সম্পদ অধিকার করে নিয়েছে। আপনি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে ধর্মবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করে তাঁর যোদ্ধবর্গের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। আমার বিশ্বাস পান্ডবহিতৈষী বিদুর আপনার কথা শ্রবণ-করে ভীষ্মাদি নেতৃস্থানীয় সভাসদদের মধ্যে কৌরব বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে তৎপর হবেন। যাদের উপর নির্ভর করে দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হলে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকলের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টির চেষ্টায় রত হবেন। এতে কৌরবদের অযথা বহু সময় নষ্ট হবে। এই সুযোগে পান্ডবগণ সৈন্যদল সংগ্রহ ও যুদ্ধবিষয়ক অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারবেন। শত্রুপক্ষের সেনানীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ব্যাপারে আপনি বুদ্ধিসহকারে ইন্ধন জুগিয়ে যাবেন। পান্ডবদের দুঃখদুর্দশার কথা নিপুণভাবে বর্ণনা করবেন ও বৃদ্ধদের নিকট কুলধর্মের বিষয় উল্লেখ করবেন। এতে পান্ডবদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়ে কৌরবদের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি পাবে। আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও দ্যূতকর্মে নিযুক্ত। আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় উপস্থিত হলেন কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনায়। দুর্যোধনের গুপ্তচর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। তাদের মারফত তিনি পান্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সকল সংবাদসই পাচ্ছিলেন। অর্জুনের দ্বারকায় আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনিও দ্রুতগামী যানে দ্বারকায় এসে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণের সাহায্য কামনায়। দুর্যোধন ও অর্জুন একই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। দুর্যোধন প্রথমে কক্ষে প্রবেশ করে কৃষ্ণের মস্তকদিকে রাখা আসনে উপবেশন করলেন। পশ্চাৎ অর্জুন প্রবেশ করে কৃষ্ণের পায়ের দিকে আসীন হলেন। কিছুক্ষণ বাদে কৃষ্ণ জাগরিত হয়ে প্রথমে অর্জুন ও পরে দুর্যোধনকে দেখতে পেয়ে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। দুর্যোধন বললেন, হে যাদব, এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। আমি অগ্রে আগমন করেছি ; প্রথাগত আমিই আপনার সাহায্য পাবার অধিকারী। কৃষ্ণ বললেন, হে কুরুবীর, আপনি প্রথমে আগমন করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কুন্তীনন্দন অর্জুনকেই প্রথমে নয়নগোচর করেছি। এজন্য আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করব। একপক্ষ আমার নারায়ণী সেনা এবং অন্য পক্ষ কেবল আমাকে গ্রহণ করুন। আমি যুদ্ধে নিরপেক্ষ ও নিরস্ত্র থাকব। অর্জুন সমর নিরপেক্ষ কৃষ্ণকেই বরণ করলেন আর দুর্যোধন কৃষ্ণের নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হয়ে হৃষ্টমনে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

অতঃপর দুর্যোধন বলদেবের কাছে উপস্থিত হয়ে আসন্ন যুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে বলদেব বললেন, আমি কৃষ্ণের অনুরোধে স্থির করেছি— কি পান্ডব কি

কৌরব—কাউকেও সাহায্য করব না। বলদেবের নিকট বিদায় নিয়ে দুর্যোধন ভোজবংশীয় যাদব বীর কৃতবর্মার নিকট উপস্থিত হলেন। কৃতবর্মা তাঁর এক অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দিতে সম্মত হলেন। তাঁর দৈত্য সাফল্য মন্ডিত হয়েছে মনে করে দুর্যোধন প্রফুল্লচিত্তে রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পার্থ, আমাকে সমরে পরাঙ্মুক জেনেও কিসের জন্য আমাকে বরণ করলে? অর্জুন উত্তরে বললেন, ভগবন্, আপনি একাই সমগ্র ধার্তরাষ্ট্রদিগের সংহার করতে সমর্থ এবং আপনার কীর্তিও ত্রিলোকবিখ্যাত। কিন্তু আমার বাসনা আমি একাই তাঁদের ধ্বংস করে জগতে যশোলাভ করব। এজন্যই সমরপরাঙ্মুখ জেনেও আপনাকে বরণ করেছি। আমার অনুরোধ আপনি আমার সারথ্যপদ গ্রহণ করে আমার বহু আকাঙ্খিত মনোবাসনা পূর্ণ করুন। কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, অর্জুন, আমি জানি বলবীর্যে তুমি আমার সঙ্গে স্পর্দ্ধা করার ক্ষমতা রাখ। তোমার সারথ্যপদ গ্রহণ করে আমি তোমার মনোকামনা পূর্ণ করব। আলোচনা শেষে অর্জুন বিরাটনগরে ফিরে এলেন।

মদ্ররাজ মহাবীর শল্য কুরু-পান্ডবদের যুদ্ধ সম্ভাবনার সংবাদ শ্রবণ করে বিপুল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে পান্ডবদের পক্ষে যোগ দিতে বিরাট নগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মদ্ররাজ ছিলেন পান্ডুর দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রীর ভ্রাতা ও নকুল সহদেবের মাতুল এবং সেইহেতু সকল পান্ডবদেরই মাতুল। স্বভাবতই তাঁর সহানুভূতি ছিল পান্ডবদের প্রতি। ভারতে তখন মদ্ররাজের সমতুল্য বীর ছিল না বললেই চলে। তাঁর সৈন্যদল সুশিক্ষিত ও অপরিমেয়। তিনি যে পক্ষে যোগ দেবেন সেই পক্ষের শক্তি যে বহু পরিমানে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ একজন মহাশক্তিধর রাজার সাহায্য লাভ করতে দুর্যোধন যে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তিনি চরমুখে মদ্ররাজের সসৈন্য বিরাটনগরের উদ্দেশে যাত্রার সংবাদ পেয়ে পথিমধ্যে মনোরম অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ করে নানাপ্রকার সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে মদ্ররাজের আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু দুর্যোধন প্রথমে মদ্ররাজ সমীপে উপস্থিত হলো না। মদ্ররাজ মনে করলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁদের এই অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছে। অভ্যর্থনা স্থলে অমরাবতীর ন্যায় এক সভায় বহু অলৌকিক বিবরণ সমূহ দর্শন করে পরম সন্তোষ লাভ করলেন। তিনি শিল্পীদের পারিতোষিক দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে পরিচারকগণ দুর্যোধনকে সংবাদ দিল। দুর্যোধন প্রচ্ছন্নবেশে মদ্ররাজ সমীপে উপস্থিত হলে মদ্ররাজ তাঁকে একজন বাস্তুকার মনে করে কোন কিছু প্রার্থনা করতে বললেন, তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের স্বীকৃতি হিসাবে। তখন দুর্যোধন আত্মপ্রকাশ করে বললেন, মাতুল, আপনার বাক্য মিথ্যা হবে না। আপনাকে আমার সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে হবে। আপনি আমাকে এই একমাত্র অভীষ্ট বর প্রদান করুন।

মদ্ররাজ স্বীকৃত হলেন এবং বললেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা

প্রয়োজন। আমি এখন বিরাটনগরে যাচ্ছি। সেখান থেকে সত্বরেই প্রত্যাবর্তন করব এই বলে তিনি দুর্যোধনের নিকট বিদায় নিয়ে বিরাট নগরের পথে রওনা হলেন

বিরাটনগরে পৌঁছে মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আপনি সৌভাগ্যক্রমে বার বৎসর বনবাসে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করে ভ্রাতাগণ ও ভার্য্যা দ্রৌপদীর সঙ্গে এখন মুক্ত হয়েছেন। আপনি শত্রুদের সংহার করে পুনরায় রাজ্যসুখ ভোগ করুন।

এই বলে মদ্ররাজ পথিমধ্যে দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও তাঁকে বরদানের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। সব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, মাতুল, আপনি দুর্যোধনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সঙ্গত কাজই করেছেন। কিন্তু আমার মুখ চেয়ে আপনাকে একটি অকার্য সাধন করতে হবে। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবের সমকক্ষ। আপনার পক্ষে কোন কার্যই অসম্ভব নয়। আমার একান্ত অনুরোধ কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধের সময় আপনি কর্ণের সারথ্যপদ স্বীকার করে আমাদের হিতের জন্য অর্জুনকে রক্ষা ও কর্ণের তেজনাশ করবেন। অন্যায় হলেও আপনাকে আমাদের মঙ্গলের জন্য এই কাজটি সম্পাদন করতে হবে। মদ্ররাজ স্বীকৃত হয়ে বললেন, হে যুধিষ্ঠির! আমি অঙ্গীকার করছি কর্ণের সারথ্যপদ গ্রহণ করে আমি তাঁকে অহিত ও প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করে তাঁর দর্প ও তেজ খর্ব করব। তখন আপনারা তাঁকে অনায়াসে সংহার করতে সমর্থ হবেন। আমা হতে আপনাদের সকল প্রিয় কার্যই সম্পাদিত হবে।

মদ্ররাজের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হলেন।

দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে আসন্ন যুদ্ধে বাহুরাজন্যবর্গ তাঁদের সৈন্যদল নিয়ে উভয় পক্ষে যোগ দিলেন। শেষপর্যন্ত কৌরব ও পান্ডবপক্ষের সৈন্যদলের সংখ্যা দাঁড়াল যথাক্রমে একাদশ অক্ষৌহিনী ও সপ্ত অক্ষৌহিনী। দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনী সমবেত হল রাজধানী হস্তিনাপুরে আর যুধিষ্ঠিরের মৎসরাজের রাজধানী বিরাটনগরে। দুই পক্ষেরই যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। গুরুজন, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, আত্মীয়, মিত্র প্রভৃতি অসংখ্য আপনজন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একে অন্যের প্রাণ-সংহারের সংকল্প নিয়ে যুদ্ধারম্ভের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনাপুর পৌঁছিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁকে যথাযথ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করলেন। পরে তিনি রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সেনানীদের সম্বোধন করে বললেন, হে কৌরবগণ, ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু একই পিতার সন্তান। পৈত্রিক ধনে এঁদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ পান্ডুপুত্রদের বঞ্চনা করে সেইধন উপভোগ করছে। এটা কি ধর্মানুগত? আপনারা অবগত আছেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে পান্ডুপুত্রদের নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর পুত্রগণ তাঁদের প্রাণনাশের চেষ্টাও করেছিল। ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে শকুনি কপটদ্যূতে পান্ডবদের পরাজিত করে তাঁর পুত্রদেব জন্য তাঁদের রাজ্যসম্পদ অধিকার করে নিয়েছে। প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রুপদনন্দিনী

নিগৃহীত হয়েছেন। বনবাসে ও বিরাটনগরে অজ্ঞাত বাসের সময় পান্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দিনী যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তা আপনাদের অবিদিত নেই। তথাপি পান্ডবগণ সমস্ত কিছু ভুলে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করতে আগ্রহী। কোন দুর্বলতাবশত তাঁরা সন্ধির প্রস্তাব দেন নি। পান্ডবগণ অশেষ বলবীর্যের অধিকারী। যুদ্ধে তাঁরা পরাঙ্মুখ নন। তাঁরা কেবল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের ন্যায্য রাজ্যাংশ লাভ করতে অভিলাষী। আপনারা ধর্ম ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে পান্ডবদের রাজ্য সম্পদ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করুন। এখনও সময় আছে।

পিতামহ ভীষ্ম দ্রুপদ পুরোহিতের সন্ধিপ্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনার কথার উচিত্য বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যক্রমে সহায়সম্পন্ন হয়েও পান্ডবগণ-ধর্মানুগ রয়েছেন। সেজন্য তাঁরা যুদ্ধের পথ পরিহার করে সন্ধি প্রার্থনা করেছেন। পান্ডবগণ এখন ধর্মানুসারে পৈত্রিক ধনের অধিকারী হয়েছেন সন্দেহ নেই। অলৌকিক বলশালী অর্জুনকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও পরাস্ত করতে পারবেন না।

মহাবীর কর্ণ ভীষ্মের বাক্যের প্রতিবাদ করে দ্রুপদ পুরোহিতকে বললেন, যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করে পরাজিত হয়েছেন। প্রতিজ্ঞানুসারেই তিনি বনবাসে গমন করেছেন। তিনি এখন মুর্খের ন্যায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অন্যান্যদের সহযোগিতায় পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করতে চাইছেন। যদি পান্ডবগণ পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরে পেতেই চান তবে তাঁদের পুনরায় অরণ্যবাসে গমন করে প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। তাঁরা যেন অবিজ্ঞের ন্যায় কোন অধার্মিকী যুদ্ধে অবতীর্ণ না হন।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ণকে তিরস্কার করে বললেন, শান্তনু-নন্দন ভীষ্মের অভিমত সব দিক থেকেই যুক্তিসঙ্গত। সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হলে কুরুপান্ডব সহ সমস্ত বিশ্ব উপকৃত হবে। আমি অদ্যই সারথি সঞ্জয়কে প্রেরণ করছি যুধিষ্ঠিরের নিকট সন্ধি-প্রস্তাব আলোচনা করতে।

অতঃপর দ্রুপদ-পুরোহিতকে বিদায় দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সভায় আহ্বান করে বললেন—হে সঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে বিরাটনগরে পান্ডবদের নিকট গমন কর। পান্ডবরা সত্যাশ্রয়ী। তাঁরা বনবাসকালে ও অজ্ঞাত বাসের সময় অশেষ দুঃখভ্রষ্ট ভোগ করেও আমাদের প্রতি কিছুমাত্র বিরূপ হননি। হঠকারিতা বশতঃ দুর্যোধন পান্ডবদের ধনসম্পত্তি অপহরণ করা সহজসাধ্য মনে করেছে। পান্ডবগণ এখন মহাশক্তিশালী। অর্জুন দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত। কৃষ্ণ সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয়। সেই কৃষ্ণ এখন অর্জুনের সারথী। ভীমসেন গদাযুদ্ধ বিশারদ। তাঁর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হলে ধার্তরাষ্ট্রগণ ভস্মীভূত হবেন সন্দেহ নেই। মাদ্রী তনয়যুগল নকুল ও সহদেবেরও বলবীর্য কম নয়। তাছাড়া পান্ডবপক্ষে আছেন মৎসরাজ বিরাট, মহাবীর সাত্যকি ও অন্যান্য মহারথীগণ। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরপুরুষেরা আমাদের সহায়তা করলেও আমার মনে হয় তুলনামূলকভাবে পান্ডবপক্ষই অধিক শক্তিশালী। সঞ্জয়, ক্রোধোদীপ্ত যুধিষ্ঠিরকে আমার সব চেয়ে ভয়। যুধিষ্ঠির মহাতপা ও ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন। তাঁর সঙ্কল্প সব সময় সিদ্ধ হয়ে থাকে। তাঁর

ক্রোধ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করে আমি অতিশয় ভীত হয়েছি। তুমি মধুর বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে। কৃষ্ণকে বিনয় সহকারে বলবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্বদাই পান্ডবদের সহিত শান্তিস্থাপনে আগ্রহী। সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে সঞ্জয় যথা সময়ে বিরাট নগরে উপনীত হলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় পান্ডব সভায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্ধিপ্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বললেন, কৌরব অধিপতি আপনাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। হে পান্ডবগণ! আপনারা সর্বগুণসম্পন্ন ও হিংসাদ্বেষরহিত। আপনাদের পক্ষে কোন হীন কর্মের অনুষ্ঠান করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নয়। সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হলে আপনারা অযশের ভাগী হবেন। কৌরবগণ ধ্বংস হলেও যুদ্ধ-জনিত জ্ঞাতিবধের কারণে আপনাদের জীবন নিশ্চল হবে। কুরু পান্ডব উভয় পক্ষই সমান বলশালী। জয় পরাজয় অনিশ্চিত। জয়পরাজয়ে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হবে না। আমি সন্ধি প্রার্থনা করে বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতির শরণাপন্ন হলাম।

যুধিষ্ঠির বললেন, বিনা যুদ্ধে অল্পমাত্র লাভ হলেও তাহা শ্রেয়স্কর, সংঘর্ষের পথে যেতে আমাদের কোন বাসনা নেই। কিন্তু সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র আমাদের অতুল সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন। পূর্বে আমাদের সঙ্গে সকল যুদ্ধেই কৌরবপক্ষ পরাজিত হয়েছেন। বস্তুত ভীমসেন, অর্জুন ও মাদ্রীতনয়দ্বয় জীবিত থাকতে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাদের রাজ্য হরণ করতে পারবেন না। কৌরবদের হাতে আমরা যে ভাবে নিগৃহীত হয়েছি তা তোমার অবিদিত নেই। তা সত্ত্বেও আমি কথা দিচ্ছি, দুর্যোধন আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যর্পণ করলে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি।

সঞ্জয় পুনরায় বললেন, কৌরবগণ বিনাযুদ্ধে আপনাকে রাজ্য প্রদান করবেন না। কিন্তু আমার মনে হয় যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ-করাও শ্রেয়কর। আপনি পূর্বেই বাসুদেব ও অর্জুনের সহায়তায় কৌরবদের বিনষ্ট করতে পারতেন। কিন্ত তা না করে বহু বৎসর বনবাসে থেকে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে এবং নিজ সহায়কদের বলহ্রাস করে কেন আপনি রাজ্য লাভের উদ্দেশ্যে এই অনুপযুক্ত সময়ে সমরে অবতীর্ণ হবেন? আমার মতে ক্রোধ অপেক্ষা ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ। আর দেখুন, সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েও আপনি জরা মৃত্যু সুখ দুঃখ কোন কিছুই অতিক্রম করতে পারবেন না। অতএব যুদ্ধাভিলাস পরিত্যাগ করুন। আপনি জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হবেন না। আপনার ন্যায় ধার্মিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সজ্জনানুগত পথ অনুসরণ করাই উচিৎ কার্য হবে।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, হে সঞ্জয়, যারা আপদকাল উত্তীর্ণ হয়ে আপন ধর্মনির্দিষ্ট কর্মকান্ডে নিযুক্ত হয় তারাই প্রশংসনীয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করেছেন আমি সেই পথই গ্রহণ করব। ইহা ধর্মসঙ্গত। আমি অধর্মের পথে স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকও লাভ করতে বাসনা করিনা। মহাত্মা কৃষ্ণ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন। তিনি কৌরব

ও পান্ডব—উভয় কুলেরই হিতৈষী। তিনিই বলুন বর্তমান অবস্থায় সন্ধি বা যুদ্ধ কোন পথ আমাদের অবলম্বন করা কর্তব্য?

কৃষ্ণ তখন সঞ্জয়কে বললেন! হে সঞ্জয়, কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হয় এটা আমার একান্ত অভিপ্রেত। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সন্ধির পক্ষপাতী। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ অতিশয় লোভী। তাঁদের সহিত সন্ধি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজোচিত সমস্তগুণেই অলঙ্কৃত। তিনি কখনই অধর্মের আশ্রয় নেন নি। ন্যায়ত তিনিই রাজ্যের অধিকারী, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ তস্করের ন্যায় পান্ডবদের পৈত্রিক রাজ্য অপহরণ করেছেন। এ কাজ কি ধর্মসঙ্গত? আশ্চর্যের বিষয় এই কাজকেই কৌরবগণ ধর্মসঙ্গত বলে মনে করছেন। পান্ডবদের ন্যাস্ত সম্পত্তি কি নিমিত্ত অন্যেরা ভোগ করবেন? নিজ অধিকার রক্ষায় যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও শ্রেয়। পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধারে পান্ডবদের বিমুখ হওয়া উচিত হবে না। হে সঞ্জয়, তুমি এখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করতে অভিলাষী হয়েছ। কোথায় ছিল তোমার ধর্ম যখন দ্রৌপদী প্রকাশ্য রাজ সভায় নিগৃহীত হলেন? তখন তো তুমি দুঃশাসনকে কোন উপদেশ দেও নি। আমি স্থির করেছি নিজেই হস্তিনাপুরে গমন করে পান্ডবদের কোন ক্ষতি না করে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করব। আমার ন্যায়-সঙ্গত উপদেশ অগ্রাহ্য করলে পাপাত্মা ধার্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধে অর্জুন ও ভীমসেনের হস্তে নিহত হবে সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণের কথায় সঞ্জয় বুঝলেন তাঁর দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে। তখন তিনি বিরাটনগর হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায়কালে যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন, হে সঞ্জয়, তুমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলবে এক্ষণে পান্ডবদের উপেক্ষা করা উচিত হবে না। তুমি আরও বলবে সমুদয় ব্রহ্মান্ড একজনের অধিকৃত হতে পারে না। আমরা সকলে সামঞ্জস্য সহকারে বাস করতে ইচ্ছুক। পিতামহ ভীষ্মকে বলবে আপনি ধ্বংসোন্মুখ কুরুবংশ উদ্ধার করুন। আপনার পুত্রগণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আগ্রহী। মহামন্ত্রী বিদুরকে বলবে আপনি যেভাবেই হোক এই যুদ্ধ বন্ধ করুন। পরে দুর্যোধনকে বলবে আমরা তাঁর সমস্ত অপরাধই ক্ষমা করেছি। আমরা কেবল পাঁচটি গ্রাম পেলেই সন্তুষ্ট হব। কৌরবদের কোন ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না। আমরা সন্ধি ও যুদ্ধ উভয় কার্যেই সম্মত আছি।

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য কৌরব প্রধানদের তাঁর দৈত্যের ফলাফল বিবৃত করলেন। তিনি বললেন, যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যসম্পদ প্রত্যর্পণ না করলে গান্ডীবধারী অর্জুন কৃষ্ণের সারথ্যে ভ্রাতা ও অন্যান্য মহারথীদের সঙ্গে কৌররদের বিনষ্ট করতে কৃতসঙ্কল্প। পান্ডবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাঁদের মনোবল অতি উচ্চ। এমন কি রথাশ্ব হস্তী প্রভৃতিও যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত হয়ে গাত্র আন্দোলিত করছে। আশ্চর্যের বিষয় শরসমূহও শত্রুকে আঘাত করতে আকাশে উড্ডীন হতে চেষ্টা করছে।

পিতামহ ভীষ্ম নরনারায়ণ—উপাখ্যান বর্ণনা করে বললেন, আদি অবতার নর ও নারায়ণ—এখন মহারথ অর্জুন ও ভগবান বাসুদেবরূপে মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। ইন্দ্রাদ্রি দেবগণ, অসুরগণ ও মানবগণ এঁদের পরাভূত করতে অসমর্থ। পান্ডবদের রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

কর্ণ ভীষ্মের কথার প্রতিবাদ করে বললেন, আমি সংগ্রামে সমুদয় পান্ডবদের সংহার করব। তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ সন্ধি করার প্রয়োজন নেই।

ভীষ্ম ঘোষ পল্লী ও পরে বিরাটনগরের যুদ্ধে কর্ণের পলায়নের কথা উল্লেখ করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, আত্মশ্লাঘাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্বদা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। পান্ডবদের তুলনায় কর্ণের ক্ষমতা যোড়শভাগের এক ভাগও নয়।

অস্ত্রগুরু দ্রোণচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, অর্জুনের সমকক্ষ ধনুর্ধর আর কেউ নেই। মহামতি ভীষ্মের উপদেশমত পান্ডবদের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা করুন।

ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্যে বিশেষ কোন গুরুত্ব না দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট পান্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিবরণ জানতে চাইলেন। সঞ্জয় ভীমসেন, অর্জুন ও অন্যান্য পান্ডবপক্ষীয় বীরদের যুদ্ধনৈপুণ্য বর্ণনা করে বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শত শত ভূপতিকে আশ্রয় করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

পান্ডবপক্ষের শক্তির পরিচয় পেয়ে যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত মনে করে ধৃতরাষ্ট্র ভয়ে পুত্রদের পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে উপদেশ দিলেন। দুর্যোধন পিতাকে শান্ত্বনা দিয়ে কৌরবপক্ষীয় রাজাদের বলবীর্যের বর্ণনা দিয়ে বললেন, আমরা একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করেছি। অন্যদিকে পান্ডবদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র সাত অক্ষৌহিনী। তদুপতি আমাদের সৈন্যদল উচ্চতর শিক্ষণপ্রাপ্ত।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় অর্জুনের রথধ্বজ, পান্ডবপক্ষীয় বীরগণের পরিচয় এবং তাঁদের মধ্যে কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন প্রভৃতি পান্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আরও বিবরণ প্রদান করলেন। তিনি জানালেন দ্রুপদ পুত্র মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্বদা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উত্তেজিত করছেন।

সঞ্জয়মুখে পান্ডবদের বলবীর্য ও তাঁদের বিপুল যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, মহামন্ত্রী বিদুর, সঞ্জয় ও মাতা গান্ধারী প্রভৃতি গুরুজনগণ পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের পক্ষে বারবার মত প্রকাশ করলেন। বিদুর রাজধর্ম, সুরক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু দুর্যোধন ও কর্ণ তাঁদের পূর্বমতে অটল রইলেন। দুর্যোধন ঘোষণা করলেন পাঁচটি গ্রাম তো দূরের কথা তিনি পান্ডবদের সূচ্যাগ্র ভূমিও প্রদান করবেন না। কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

এদিকে বিরাট রাজ সভায় পান্ডবগণ পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনায় বসলেন। আলোচনার সূত্রপাত করে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, হে কৃষ্ণ! সঞ্জয়ের কথায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হল ধার্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধ বিনা আমাদের রাজ্য প্রত্যার্পণ করবেন না। যুদ্ধে কুলক্ষয়

অবশ্যম্ভাবী। আবার রাজ্য পরিত্যাগ করে শান্তিলাভ মৃত্যুরই সমতুল্য। এমতাবস্থায় নিজ নিজ রাজ্যাংশ প্রাপ্ত হলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমরা প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদের রাজ্যলাভ করতে চেষ্টা করব। অকৃতকার্য হলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে। হে জনার্দন, তুমি আমার প্রিয় ও হিতৈষী এবং সর্বজ্ঞ। তুমিই পার এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে আমাদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক পন্থা নির্দেশ করতে।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে ধর্মরাজ! আমি স্থির করেছি আপনাদের উভয় পক্ষের হিতকামনায় শান্তি স্থাপনের জন্য স্বয়ং কৌরব সভায় গমন করব। শান্তি স্থাপিত হলে আপনারা উভয় পক্ষই মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হবেন। আর আমারও অশেষ পূণ্যলাভ হবে।

কৌরব সভায় কৃষ্ণের অনিষ্ট সম্ভাবনায় যুধিষ্টির প্রথমে কৃষ্ণের শান্তিপ্রস্তাব সমর্থন করলেন না। কৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে বললেন, কৌরবগণ আমার কোন ক্ষতি করতে উদ্যত হলে আমি তাঁদের একাই বিনষ্ট করব। আপনার আশঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কৃষ্ণের বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি স্বচ্ছন্দে কৌরব সভায় গমন কর। তোমার দৌত্য সাফল্যমন্ডিত হোক, তুমি নির্বিঘ্নে আমাদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন কর এই প্রার্থনা করি। আমাদের যাতে হিত হয় সেইমত দুর্যোধনকে উপদেশ দেবে। এতে যদি সন্ধিস্থাপন হয় উত্তম, নয়তো আমরা যুদ্ধের পথই বেছে নেব।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, আমি সঞ্জয়ের বাক্য শুনেছি ; আপনাদের অভিপ্রায়ও অবগত আছি। আপনি ধর্মানুগত। বিনা যুদ্ধে যৎকিঞ্চিত লাভও আপনার নিকট অধিক মূল্যবান। কিন্তু আপনি ক্ষাত্রধর্ম বিস্মিত হবেন না। কোনরূপ দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিন্দনীয়। সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণত্যাগ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য বলে বিধাতা নির্দিষ্ট করেছেন। আপনি বিক্রম প্রকাশ করে শত্রুকে সংহার করুন। ধার্তরাষ্ট্রগণ অতি লুব্ধ। তাঁরা যুদ্ধের জন্য বিপুল সৈন্যদল সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের পক্ষে আছে বহু রাজন্যবর্গ। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহারথীগণ স্বপক্ষে থাকায় ধার্তরাষ্ট্রগণ আপন বলবীর্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এমতাবস্থায় তাঁরা যে আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করবে তা মনে হয় না। আপনি মৃদুভাব অবলম্বন করলে তাঁরা আপনার রাজ্য প্রদান করবে না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছে। হে মহারাজ, আমি লোকক্ষয়ের ইঙ্গিত বহনকারী নানা দুর্লক্ষণ চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। আপনি কাল বিলম্ব না করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে ভীমসেন কৃষ্ণকে বললেন, হে মধুসূদন, কৌরব সভায় উভয় পক্ষের যাতে মঙ্গল হয় সেই চেষ্টাই করবে। যুদ্ধের কথা বলে ধার্তরাষ্ট্রগণকে অযথা উত্তেজিত করবে না। মৃদু বাক্য দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্ট বিধানের চেষ্টা করবে। যুদ্ধে ভরতবংশ ধ্বংস হয় তা কিছুতেই কাম্য নয়। বরং আমরা দুর্যোধনের অধীনতা স্বীকার করব সেও শ্রেয়কর। ধর্মরাজ ও অর্জুনেরও যুদ্ধে অভিলাষ নেই।

যুদ্ধে ভীমসেনের অনীহা প্রকাশে তাঁকে উত্তেজিত করতে কৃষ্ণ বললেন, হে

ভীমসেন, আপনি সব সময় কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করে এসেছেন। এখন আপনি শান্তির কথা বলছেন। মনে হয় যুদ্ধ নিকটবর্তী জেনে আপনার মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। আপনার বাক্যে পান্ডবগণ নিরুৎসাহ বোধ করছেন। ক্ষত্রিয়কুলে আপনার জন্ম। যুদ্ধে ভীত হওয়া আপনার পক্ষে শোভা পায় না। মনের দুর্বলতা পরিহার করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। তেজপ্রভাবে লব্ধবস্তুই ক্ষত্রিয়ের কাম্য।

ভীমসেন উত্তরে বললেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমার বাক্য অনুধাবন না করেই আমার প্রতি কটুক্তি করলে। পূর্বে তুমি আমার বলবীর্যের বহু প্রমান পেয়েছ। আমার লৌহময় বাহুদ্বয়ের আবেষ্টনী হতে কেউই রক্ষা পাবে না। আমি যুদ্ধে ভীত নহি। আমি কেবল সৌহার্দনিবন্ধন কৌরবদের সঙ্গে শান্তিস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছি।

কৃষ্ণ ভীমসেনকে অভিনন্দিত করে বললেন, হে ভীমসেন! আমি আপনার অভিপ্রায় জানতেই প্রণয়পূর্বক এই সকল বাক্য প্রয়োগ করেছি। আপনার মহত্ত্ব, বল ও ধর্ম আমার অজানা নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। তথাপি শত্রুর সঙ্গে নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার করা অকর্তব্য। আমি কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে সম্মানজনক সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করব। আমার দৌত্য ব্যর্থ হলে তুমুল সংগ্রাম শুরু হবে। আপনি ও অর্জুন এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

অর্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, হে কৃষ্ণ, তোমার সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা অনুচিত নয়। তবে দুরাত্মা দুর্যোধন সন্ধিস্থাপনে সম্মত হবে বলে মনে হয় না। আমাদের যাতে হিত হয় তুমি সেইভাবে কার্য কর।

পরিশেষে কৃষ্ণ বললেন, উভয় পক্ষের হিতকর কার্য করাই আমার কর্তব্য। সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়ই আমার করায়াত্ত। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে শ্রবণ করুন। ক্ষেত্রে হলচালন ও বীজ বপন করলেও জল ব্যতীত শস্য উৎপাদনের আশা নেই। আবার দৈব প্রভাবে এই জল শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। প্রাচীন মহাত্মাগণ সেজন্য বলেছেন দৈব ও পুরুষাকার একত্র মিলিত না হলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই। আমি যথাসাধ্য পুরুষাকার প্রদর্শন করতে পারি। কিন্তু দৈবের উপর আমার কোন হাত নেই। কৌরব সভায় বাক্য ও কর্মদ্বারা সাধ্যানুসারে আমি সন্ধির জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু সাফল্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। গোহরণকালে মহাত্মা ভীষ্ম দুর্যোধনকে পান্ডবদের সঙ্গে তাঁদের রাজ্য প্রাত্যর্পণ করে সন্ধি করতে বলেছিলেন ; কিন্তু দুর্যোধন সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। মনে হয় সে অল্পমাত্র রাজ্যও হস্তান্তর করবে না।

নকুল কৃষ্ণকে বললেন, হে মাধব! কৌরব সভায় আপনি প্রথমে শান্ত্রবাক্য প্রয়োগ করবেন। এতে কার্যোদ্ধার না হলে তখনই কঠোর বাক্যের আশ্রয় নেবেন। এমন বাক্য ব্যবহার করবেন না যাতে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। আমার বিশ্বাস আমাদের বলবীর্যের কথা শ্রবণ করলে ধার্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ করবেন। ভীষ্মাদি গুরুজনগণও আপনার বাক্যের যথার্থ বিবেচনা করে কৌরবদের সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণে সম্মত কবাবেন। মনে হচ্ছে আপনার শান্তি দৌত্যে ধর্মরাজের সকল অভিলাষই পূর্ণ

হবে।

সহদেব কৃষ্ণকে বললেন, হে মধুসূদন! আমার মতে কৌরবপক্ষ সন্ধিপ্রস্তাবে রাজী হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। কৌরব সভায় দ্রৌপদীর অপমানজনিত ক্রোধ আমরা যুদ্ধ না করে কীভাবে সংবরণ করব? আমি ধর্ম ত্যাগ করেও দুর্যোধনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে আগ্রহী।

মহাবীর সাত্যকি সহদেবের বাক্য সমর্থন করে বললেন, দুর্যোধনকে বধ করলেই আমার ক্রোধের উপশম হবে।

দ্রৌপদী বললেন, কৌরবদের প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করা উচিত হবে না। অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলেও সেই পাপ হয়। হে মধুসুদন, তুমি দেখবে পান্ডবগণ যেন এই পাপে লিপ্ত না হন। কি আশ্চর্য! দুরাত্মা দুর্যোধন এখনও জীবিত আছে! ধিক অর্জুনের শরাসন ও ভীমসেনের বল। ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধির জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমার বৃদ্ধ পিতা, আমার ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহায়তায় শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন। দুঃশাসনের ছিন্ন দেহ দর্শন না করে আমি শান্তি পাব না। ভীমসেনের মুখে শান্তির কথা শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

এই কথা বলে দ্রৌপদী অঝোরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে কৃষ্ণে, তুমি আজ যেমন রোদন করছ, কুরু মহিলাগণও তাঁদের জ্ঞাতিবর্গ নিহত হলে সেইরূপ রোদন করবে। আমি কথা দিচ্ছি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশমত ভীমার্জুন, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে কৌরবদের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হব। আমার বাক্য অমান্য করলে ধার্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধে নিহত হয়ে শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হবে। আমার এই বাক্য কদাচ মিথ্যা হবে না। তুমি শান্ত হও। শত্রু নিধনের পর তোমার পতিগণকে রাজ্যসম্পদ অধিকার করতে দেখবে।

সিদ্ধান্তমত কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি আয়ুধে সজ্জিত হয়ে পান্ডবদের নিকট বিদায় নিয়ে সারথী দারুক পরিচালিত রথে বায়ুবেগে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন। মহাবীর সাত্যকির নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সতর্কতা হিসাবে কৃষ্ণের অনুগামী হল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে কয়েকজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিকে দর্শন করে তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত ধর্মার্থযুক্ত বাণী শ্রবণের অভিলাষে তাঁরাও হস্তিনাপুর রাজসভায় গমন করছেন। ঋষিদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে কৃষ্ণ পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলেন। পথিমধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপস্থিত হল। কিন্তু এই সকল উপদ্রব কৃষ্ণকে স্পর্শ করল না ; তাঁর যাত্রাপথ সুশীতল বায়ু ও পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা সুগম রইল। ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণস্তবে চারিদিক হল মুখরিত। সূর্যদেব অস্ত গেলে কৃষ্ণ উপপন্ন নামক পথসংলগ্ন এক নগরে রাত্রি বাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। নগরবাসীগণ তাঁকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা জানাল।

এদিকে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ নিজেই হস্তিনাপুরে আগমন করবেন দূতমুখে

এই সংবাদ পেয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য নানাপ্রকার সুমিষ্ট অন্নপানীয় ও অন্যান্য বহুবিধ আসবাবাদি সম্বলিত রত্নখচিত এক অপূর্ব সভা গৃহ নির্মান করালেন। তিনি উপঢৌকন স্বরূপ এক বর্ণ অশ্ব, সুবর্ণ নির্মিত রথ, বিশাল দর্শন হস্তি, দাস-দাসী বহু ধনরত্ন নানা ভোজ্যসামগ্রী ও অন্যান্য মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদিও কৃষ্ণকে প্রদান করবেন বলে স্থির করলেন।

উপঢৌকন দানের সিদ্ধান্তে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে আপনি কপটতা সহকারে কৃষ্ণকে প্রলোভিত করে পান্ডবগণ হতে তাঁকে পৃথক করতে বাসনা করেছেন। কিন্তু আমি জানি কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রাণতুল্য মনে করেন এবং কোন অবস্থাতেই তিনি অর্জুনকে পরিত্যাগ করবেন না। অতএব যে কার্যে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন আপনার তাই সম্পাদন করা কর্তব্য। শান্তিবিধানের উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণ হস্তিনাপুর আগমন করছেন। আপনার উচিত তাঁর উপদেশমত কার্য করা। পান্ডবগণ আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করেন। আপনি তাঁদের সন্তানস্বরূপ জ্ঞান করুন।

দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, আমি মহামন্ত্রী বিদূরের সঙ্গে একমত, কৃষ্ণ পান্ডবদের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, কোন প্রলোভনেই তাঁকে বশীভূত করা সম্ভব হবে না। বরং এই সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করলে তিনি মনে করবেন আমরা যুদ্ধে ভয় পাচ্ছি। আমার মনে হয় তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থার দরকার নেই।

পিতামহ ভীষ্ম বললেন, হে মহাবাহো! কৃষ্ণকে সংকার কর বা না কর তিনি কর্তব্যে অবিচলিত থাকবেন ; কোন কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না। তোমার উচিত হবে কৃষ্ণ যা বলবেন সেইমত কার্য করা। কৃষ্ণের সাহায্যে পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন কর।

দুর্যোধন ভীষ্মের কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, পিতামহ, আমার একটি পরিকল্পনা আছে। শ্রবণ করুন। পান্ডবদের একমাত্র অবলম্বন কৃষ্ণ এখানে আগমন করছেন। এই সুযোগে আমি তাঁকে বন্দী করব। কৃষ্ণ আমার অধিকারে থাকলে পান্ডবগণ সহ সমস্ত পৃথিবী আমার বশীভূত হবে সন্দেহ নেই। আপনি এমন উপায় স্থির করুন যাতে কৃষ্ণ আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছুই জানতে না পারেন।

দুর্যোধনের এই অধর্মোচিত বাক্যের প্রতিবাদে ভীষ্ম সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। যাবার সময় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে ধৃতরাষ্ট্র, তোমার এই সন্তান সতত অনর্থচিন্তা করে থাকে। তুমিও তাঁকে সমর্থন কর। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই দুরাত্মা কৃষ্ণের রোষে সকলের সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

॥ এগার ॥

পরদিন কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে কৌরব সভায় প্রবেশ করে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনগণ ও অন্যান্য কৌরব পক্ষীয় বীরদের সঙ্গে শিষ্টাচার বিনিময় করলেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সমাপনে কৃষ্ণ সকলের সঙ্গে হাস্যপরিহাস সহকারে বাক্য বিনিময়ে

রত হলেন। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন বিদুরের গৃহে। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর কৃষ্ণ বিদুরকে বিরাটনগরের সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করে শুনালেন। বিদুর ভবনে মাতাকুন্তী কৃষ্ণকে দর্শন করে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদে নিমগ্ন হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর দুঃখকষ্ট ও নিগ্রহের উল্লেখ করে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে কৃষ্ণকে জানালেন তাঁর পুত্রগণ যেন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের কখনই ক্ষমা না করে। তিনি দুঃখ করে বললেন, কৃষ্ণ, বলদেব, মহীরথ প্রদ্যুম্ন সহায় হয়েও এবং ভীমার্জুন জীবিত থেকেও মাতা হিসাবে তাঁকে এই সকল দুঃখভোগ করতে হল।

কৃষ্ণ কুন্তীকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনি শীঘ্রই দেখতে পাবেন আপনার পুত্রগণ তাঁদের হৃত রাজ্য উদ্ধার করেছেন। পাণ্ডবদের দুঃখকষ্টের দিন শেষ হয়েছে।

বিদুর ভবন থেকে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে আগমন করলে দুর্যোধন তাঁকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কৃষ্ণ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে বললেন, দূতগণ কার্য সমাধান করার পরই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে থাকেন।

কৃষ্ণের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে দুর্যোধন বললেন, আমাদের প্রীতিপূর্ণ আমন্ত্রণ গ্রহণ না করার কারণ কিছুতেই বোধগম্য হল না। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা বা কলহ নেই।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে কৌরব, লোকে প্রীতিপূর্বক অথবা বিষণ্ণ হয়ে অন্যের অন্ন গ্রহণ করে। আপনি প্রীতি সহকারে ভোজন করাতে বাসনা করেন নি। আমিও বিপদে পতিত হই নি। অতএব আমি কী নিমিত্ত আপনার গৃহে ভোজন করব? আপনি অকারণে পাণ্ডবদের দ্বেষ করে থাকেন। যিনি পাণ্ডবদের দ্বেষ করেন তিনি আমাকেও দ্বেষ করেন। আর যিনি তাঁদের অনুগত তিনি আমারও অনুগত। আমি পাণ্ডবগণ হতে ভিন্ন নই। আমাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করার পিছনে আপনার নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে। সেজন্য আমি আপনার ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করব না। আমি বিদুরের ভবনে আহার করব বলে স্থির করেছি।

এই বলে কৃষ্ণ বিদুরভবনে চলে এলেন। ভীষ্মাদি গুরুজনগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণকে তাঁদের ভবনে আগমন করতে অনুরোধ জানালেন। কৃষ্ণ তাঁদের অনুরোধও রক্ষা করলেন না। বিদুর ভবনেই ভোজন করলেন।

ভোজনের পর সন্ধ্যাযোগে বিদুর কৃষ্ণকে বললেন, হে মধুসূদন, আপনার কৌরবরাজ্যে আগমন উচিত হয় নি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ— এঁরা সকলেই দুর্যোধনের নিকট হতে জীবিকা লাভ করেন। সেই জন্য তাঁরা দুর্যোধনের বিরুদ্ধাচরণ করে শান্তিস্থাপনে সম্মত হবেন না। ধার্তরাষ্ট্রগণ ও কর্ণের বিশ্বাস পাণ্ডবগণ ভীষ্মাদি গুরুজনদের কদাপি আক্রমণ করবেন না। দুর্যোধন মনে করেন কর্ণ একাকী সমগ্র শত্রুগণকে পরাজিত করতে সক্ষম। ধার্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদের তাঁদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রত্যার্পণ করবেন না বলে স্থির করেছে। অতএব আপনার শান্তি স্থাপনের চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুর্যোধন হস্তী রথ সম্বলিত বিপুল সৈন্যদল

সংগ্রহ করেছেন। বহুরাজন্যবর্গ ও যোদ্ধা এখন কৌরবদের মিত্র। আপনার হাতে পরাজিত নৃপতিগণ এখন ধার্তরাষ্ট্রগণের আশ্রয় প্রার্থী। তাঁরা সকলেই পান্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কৃতসংকল্প। এমতাবস্থায় আমার অভিপ্রেত নয় আপনি শত্রুগণের সভায় শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হোন।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে বিদুর, আপনার কথা সবই যথার্থ। দুর্যোধনের দৌরাত্ম ও ক্ষত্রিয়রাজগণের শত্রুতায় কুরুকুল ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হয়েছে। উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র বের করে যাতে শান্তি স্থাপিত হয় আমি তার চেষ্টা করব। এ কাজ ধর্মানুগত। এ কাজে অসফল হলেও কার্যসাধনানুসারে তার ফলপ্রাপ্তি আছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশাকর্ষণ করেও তাঁকে অকার্য হতে নিবৃত করেন। বিফল হলেও তিনি নিন্দনীয় হন না। দুর্যোধন আমার শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে আমার কোন ক্ষতি নেই। বরং আত্মীয়দের বিপদে তাঁদের যে সদুপদেশ দিতে পেরেছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। অন্যথায় আমি কুরুকুলের আত্মীয় বলে গণ্য হতে পারি না। আর কৌরব সভায় আমার অসম্মানকারীদের সংহার করতে আমি কুণ্ঠিত হব না।

তারপর দিন কৃষ্ণ পুরবাসীগণের হর্ষধ্বনির মধ্যে বিদুর ও সাত্যকির হস্তধারণ করে নিজ রথে কৌরব সভায় আগমন করলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন যথোচিত সমাদরে কৃষ্ণকে সভামধ্যে নিয়ে এলেন। সভায় প্রবেশ করলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সহ সমবেত কৌরব প্রধান ও নৃপতিগণ কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পরে তাঁকে বয়ক্রম অনুসারে যথাবিধি অর্চনা করলেন।

সভামধ্যে দন্ডায়মান হয়ে কৃষ্ণ পিতামহ ভীষ্মকে বললেন, ঐ দেখুন দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সভার কার্যবিবরণ শ্রবণ করতে মর্ত্যভূমিতে আগমন করেছেন। শীঘ্র তাঁদের আসন প্রদান করে সৎকার করুন।

ভীষ্মের আদেশে তৎক্ষণাৎ রত্নখচিত আসন আনীত হল। পরদিন মহর্ষিগণ আসনে উপবিষ্ট হলে কৃষ্ণ তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। উপস্থিত সকলে অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কাহারও বাক্যস্ফূর্তি হল না।

কিয়ৎকালবাদ কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, মহারাজ! আমার একান্ত বাসনা কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জীবন অযথা বিনষ্ট না হয়, সেই প্রার্থনা জানাতেই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। মহান কুরুকুলে আপনার জন্ম। আপনার হতে কোন অযৌক্তিক কার্য সম্পাদিত হওয়া অনুচিত। খুবই দুঃখের বিষয় আপনার ন্যায় একজন মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে নানা অসৎ কাজে লিপ্ত রয়েছে। দুর্যোধনাদি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট ও লোভী। তাঁরা ধর্মপথ পরিত্যাগ করে স্বীয় বন্ধুদের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করে চলেছে। কুরুকুল এখন মহাবিপদের সম্মুখীন। আপনি এই বিপদ উপেক্ষা করলে সমগ্র পৃথিবী বিনষ্ট হবে। অথচ আপনিই পারেন এই আপদের বিনাশ ঘটাতে। আমার এখনও বিশ্বাস উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপন

অসম্ভব নয়। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, আমি পান্ডবদের নিরস্ত্র করব। যুদ্ধে পান্ডবদের পরাজিত করা অসম্ভব। আপনি পান্ডবদের তাঁদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করে সন্ধি স্থাপনে যত্নবান হোন। পান্ডবগণ সব সময় আপনার আজ্ঞাধীন। আপনি পুত্রদের পরামর্শে পান্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেখানে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে আপন বলে সমূদয় ভূপতিগণকে বশীভূত করে আপনারই অধীন করেছিলেন। কপটদ্যূতে শকুনি আপনার সম্মতি সহকারে তাঁদের রাজ্য সম্পদ অধিকার করেছিল। প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীর অবমাননা দর্শন করেও তাঁরা ক্ষাত্রধর্ম হতে বিচ্যুত হন নি। উভয়পক্ষের মঙ্গল কামনায় আমি এই সকল কথা বলছি। পান্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েতেই সম্মত আছেন। আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করুন।

উপস্থিত পারিষদবৃন্দ কৃষ্ণের বাক্যের প্রশংসা করতে লাগলেন।

দেবর্ষি নারদ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে কুরুনন্দন, কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই সুহৃদ। সুহৃদ প্রত্যুপকার আশা না করেই উপকার করেন। সেজন্য সুহৃদের উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য। কৃষ্ণের শান্তিপ্রস্তাব গৃহীত হলে কুরুকুল সহ সমগ্র পৃথিবী উপকৃত হবে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে ভগবান! আপনার বাক্য যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই ; কিন্তু তা কার্যে পরিণত করা আমার অসাধ্য। কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে কেশব! তোমার বাক্য সুখকর ও ধর্মানুগত। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। তুমি নিজে পাপাত্মা দুর্যোধনকে শান্ত কর।

তখন কৃষ্ণ দুর্যোধনকে আহ্বান করে বললেন, হে ভ্রাত! তোমার পিতা ও অমাত্যগণ সন্ধি স্থাপনে একান্ত আগ্রহী। তুমি যদি সুহৃদবাক্য অগ্রাহ্য কর তবে পরিণামে অশেষ দুঃখভোগ করতে হবে। পান্ডবগণ ধর্মপরায়ণ। নানাভাবে নিগৃহীত হয়েও তাঁরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ক্রোধ পোষণ করেন না। তাঁরা তোমাদের বন্ধু। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা কোন মতেই উচিত নয়। অন্যায় পথে অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তুমি সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসুক হয়েছ। এই সর্বনাশের পথ পরিত্যাগ কর। পান্ডবগণ পরিতুষ্ট থাকলে তোমার সকল কামনাই পূর্ণ হবে। মনে রেখো ভীমসেন ও অর্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে এমন শক্তি কাহারও নেই। তুমি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর। পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও আত্মীয়দের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমার জন্য যেন তাঁরা বিনষ্ট না হন। বংশনাশকারী বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হও না। মহারথ পান্ডবগণ তোমাকে যৌবরাজ্য ও তোমার পিতাকে মহারাজ্য পদে অভিষিক্ত করবেন। আগমনোন্মুখী লক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করো না। সুহৃদগণের বাক্য রক্ষা কর। পান্ডবদের তাঁদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করে মিত্রদের প্রীতিভাজন হও।

ভীষ্মাদি গুরুজনগণ কৃষ্ণের প্রস্তাবমত পুনরায় দুর্যোধনকে পান্ডবদের সহিত সন্ধি করতে উপদেশ দিলেন।

দুর্যোধন সকলের বাক্য অস্বীকার করে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বললেন, হে বাসুদেব।

এটা অতি পরিতাপের বিষয় আমার কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও তুমি, বিদুর, পিতা, আচার্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম সর্বদা আমার নিন্দায় মগ্ন আছেন। পান্ডবগণ নিজেরাই তাঁদের রাজ্য হারানো ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী। তাঁরা দ্যূতক্রীড়ার শর্তসমূহ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এরজন্য আমাদের উপর দোষারোপ করা অন্যায়। আশ্চর্যের বিষয় তাঁরাই আবার শত্রুর ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করছে। আমরা যুদ্ধে ভীত নই। পান্ডবগণ তো দূরে থাকুক, দেবগণও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজিত করতে পারবেন না। আমি জীবিত থাকতে পান্ডবদের সূচ্যাগ্র পরিমান ভূমিও প্রদান করব না।

কৃষ্ণ দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বললেন, হে দুর্যোধন! মনে হচ্ছে তুমি বীর শয্যা গ্রহণ করতে বাসনা করেছ। তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। মহাযুদ্ধ আসন্ন। আমি শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি পান্ডবদের রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ না করলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

কৃষ্ণ ভীষ্মাদি গুরুজনদের বললেন, কুরুকুল রক্ষার জন্য আপনারা দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে বন্দী করে পান্ডবদের হাতে সমর্পণ করুন।

এরপর মাতা গান্ধারী রাজসভায় এসে পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের পক্ষে দুর্যোধনকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু দুর্যোধন নিজের মতে অনড় রইলেন। হঠাৎ তিনি সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে শকুনি, কর্ণ ও অন্যান্য কয়েকজন অনুগামীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। সাত্যকি দুর্যোধনের কুমৎলব আছে মনে করে সৈন্য যোজনার আদেশ দিয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে তাঁর আশঙ্কার কথা জানালেন।

কৃষ্ণ সব শুনে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনার পুত্রগণ আমাকে বলপূর্বক নিগৃহীত করবেন বলে স্থির করেছেন। আমি এঁদের সকলকেই বিনষ্ট করতে পারি ; কিন্তু আমি কোন পাপকার্যে লিপ্ত হব না। দুর্যোধন তাঁর ইচ্ছামত কাজ করুন। ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়ে দুর্যোধনকে সভায় আহ্বান করে তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন। বিদুরও সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন বাসুদেবের উপর আক্রমণকারীরা বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

তখনই সভাগৃহে এক অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হল। কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করে দন্ডায়মান হলে তাঁর দেহ হতে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত দেবতাগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপান্ডব ও তাঁর পক্ষীয় অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ নানা আয়ুধে সজ্জিত হয়ে নির্গত হলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি নিজ মহাস্ত্রসকল দেহ হতে উদ্যত হলে তাঁর নাসিকা, চক্ষু ও মুখবিবর হতে অগ্নিশিখা এবং লোমকূপ হতে সূর্যকিরণ সদৃশ কিরণ-সমূহ নিঃসৃত হতে লাগল। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় ও উপস্থিত ঋষিগণ বাসুদেব কর্তৃক দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর ভীষণ মূর্তি দর্শনে ভীতগ্রস্ত হয়ে চক্ষু নিমীলিত করলেন। দিব্য চক্ষুপ্রাপ্ত হয়ে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। উপস্থিত রাজা ও ঋষিগণ বাসুদেবের স্তব করতে লাগলেন। কিয়ৎকাল বাদে কৃষ্ণ পূর্ব মূর্তি ধারণ

করে ঋষিদের অনুমতি নিয়ে সভাগৃহ পরিত্যাগ করলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় দুর্যোধন ও তাঁর অনুগামীরা কৃষ্ণের কোনই ক্ষতি করতে পারলেন না।

সভাগৃহ হতে কৃষ্ণ বিদুরের সঙ্গে তাঁর গৃহে গমন করলেন। সেখানে মাতা কুন্তীকে কৌরব সভার ঘটনাবলী বর্ণনা করে বললেন, দুর্যোধন ও তাঁর অনুচরদের শেষ দশা উপস্থিত হয়েছে। আমি এখন পান্ডবদের নিকট গমন করব। তাঁদের প্রতি আপনার কোন নির্দেশ থাকলে বলুন।

মাতা কুন্তী বললেন, হে কেশব! আমার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলবে এই বিপদ হতে মুক্ত হওয়াই তার এখন প্রধান কাজ। সে যেন সাম, দান, ভেদ, দন্ড ও নীতিদ্বারা পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা করে সমস্ত মৃদুতা বিসর্জন দিয়ে তাঁকে রাজধর্মানুসারে যুদ্ধ করতে উপদেশ দেয়। বংশের মর্য্যাদা যেন কোন অবস্থাতেই ক্ষুন্ন না হয়।

মাতা কুন্তী ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের জন্যও অনুরূপ উপদেশ দিলেন।

নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় কৃষ্ণের আহ্বানে কর্ণ তাঁর রথে আরোহণ করলেন। রথে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, হে কর্ণ! আমি তোমায় কয়েকটি হিতকর কথা বলছি, মন দিয়ে শোন। তুমি তোমার জন্ম বৃত্তান্ত অবগত নহ। তুমি তোমার জননী কুন্তীর গর্ভে কন্যাবস্থায় উৎপন্ন হয়েছ। সে নিমিত্ত তুমি ধর্মতঃ পান্ডুর পুত্র। তুমি আমার সঙ্গে পান্ডবদের শিবিরে আগমন কর। পান্ডবগণও তোমাকে কৌন্তেয় ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলে জানুক। তুমিই রাজপদে অভিষিক্ত হবে এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হয়ে তোমার আজ্ঞা পালন করবেন। দ্রৌপদীও তোমাকে পতিত্বে বরণ করবেন।

কর্ণ উত্তরে বললেন, হে কৃষ্ণ! আমি স্বীকার করছি ধর্মানুসারে পান্ডুই আমার পিতা। কিন্তু কুন্তী আমার অমঙ্গল কামনা করেই আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। সারথি অধিরথ আমাকে উদ্ধার করে পত্নী রাধার হস্তে অর্পণ করেন এবং তাঁর দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে বর্দ্ধিত হয়ে উঠেছি। অধিরথকে আমি পিতা ও রাধাকে মাতা বলে জানি। আমি বিবাহিত। আমার পুত্রপৌত্র সকল বিদ্যমান। আমি আমার ভার্য্যাগণের অনুরক্ত। কোন প্রলোভনেই আমি এঁদের পরিত্যাগ করতে পারব না। আবার আমি দুর্যোধনকে আশ্রয় করে এতদিন রাজ্য ভোগ করে আসছি। রাজা দুর্যোধন আমার ভরসাতেই পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমিই দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা বলে চিহ্নিত হয়েছি। ভয় বা লোভ বশতঃ আমি দুর্যোধনের সঙ্গে মিথ্যচরণ করতে পারব না। তুমি আমার জন্মবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন রেখে অতি উত্তম কাজ করেছ। আমি কুন্তীর প্রথম সন্তান বলে জানতে পারলে তিনি রাজ্য গ্রহণ করবেন না। আর আমি রাজ্য পেলে তাহা সখা দুর্যোধনকেই দান করব। অতএব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হয়ে থাকুন।

কৃষ্ণ সব শুনে বললেন, হে কর্ণ! আমি তোমায় পৃথিবী দান করলাম ; কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করলে না। মনে রেখো পান্ডবগণই এই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন এবং

আর সাত দিন গত হলেই এই যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে এই কথা বলে কর্ণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে রথ হতে অবতরণ করে নিজ রথে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। আর সাত্যকির সঙ্গে কৃষ্ণ যাত্রা করলেন বিরাটনগরের উদ্দেশে।

এদিকে মাতা কুন্তী আসন্ন যুদ্ধে জ্ঞাতিবধের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন শেষ পর্যন্ত হয়তো পিতামহ ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ও কুলগুরু কৃপাচার্য পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। কিন্তু কর্ণের মতিগতি অন্য প্রকার। তার মন গভীর পাণ্ডব বিদ্বেষে কলুষিত। তিনি দুর্যোধনের প্রিয় সখা। তবুও কুন্তি কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে আনয়ন করতে মনস্থ করলেন। তিনি গোঁপনে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বৎস, তুমি কুন্তীনন্দন। রাধার গর্ভে তোমার জন্ম হয় নি। অধিরথও তোমার পিতা নহে। তুমি আমার কানিন পুত্র। কন্যা অবস্থায় আমার গর্ভে তোমার জন্ম। সূর্যদেব তোমার পিতা। তুমি দুরাত্মা দুর্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করে স্বীয় পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হও।

কুন্তীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে কর্ণ বললেন, হে ক্ষত্রিয়ে পুত্রের প্রতি মাতার যে কর্তব্য তা আপনি আমার প্রতি পালন করেন নি। এক্ষণে আপন হিতকামনায় আমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করছেন। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে আমার যশোহানি হবে। সকলেই মনে করবে আমি ভয়বশত এ কার্য করেছি। যুদ্ধ আসন্ন। ধার্তরাষ্ট্রগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটা প্রকৃষ্ট সময়। তবে কথা দিচ্ছি আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যুদ্ধ করব কেবল অর্জুনের সঙ্গে। আমাদের মধ্যে একজন নিহত হলে আপনি চিরদিন পঞ্চপুত্রের মাতা বলেই পরিচিত থাকবেন। কুন্তী বললেন, বৎস, তোমার অঙ্গীকার যেন মনে থাকে। তুমি অর্জুন ভিন্ন অন্য চার ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না।

কথোপকথন সমাপ্ত হলে কুন্তী ও কর্ণ নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করলেন।

বিরাটনগরে প্রত্যাবর্তন করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কৌরব সভার ঘটনাবলী বিবৃত করে বললেন, মহারাজ, কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করবে না। যুদ্ধার্থে তাঁরা ইতিমধ্যেই কুরুক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ করেছে।

এরপর পাণ্ডবপক্ষও সৈন্যদল নিয়ে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হলেন। কৌরব সেনার সেনাপতি হলেন পিতামহ ভীষ্ম। আর দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন হলেন পাণ্ডব সেনার সেনাপতি।

যুদ্ধের পূর্বদিন শকুনিপুত্র উলুককে দুর্যোধন দূতরূপে পাণ্ডব শিবিরে প্রেরণ করলেন। যাত্রার পূর্বে উলুকের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, হে উলুক! তুমি আমার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করবে—আপনি সকলকে অভয় প্রদান করে থাকেন ; কিন্তু এক্ষণে নৃশংসকের ন্যায় সমগ্র পৃথিবী বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন কেন? তুমি তাঁকে প্রহ্লাদ-কথিত বিড়াল তপস্বীর কাহিনী বলবে -- কিভাবে এক

বিড়াল তপস্যার ভান করে বহু মুষিকের বিশ্বাসভাজন হয়ে তাঁদের ভক্ষণ করেছিল— এবং এও শুনিয়ে বলবে আপনি বিড়ালের ন্যায় নিজ আত্মীয়বর্গকেও প্রতারিত করতে বাসনা করেছেন। তুমি যুধিষ্ঠিরকে আসন্ন যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করতে আহ্বান করবে।

উলুক, তুমি কৃষ্ণকে বলবে, আপনি কৌরব সভায় যে মায়ারূপ ধারণ করেছিলেন, সে বিদ্যা আমাদেরও জানা আছে ; কিন্তু আমি নিজ বাহুবল ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে কার্যোদ্ধার করতে চাই না। আপনি কংসের ভৃত্য ছিলেন। সে জন্য আমার তুল্য কোন রাজা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ঘৃণা বোধ করে।

উলুক, তুমি ভীমসেনকে বলবে, আমাদের পৌরুষের ফলেই আপনি বিরাটনগরে পাচকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যদি শক্তি থাকে তবে প্রতিজ্ঞামত আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃশাসনের রক্তপান করুন।

উলুক, তুমি অর্জুনকে বলবে, আপনি কূপমণ্ডূক, সেজন্য আপনি কৌরব সেনার সামর্থ অনুধাবন করতে পারছেন না। আপনার বলবীর্য আমি অবগত আছি। বাসুদেব যে আপনার সহায় তাও জানি। তথাপি আপনাদের রাজ্য হরণ করে তের বৎসর ভোগ করছি। দ্যূত সভায় আপনার বল কোথায় ছিল ? আপনি নপুংশক সেজে বিরাট কন্যাকে নৃত্য শেখাতেন। সহস্র সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জুন আমার অব্যর্থ বাণের আঘাতে চতুর্দিকে পলায়ন করবে।

উলুক পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছে দুর্যোধনের নির্দেশমত পাণ্ডবদের সব জানালেন। কৃষ্ণ বললেন, হে উলুক! দুর্যোধনকে বলবে তাঁর ইচ্ছামতই কাজ হবে। ভীমসেন বললেন, উলুক, তুমি দুর্যোধনকে বলবে আমার প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবে না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃশাসনের রক্ত পান করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর তোমাকে তোমার পিতা শকুনির সম্মুখেই বধ করে পরে সেই পাপিষ্ঠকে বধ করব। অর্জুন বললেন, উলুক, দুর্যোধনকে বলবে কাল যুদ্ধক্ষেত্রে আমি গাণ্ডীব দ্বারা তাঁর উদ্ধত বাক্যের প্রত্যুত্তর দেব। দুর্যোধন যেন মনে না করেন আমি পিতামহ ভীষ্মকে আঘাত করব না। যার ওপর নির্ভর করে দুর্যোধন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই ভীষ্মকে আমি প্রথমে বধ করব। যুধিষ্ঠির বললেন, উলুক, দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে দেবে, যে পরের সম্পদ, হরণ করে এবং অন্যের সাহায্যে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করে, সেই নপুংশক। শিখণ্ডী বললেন, ভীষ্মবধের জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করেছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি অন্যের অসাধ্য একটি কাজ করব। আমি দ্রোণকে সসৈন্যে ও সবান্ধবে বধ করব।

উলুক কৌরব শিবিরে ফিরে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার বিবরণ জানালেন।

যুদ্ধপূর্ব উদ্যোগপর্বে আমরা চরনীতির বহুবিধ প্রয়োগ দেখতে পাই। এ বিষয়ে উভয় পক্ষই যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে চর ও দূত মারফত অপরের যুদ্ধপ্রস্তুতির উপর কঠোর দৃষ্টি রাখছিলেন। সাম, দান ও ভেদ নীতি প্রয়োগ করে নিজেদের সিদ্ধির মানসে অপর

পক্ষকে নানাভাবে দুর্বল করতে চেষ্টিত ছিলেন। এ ব্যাপারে পান্ডবপক্ষের সাফল্যই বেশী। ক্ষতি-দমন (Damage control) নীতির সফল প্রয়োগও পান্ডবদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।

পান্ডবপক্ষের সকল সাফল্যের মূলে ছিল কৃষ্ণের প্রখর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা। কৃষ্ণের সহায়তা ভিন্ন পান্ডবদের এই সাফল্য একেবারেই সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণের উপর নির্ভর করেই যে যুধিষ্ঠির কৌরবদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছেন এ কথা তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন। এই কৃষ্ণ-নির্ভরতা পান্ডবদের সকল কার্যাবলীর উপর প্রতিফলিত ছিল। কৌরবদের পক্ষে কৃষ্ণের ন্যায় কোন নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা ছিল না। অন্ধ পান্ডব বিদ্বেষী কর্ণ শকুনি প্রভৃতি সেনানায়কদের নিকট দুর্যোধন কোন সদবুদ্ধি প্রাপ্ত হন নি। দুর্যোধন নিজেও ছিলেন একজন অনমনীয় ব্যক্তি, সকল আপস মীমাংসার বিরোধী। সেজন্য কোন স্বচ্ছ চিন্তাধারা তাঁর কার্যপ্রণালীর উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি। পরিনামের কথা না ভেবে তিনি তাঁর কয়েকজন স্তাবকের পরামর্শ মতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। পিতামহ ভীষ্ম ও মহামন্ত্রী বিদুর প্রভৃতি গুরুজনগণ কৌরবদের দূরদর্শিতার এই অভাব পূরণ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন দুর্যোধনের কার্যকলাপের ঘোর বিরোধী এবং পান্ডব হিতৈষী। নিজেদের জীবিকার জন্য নির্ভরতার কারণেই কেবল তাঁরা প্রকাশ্যে দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু তাঁরা কেউই সক্রিয়ভাবে দুর্যোধনের সাহায্যে এগিয়ে আসেন নি যেমন কৃষ্ণ এগিয়ে এসেছিলেন পান্ডবদের সাহায্যে। বরং তাঁদের মধ্যে অনেকে বিশেষত ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর কৌরবদের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন। তাঁদের সহায়তা ও চরনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে উদ্যোগ পর্বে কৌরবদের সংগৃহীত আসন্ন যুদ্ধসংক্রান্ত সংবাদ সমূহ অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ ছিল ; পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নও হয় নি। সফলতর চর ও ক্ষতি-নিবারণ (Damage control) নীতি নিঃসন্দেহে যুদ্ধে পান্ডবদের জয়ই নির্দেশ করছিল।

উদ্যোগ পর্বে উভয়পক্ষের পদক্ষেপগুলি বিশ্লেষণ করলে তাঁদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারব। কৌরবদের প্রথম ও প্রধান হার হল যখন দুর্যোধন কৃষ্ণের পরিবর্তে তাঁর নারায়ণী সেনা গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ একাই যে তাঁর সমগ্র নারায়ণী সেনার চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী এবং ঈশ্বরাবতার কৃষ্ণ যে পক্ষে থাকবেন তাঁদের জয়ই যে অনিবার্য — এই অমোঘ সত্যটি দুর্যোধন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। বস্তুতঃ কৃষ্ণের শক্তির সম্বন্ধে দুর্যোধনের মূল্যায়ন ছিল বিকৃত। তিনি কৃষ্ণকে একজন সাধারণ মায়াবী বলে অবজ্ঞা করতেন। বহুক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির কথা স্বীকার করতেন না। এ বিষয়ে ভীষ্মাদি গুরুজনদের মতামতকে তিনি কোন মূল্য দিতেন না ; কর্ণাদি আপন পরামর্শদাতাদের কথাই কেবল বিশ্বাস করতেন। দুর্যোধন সেজন্য নারায়ণী সেনা পেয়ে তিনিই জিতেছেন বলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানেই আসন্ন যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। অলৌকিক শক্তিধর কৃষ্ণকে পেয়ে তাঁর সহায়তায় পান্ডবগণ সকল বিপদ থেকে উদ্ধার

পেয়েছিলেন।

যুদ্ধে দুর্যোধনই কিন্তু প্রথম কৃষ্ণের নিকট গমন করেন আসন্ন যুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে। কৃষ্ণেরই চক্রান্তে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অর্জুনকে সাহায্য করার মানসে তিনি কপট নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিলেন। তা না হলে তিনি দুর্যোধনকে প্রথমে দেখতে পেয়ে তাঁর প্রার্থনাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতেন প্রচলিত প্রথা মত। আরও একটি অসত্য কথনে তিনি দুর্যোধনকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। সমর নিরপেক্ষ ও অস্ত্রহীন কৃষ্ণ এবং যাদব সেনা সমশক্তি সম্পন্ন কৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে সত্যতার অভাব ছিল। ঈশ্বরাবতার কৃষ্ণ অবশ্যই সমগ্র যাদব সেনার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। এই সত্যটি তখন দুর্যোধনের চিন্তায় আসে নি। সে জন্য তিনি নির্দ্বিধায় কৃষ্ণের বদলে যাদব সেনা পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন। অর্জুনের সারথ্য পদ গ্রহণ করে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছেন। যুদ্ধে সারথীর অবদান রথীর চেয়েও বেশী। এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের বিরুদ্ধে কৌরবদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি জানানো হল না। ভীষ্মাদি গুরুজনদের সঙ্গে দুর্যোধনের সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এর প্রতিকার অসম্ভব ছিল না। কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। তিনি যে বিশেষ কোন পন্থায় দুর্যোধনকে তাঁর সহায়তা হতে বঞ্চিত করবেন তা তাঁদের পক্ষে অনুধাবন করা সহজ ছিল। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে দুর্যোধনকে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ফলে দুর্যোধন কৃষ্ণের ছলনার নিকট সহজেই হেরে গেলেন। দ্বারকায় গমনের পূর্বে তদানিন্তন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক ও নিরপেক্ষ পর্য্যালোচনা হলে দুর্যোধনের দৌত্যের ফল অন্যরকম হলেও হতে পারত। অন্ততপক্ষে এত সহজে কৃষ্ণের পক্ষে দুর্যোধনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হত না। এও একটি কৌরবদের চরনীতির বড় ব্যর্থতার কারণ সহায় হোক।

দ্বারকায় দুর্যোধনের দৌত্য অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। বলরাম তাঁকে সহায়তা না করলেও তিনি যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন ; কৃষ্ণের ন্যায় পান্ডবদের সহায়তায় এগিয়ে গেলেন না। দুর্যোধনের বড় সাফল্য যাদব বীর কৃতবর্মা ও তাঁর এক অক্ষৌহিনী সেনার সহায়তা প্রাপ্তি।

দুর্যোধনের একটি প্রধান ব্যর্থতা তিনি মদ্ররাজ শল্যের পান্ডবদের সাহায্য করার গোপন প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন পূর্ব সংবাদ ছিল না। পথিমধ্যে মদ্ররাজকে আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করে দুর্যোধন তাঁকে কৌরব সেনাপতির পদ গ্রহণে রাজী করান। কিন্তু পরে বিরাটনগরে মদ্ররাজের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কী কথা হল সে বিষয়ে তিনি কোন সংবাদ রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। এটা দুর্যোধনের একটি অমার্জনীয় বিচ্যুতি। দুর্যোধনের জ্ঞাতসারেই মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। মদ্ররাজ নকুল-সহদেবের আপন মাতুল। সেজন্য পান্ডবদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। এসব মনে রেখে দুর্যোধনের উচিত ছিল মদ্ররাজ ও যুধিষ্ঠিরের আলোচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে বিশ্বস্ত চর নিয়োগ করা। কিন্তু তিনি

সেরকম কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেন নি। মদ্ররাজকে স্বপক্ষে পেয়েছেন এতেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিশ্চিন্ত রইলেন। এর চেয়ে চরম দূরদর্শিতার অভাব আর কী হতে পারে? যুদ্ধ ক্ষেত্রে মদ্ররাজের বিশ্বাসঘাতকতা কৌরবদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছিল। বিরাট নগরে দুর্যোধনের চরদের নিষ্ক্রিয়তাও দুর্বোদ্ধ। এখানেও কি বিদুরের কোন হাত ছিল? মদ্ররাজের পান্ডব-সহায়তার প্রতিশ্রুতির কথা যথাসময়ে জানতে পারলে দুর্যোধন তাঁকে কৌরবপক্ষে গ্রহণ করতেন না। ফলে যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

অর্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে কর্ণ যুদ্ধ করবেন না, মাতা কুন্তীকে দেওয়া তাঁর এই প্রতিশ্রুতির সংবাদও দুর্যোধনের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কর্ণের উপর দুর্যোধনের অগাধ বিশ্বাস। সে জন্য তাঁর গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর দুর্যোধনের কোন সন্দেহ ছিল না। কাকেও অতি বিশ্বাস করবে না রাজার পক্ষে প্রযুজ্য এই নীতিবাক্য দুর্যোধন এখানে লঙ্ঘন করেছিলেন বলেই মাতা কুন্তীকে দেওয়া কর্ণের প্রতিশ্রুতির কথা তিনি জানতে পারলেন না। যদিও অর্জুনই তাঁর প্রতিযোদ্ধা, সুযোগ পেলে অন্য শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধার সঙ্গে সংগ্রাম না করা যুদ্ধনীতির বিরোধী। প্রতিশ্রুতি পালন করে কর্ণ অন্য পান্ডু পুত্রদের জীবন রক্ষা করলেন। কর্ণের কাজটিতে অবশ্যই কৌরবদের স্বার্থহানি হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের পক্ষে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা অসম্ভব ছিল না। যুধিষ্ঠির কৌরবদের হাতে বন্দী হলে পান্ডবদের জয় অনেকটা অনিশ্চিত হত। হয়তো বন্দী অবস্থায় যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিদারুণ লোকক্ষয় দর্শনে উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন সন্ধিসূত্র গ্রহণ করতে রাজী হতেন। মাতা কুন্তীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ফলে যুদ্ধ অবসানের এমন একটি সম্ভাবনা নষ্ট হল। দুর্যোধন সজাগ থাকলে মাতা কুন্তী ও কর্ণের গতিবিধির উপর নজর রাখতেন এবং কর্ণকে কৌরবদের অহিতকর কোন প্রতিশ্রুতি মাতা কুন্তী বা অন্য কাউকেও দিতে বারণ করতে পারতেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চারিদিকের ঘটনাবলীর উপর যেরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন তা কৌরবদের ছিল না। কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত জানতেও তাঁরা উৎসুক ছিলেন না। তাঁরা কর্ণকে অধিরথের পুত্র বলেই জানতেন। কিন্তু একজন শূতপুত্রের পক্ষে এমন বলবীর্যের অধিকারী হওয়া কেমনে সম্ভব—এ প্রশ্ন তাঁদের মনে কখনই উদয় হয় নি।

এখানে কৃষ্ণ কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত জেনেও পান্ডবদের নিকট সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন। কর্ণ যে তাঁর অগ্রজ এ কথা যুধিষ্ঠির জানতে পারলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হতেন না। কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করে কৃষ্ণ তাঁকে পান্ডবপক্ষে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ কর্ণের সঙ্গে তাঁর কথপোকথনের সমস্ত সংবাদ বেমালুম চেপে গেলেন। পান্ডবগণও ধার্তরাষ্ট্রগণের ন্যায় কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কোন আগ্রহ দেখান নি। মনে হয় যুদ্ধে দুরাত্মা কৌরবদের ধ্বংস করতেই কৃষ্ণ কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত পান্ডবদের নিকট প্রকাশ করেন নি। কর্ণও নিজ জন্মবৃত্তান্ত দুর্যোধনের নিকট গোপন রেখেছিলেন যাতে সত্যঘটনা প্রকাশ পেয়ে কৌরবদের মধ্যে কোন

বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। এখানে কৃষ্ণ ও কর্ণ মন্ত্রণাসংগুপ্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। যাহোক, শেষ পর্যন্ত পান্ডবগণই লাভবান হলেন। কর্ণের দয়ায় পান্ডব ভ্রাতাদের জীবন রক্ষা পেল। অর্জুনের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে কর্ণ নিজেই নিহত হলেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি মত মাতা কুন্তী পঞ্চপান্ডবের মাতাই রয়ে গেলেন। ঘটনাবলী বিশ্লেষণে মনে হয় কৃষ্ণ ও মাতা কুন্তীর ক্ষতি দমন (Damage control) নীতি সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল।

উভয় পক্ষের প্রেরিত দূতগণ সন্ধি প্রস্তাব আলোচনার আড়ালে অপর পক্ষের মনোবল, যুদ্ধপ্রস্তুতি, প্রতিযোদ্ধা, সহায়ক রাজন্যবর্গ, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি যুদ্ধসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গোপনে সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। সাম, দান ও ভেদ নীতির নিপুণ প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছিল। কৌরব দূত সারথী সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধ ও মৃদুস্বভাবের সুযোগ নিয়ে তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যুদ্ধে জ্ঞাতিবধের পরিবর্তে তাঁর রাজ্যাংশের দাবী পরিত্যাগ করে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করাই কর্তব্য। যুধিষ্ঠির অবশ্য সঞ্জয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবি পাঁচটি গ্রামে সংকুচিত করেছিলেন কৌরবদের সহিত শান্তিস্থাপনের আগ্রহে। এ দিক থেকে সঞ্জয় কিছুটা কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। দুর্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের এই পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা অগ্রাহ্য হলে সন্ধিস্থাপন সম্ভব হল না। সঞ্জয় অবশ্য তাঁর দৌত্যকালে পান্ডব পক্ষের যুদ্ধায়োজনের বহু তথ্য সংগ্রহ করে ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় সেনানীদের গোচরিভুত করেছিলেন। এর ফলে কৌরবদের রণনীতি নির্দ্ধারণ অনেকটা সহজ হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র বারবার সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে পান্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খুঁটিনাটি সংবাদ আগ্রহ সহকারে শুনেছিলেন। পান্ডবদের যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখে সঞ্জয়ের নিজেরই বিশেষ ভিতির সঞ্চার হয়েছিল। সকল সংবাদ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন পান্ডবদের পরাস্ত করতে পারে এমন শক্তি কারও নেই। পুত্র দুর্যোধনকে তাঁর অন্যায় কাজে সমর্থনের জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কারও করেছিলেন। মনে হয় কৃষ্ণ ও পান্ডবদের সঙ্গে কথাবার্তায় সঞ্জয় তাঁদের দাবির ন্যায্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। সঞ্জয়ের দৈত্যে পান্ডবপক্ষই লাভবান হলেন। তাঁরা কৌরবসভায় তাঁদের আর একজন শুভানুধ্যায়ীকে পেলেন।

কৃষ্ণ জানতেন কৌরব সভায় তাঁর দৈত্য সফল হবে না, দুর্যোধন নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবেন। দুটি উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই এই দৌত্যকার্য গ্রহণ করেন। প্রথম উদ্দেশ্য নৈতিক। কৃষ্ণ তখনকার সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মান্যতা পেয়েছিলেন। তদুপরি তিনি উভয় পক্ষেরই আত্মীয়। সে জন্য তিনি মনে করলেন আসন্ন লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ নিবারণে তাঁর কিছু কর্তব্য আছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কৌরবদের যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ সংগ্রহ করা। কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এসে বিদুরের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুর্যোধনের ভোজনের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। তিনি বহুসময় বিদুরের সঙ্গে আলোচনারত

ছিলেন। অবশ্যই এই আলোচনা কালে উভয়পক্ষের যুদ্ধপ্রস্তুতি, মনোবল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য বহু বিষয়ে মত বিনিময় হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্বে পান্ডব হিতৈষী বিদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যে অবশ্য প্রয়োজন তা কৃষ্ণ বুঝেছিলেন। হস্তিনাপুরে মহামন্ত্রী বিদুরের অধীনে বহু বিশ্বস্ত লোক ছিল। তাঁদের সাহায্যে তিনি নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। মহামন্ত্রী হিসাবে গুপ্তচর বিভাগের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব থাকার কথা। ধার্তরাষ্ট্রগণের গোপন শলাপরামর্শ ও কার্যকলাপের অনেক কিছুই তিনি জানতেন। তাছাড়া রাজসভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ তিনি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। বিদুরের এই সংবাদ-ভান্ডারে লুক্কায়িত বিষয় সমূহ জানতে কৃষ্ণ যে বিশেষভাবে আগ্রহী হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে এসে তিনি এই ভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই পান্ডব হিতৈষী যুদ্ধ কৌশল নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। তদুপরি কৌরব মহারথীদের সঙ্গে কথা বলে কৃষ্ণ তাঁদের মনোবল, যুদ্ধপ্রস্তুতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। বলাবাহুল্য সংগৃহীত তথ্য সমূহ যুদ্ধপরিচালনায় পান্ডবদের যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

কৌরব সভায় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের ষড়যন্ত্রের বিষয় সাত্যকিই প্রথম বুঝতে পারেন। তিনি ছিলেন ইঙ্গিতজ্ঞ। দুর্যোধনের হাবভাব, কর্ণ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে নিভৃতে বারবার শলাপরামর্শ দৃষ্টে তিনি নিশ্চিত হলেন তাঁদের দুরভিসন্ধি বিষয়ে। তিনি নিজ সৈন্যদলকে সতর্ক করে কৃষ্ণকে তাঁর সন্দেহের কথা জানালে কৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করে সকলকে বিস্মিত করে অক্ষত অবস্থায় সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বিশ্বরূপ ধারণের কাহিনী হয়তো একটি অতিরঞ্জন। মনে হয় সাত্যকির নেতৃত্বে যাদব বাহিনীর সঙ্গে সেখানে একটি খন্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। উল্লেখ্য কৃষ্ণ সাত্যকির অধীনে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে হস্তিনাপুরে এসেছিলেন। কৃষ্ণ চক্রসহ নিজের আয়ুধসকলও সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই কৌরব সভায় কোন বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। যুদ্ধ সংঘটনের ঘটনাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। নিজের বিপদাশঙ্কা করে কৃষ্ণ অবশ্যই গভীর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সমগ্র পরিস্থিতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। সমস্ত কৃতিত্বই কৃষ্ণের।

শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে কৃষ্ণ তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পালন করে পান্ডবদের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব সবই করলেন। কৌরব সভায় কৃষ্ণের বক্তব্য ভীষ্মাদি গুরুজন সহ বহুলোকের সমর্থন পেল। দুর্যোধন ও তাঁর অনুগামীরা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। ইহাও পান্ডবদের পক্ষে কম মূল্যবান নয়। এর ফলে যে কৌরব মহারথীদের মধ্যে বিভেদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। সব দিক থেকে বিচার করলে কৃষ্ণের দৌত্য পান্ডবদের পক্ষে হিতকরই হয়েছিল।

কর্ণকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানানোর মধ্যে কৃষ্ণের একটি বড় উদ্দেশ্য সফল হল; কর্ণ মনে মনে নিজ ভ্রাতা পান্ডবদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। অর্জুন

ভিন্ন অন্য পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না মাতাকুন্তীকে দেওয়া কর্ণের এই প্রতিশ্রুতি থেকেই এর প্রমান পাওয়া যায়। মনে হয় কৃষ্ণের পরামর্শ মতই মাতা কুন্তী কর্ণের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মাতা কুন্তীকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতির কথা ধার্তরাষ্ট্র ও পান্ডবদের মধ্যে অজ্ঞাত রইল। এতে কৌরবপক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ল।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পান্ডব জননী কুন্তীকে দেওয়া এই গোপন প্রতিশ্রুতি কৌরবদের প্রতি কর্ণের বিশ্বাসভঙ্গই বলতে হবে। নিজের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হয়ে কর্ণের মনে যে এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একদিকে কৌরবদের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং অন্য দিকে নিজ ভ্রাতাদের জীবন রক্ষার প্রশ্ন। এই পরস্পর বিরোধী কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি যে কৌরবদের স্বার্থের পরিপন্থী সে বোধও মনে হয় কর্ণের মনে তখন স্থান পায়নি। যে পরিস্থিতির মধ্যে কর্ণ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাহা বিবেচনা করলে আমরা যেন তাঁকে দোষী ভাবতে পারি না। কর্ণের দুর্ভাগ্যে আমাদের মন এক গভীর বেদনায় সিক্ত হয়ে উঠে। কিন্তু এ কথা সত্য কর্ণের প্রতিশ্রুতিতে পান্ডবপক্ষই লাভবান হলেন।

একটি প্রশ্ন না উঠে পারে না। কৃষ্ণ কি সত্যই আন্তরিকভাবে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন ; না, কেবল দায়সারাভাবে নিজ কর্তব্য পালন করেছিলেন মাত্র। বিরাটরাজ সভায় তাঁর কথাবার্তা থেকে মনে হয় তিনি যেন যুদ্ধেরই পক্ষপাতী। দ্রৌপদীর অপমানকারীরা বিনষ্ট হবে এক কথা তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছেন সমস্ত মৃদুতা বিসর্জন দিয়ে শক্তহাতে শত্রুর মোকাবিলা করতে। কর্ণের জন্মবৃত্তান্তের কথা গোপন রেখে তিনি যুদ্ধের পথই প্রশস্ত করেছিলেন। কৌরব সভায় তিনি প্রথম দিকে আরও একটু মৃদুতার সঙ্গে তাঁর শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারতেন। দুর্যোধনের প্রতি প্রথমেই অমন কঠোর বাক্য ব্যবহার বোধহয় না করলেই ভাল ছিল। কৃষ্ণ ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এই শক্তি কি শান্তিস্থাপনের পক্ষে ব্যবহার করা যেত না? শান্তি দৌত্য ব্যর্থ হলে তিনি নিজ শক্তিবলে দুর্যোধনকে বন্দী করতে পারতেন। সে চেষ্টা তিনি করেন নি। এই শক্তি তিনি ব্যবহার করলেন নিজেকে অক্ষত অবস্থায় কৌরব সভাগৃহ থেকে নিঃস্ক্রান্ত হতে। যুদ্ধক্ষেত্রে শতপুত্রের মৃতদেহ দর্শনে কৃষ্ণের প্রতি শোকাহতা গান্ধারীর অভিশাপের কথা আমরা জানি। তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন এই সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধ তিনিই কেবল বন্ধ করতে পারতেন ; কিন্তু তা তিনি করেন নি। গান্ধারীর অভিশাপে যদুকুল ও বৃষ্ণিকুল আত্মকলহে ধ্বংস হয়েছিল। সমস্তদিক বিচার করলে মনে হবে কৃষ্ণের শান্তি দৌত্য আন্তরিক ছিল না। একটি ধ্বংস যজ্ঞ সৃষ্টিই যেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগে তিনি নিজেকে লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল বলে বর্ণনা করেছেন। শান্তিদৌত্যের একটি বিষয় কিন্তু অতি স্পষ্ট। দৌত্যকালে তিনি কৌরবদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্বন্ধে সকল সংবাদই সংগ্রহ করলেন। আর সেই সঙ্গে কৌরব সেনানীদের মধ্যে দুর্যোধন-বিদ্বেষ আরও

বাড়িয়ে তুললেন। মনে হওয়া স্বাভাবিক, শান্তি দৈত্যের আসল উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন যুদ্ধে পান্ডবদের জয় সুনিশ্চিত করা। চরনীতির এমন নিপুণ প্রয়োগ কেবল তীক্ষ্মবুদ্ধি কূটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব।

।। বার।।

সেনাপতি পদে বৃত হয়ে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস! তুমি দুশ্চিন্তা করো না, আমি যথাবিধি যুদ্ধ করব ও তোমার সৈন্যদল রক্ষা করব।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি সর্বজ্ঞ। উভয়পক্ষে রথী ও অতিরথ কে কে আছেন, আমাকে বলুন।

ভীষ্ম ব্যাখ্যা করে বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই রথী (রথারোহী পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোদ্ধা)। তোমার সেনাপ্রধান সত্যবান, রাক্ষস অলম্বুষ ও প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত—এঁরা মহারথ (রথযুথপতি বা বহুরথীর অধিনায়ক)। ভোজবংশীয় বীর কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য ও কুরুবংশীয় যোদ্ধা সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা—এঁরা অতিরথ (মহারথগণের অধিপতি)। কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যও অতিরথ। দ্রোণাচার্য স্নেহবশত অর্জুনকে বধ করবেন না। দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা একজন মহারথ। তাঁর একটি দোষের জন্য তাঁকে অতিরথ বলতে পারি না। তিনি নিজের জীবনকে অতি প্রিয় জ্ঞান করেন। তোমার প্রিয় সখা কর্ণ অতিরথও নন, পূর্ণরথীও নন। ইনি নীচ প্রকৃতি ও গর্বিত, সর্বদা, পরনিন্দায় ব্যাপৃত থাকেন। সহজাত কবচকুন্ডল হারিয়েছেন ; নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মিথ্যা পরিচয় দেবার জন্য গুরু পরশুরামের শাপে তাঁর শক্তির ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরথ, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে জীবিত ফিরবেন বলে মনে হয় না।

দ্রোণাচার্যও ভীষ্মের সঙ্গে একমত হয়ে কর্ণকে অর্ধরথ বললেন।

কর্ণ ভীষ্মের কথায় ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বললেন, পিতামহ, বিনা অপরাধে আপনি আমাকে বাক্য বাণে জর্জরিত করছেন। আমার মতে আপনিই অর্ধরথ। আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রথী ও অতিরথের ব্যাখ্যা দিয়ে যোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। এতে কৌরবদেরই ক্ষতি হবে। আপনার আচরণ সন্দেহজনক। দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন, সখা! ভীষ্মের অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এঁকে পরিত্যাগ কর। বৃদ্ধের কথা শ্রবণ করা উচিত, কিন্তু বালকবৎ অতিবৃদ্ধ ভীষ্মের কথায় কর্ণপাত করো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধে যোগদান করব না।

এরপর ভীষ্ম ও কর্ণের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হল। দুর্যোধন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, যুদ্ধ আসন্ন। কিসে আমাদের শুভ হবে সেই চিন্তা করুন। আপনাদের দুজনকেই মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে হবে। এখন পান্ডব পক্ষে রথী, মহারথ ও অতিরথ কে কে আছেন, বলুন।

ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব—এঁরা সকলেই রথী। ভীম আট রথীর সমান। কৃষ্ণ যাঁর সহায় সেই অর্জুনের সমকক্ষ বীর ও রক্ষী উভয় সেনার মধ্যে নেই।

আমি আর দ্রোণাচার্যই কেবল অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মহারথ।

এইভাবে ভীষ্ম পান্ডবপক্ষের অন্যান্য যোদ্ধৃবৃন্দের বলবীর্যের ব্যাখ্যা করে বললেন, দুর্যোধন, আমি তোমার জন্য যথাযোগ্য যুদ্ধ করব। কিন্তু, দ্রুপদপুত্র শিখন্ডীর উপর শরক্ষেপ করব না। কারণ সে পূর্বে স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষ হয়েছে। পান্ডবদেরও আমি বধ করব না।

শিখন্ডীকে কেন বধ করবেন না, দুর্যোধনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বললেন, আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য হস্তিনাপুর রাজ সিংহাসনে আরোহন করলে তাঁর বিবাহের জন্য আমি কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংম্বর সভা থেকে বলপূর্বক হরণ করে আনি। বিবাহের পূর্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা জানালেন তিনি শাল্বরাজের বাগদত্তা। অম্বাকে তখন শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করে তাঁর অপর দুই ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিই। আমি অম্বাকে স্পর্শ করেছি এই কারণ দেখিয়ে শাল্বরাজ তাঁকে গ্রহণ করলেন না। তাঁর এই দূরবস্থার জন্য অম্বা আমাকে দায়ী করে তপশ্চর্যা দ্বারা আমার উপর প্রতিশোধ নিতে নগরের প্রান্তে এক তপস্বীদের আশ্রমে গমন করেন। এই সময় অম্বার পিতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন ও পরে তাঁর সখা মহাতপস্বী পরশুরাম সেখানে উপস্থিত হয়ে অম্বার সমস্ত ঘটনা অবগত হন। পরশুরাম আমাকে ডেকে পাঠিয়ে অম্বাকে গ্রহণ করতে বলেন। তিনি আমার গুরু। আমি তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমার পক্ষে অম্বাকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। এরপর আমাদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ বহুদিন চলেছিল। শেষে দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মুনিগণের মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁদের নিকট জানতে পারি আমরা পরস্পরের অবধ্য। আমি এগিয়ে এসে পরশুরামকে প্রণাম করলে তিনি সস্নেহে বললেন, ভীষ্ম, তোমার সমান ক্ষত্রিয় বীর পৃথিবীতে নেই। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি এখন যেতে পার।

আমাকে বধ করতে অসমর্থ হয়ে পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চলে এলেন। আর অম্বা আমার বধের নিমিত্ত যমুনাতীরে কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে অম্বাকে বর দিলেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়ে ভীষ্মকে বধ করতে পারবে। তুমি দ্রুপদ রাজের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং পরে পুরুষ হবে।

অম্বা তখন নবজন্ম কামনায় চিতারোহণে দেহ ত্যাগ করলেন।

সেই সময় সন্তানহীন দ্রুপদরাজ মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে বর পেলেন তাঁর একটি স্ত্রীপুরুষ সন্তান হবে। যথাসময়ে দ্রুপদ মহিষী এক কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। কিন্তু তিনি প্রচার করলেন তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। নবজাতক সন্তানের নাম রাখলেন শিখন্ডী। পুত্র সন্তানের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়ে যৌবন প্রান্তে শিখন্ডীর দশার্নরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে বিবাহ হল। দ্রুপদ মহিষীর বিশ্বাস ছিল মহাদেবের বর মিথ্যা হবে না; শিখন্ডী পুরুষই হবে। অচিরেই সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেল। হিরণবর্মা

দ্রুপদরাজের প্রতারণায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ধ্বংস করবেন বলে ঘোষণা করলেন। পিতামাতার এই বিপদের জন্য শিখণ্ডী নিজেকে দায়ী মনে করে গৃহ ত্যাগ করে বনে চলে এলেন। সেখানে তাঁর অনুরোধে এক যক্ষ শিখণ্ডীর সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময় করল। শিখণ্ডী পুরুষ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে কুবেরের অভিশাপে যক্ষ স্ত্রী হয়েই রইল ; আর দ্রুপদকন্যা থাকল পুরুষ হয়ে। শিখণ্ডী দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করে এখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর। কাশীরাজের কন্যা অম্বাই শিখণ্ডী। আমার প্রতিজ্ঞা আছে স্ত্রীলোককে, স্ত্রী থেকে পুরুষ হয়েছে এমন লোককে এবং স্ত্রীনাম ধারী ও স্ত্রীরূপধারী পুরুষকে আমি শরাঘাত করব না যেহেতু শিখণ্ডী পূর্বে স্ত্রী ছিল সেজন্য সে আমার বধ্য নয়।

ভীষ্ম-বর্ণিত উভয় পক্ষীয় বীরদের শক্তির পরিমাপ ও অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাসের মধ্যে বহু তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য নিহিত আছে। আমরা জানি ভীষ্ম পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্খী। তিনি সর্বদা ধার্তরাষ্ট্রগণের কার্যকলাপের নিন্দা করে এসেছেন। সেই ভীষ্মই আবার কৌরব বাহিনী সেনাপতি পদে অভিষিক্ত। যেহেতু তিনি হস্তিনাপুর রাজ সিংহাসন রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আপন জীবিকার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, সেজন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কৌরবপক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাই ন্যায় সঙ্গত মনে করেছেন। দুর্যোধন প্রধানত পিতামহ ভীষ্ম ও সখা কর্ণের উপর নির্ভর করেই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে এই মহাযুদ্ধে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছেন। আসন্ন যুদ্ধের সাফল্য অনেকাংশে এই দুই মহাশক্তিধর যোদ্ধার ঐক্যমতের উপর নির্ভরশীল। আশ্চর্যের বিষয় ভীষ্মের ন্যায় একজন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই অমোঘ সত্যটি ভুলে গেলেন। তাও আবার যুদ্ধের মাত্র একদিন পূর্বে। তিনি উভয় পক্ষের রথী ও অতিরথদের বর্ণনা করতে গিয়ে কর্ণের সম্মুখেই তাঁকে অপমান করে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলেন। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে যে কর্ণ জীবিত ফিরবেন না সে কথাও ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। কথাগুলি সবই বিভেদ সৃষ্টিকারী ও মানসিক শক্তি বিনষ্টকারী। কর্ণের মত মহাবীরকে অর্ধরথ বলার মধ্যে কোনই যুক্তি ছিল না। যখন ঐক্যের প্রয়োজন, তখন বিভেদ সৃষ্টি ও মনোবল ভঙ্গের অর্থ শত্রুকেই সাহায্য করা। স্বভাবতঃই ভীষ্মের ব্যবহার সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না। কর্ণই ভীষ্মের বাক্যের তাৎপর্য বুঝতে পারেন। কার্যতঃ ভীষ্মকে পাণ্ডবদের চর আখ্যা দিয়ে তিনি দুর্যোধনকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে পরিত্যাগ করতে। কর্ণের এ অনুরোধ অসঙ্গত হয় নি। দুর্যোধনও কর্ণের প্রতি ভীষ্মের ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কর্ণেরও এই যুদ্ধে ভীষ্মের ন্যায়ই এক বিশেষ ভূমিকা আছে তা ঘোষণা করতে ভুললেন না। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হলই। কৌরব সেনানীদের মধ্যে এক হতাশার সৃষ্টি হল। ভীষ্মের কটুক্তির প্রতিবাদে তাঁর জীবদ্দশায় কর্ণের যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্তে পাণ্ডবদেরই লাভ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের পাণ্ডব-অনুকূল পদক্ষেপগুলি কর্ণের মন্তব্যের যাথার্থ প্রমান করে।

উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দের শক্তির পরিচয় জানা দুর্যোধনের প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে এ সংবাদের গুরুত্ব যথেষ্ট। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই তথ্যসমূহ দুর্যোধন সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেন নি।

অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস জানার বিষয়ে গুপ্তচরদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ভীষ্ম নিজেই প্রকাশ করেছেন তিনি গুপ্তচরদের জড়, অন্ধ ও বধিরের ছদ্মবেশে পাঞ্চালরাজ্যে প্রেরণ করতেন। তারাই সকল সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করে হস্তিনাপুরে তাঁর নিকট পাঠাতেন। পাণ্ডবগণ যে শিখণ্ডীকে ভীষ্মবধে ব্যবহার করতে পারেন তাহা জেনেও কৌরব রথীরা তাঁকে ভীষ্মের দৃষ্টির বাইরে আবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শিখণ্ডীরূপী অম্বার প্রতিজ্ঞাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হল। শিখণ্ডীকে দর্শন করে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং সে কারণেই তাঁর পতন হয়। শিখণ্ডীকে বাধা দিতে না পারা কৌরবদের একটি বড় ব্যর্থতা।

পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডবই প্রথমশ্রেণীর যোদ্ধা। তাঁদের উপরই জয়পরাজয় নির্ভরশীল। কিন্তু কৌরব সেনাপতি ভীষ্ম তাঁদের উপর শরাঘাত করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তা কৌরবদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কী? অথচ অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার শক্তি কৌরবপক্ষে দ্রোণাচার্য ও কর্ণ ব্যতিরেকে ভীষ্মেরই ছিল। যুদ্ধবিগ্রহে ব্যক্তিগত স্নেহ ভালবাসার যে কোন স্থান নেই সে কথা যুদ্ধ বিশারদ ভীষ্ম ভুলে গেলেন। অর্জুন কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম ও শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে শরাঘাত করতে কুণ্ঠিত হন নি। কারণ তিনি রাষ্ট্রনির্ধারিত উদ্দেশ্য সফল করতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রতিপক্ষীয় সেনানায়কদের সঙ্গে পূর্বের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর যুদ্ধকালীন কর্তব্যে কোন বাধা সৃষ্টি করতে দেন নি। দুর্ভাগ্য দুর্যোধনের, ভীষ্মের মত একজন পাণ্ডব হিতৈষীকেই তাঁর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় জ্ঞাতসারে কোন রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যুদ্ধের সময় এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন নি। কর্ণের পরামর্শ শুনে ভীষ্মকে পরিত্যাগ করলে পাণ্ডবদের জয় বোধ হয় এত সহজ হত না। কিন্তু কাজটি তখন দুর্যোধনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আজকের দিনে কোন সেনাধ্যক্ষের ভীষ্মের ন্যায় আচরণ, ক্ষমার অযোগ্য বিবেচিত হত সন্দেহ নেই।

আরও একটি কথা এখানে না এসে পারে না। ভীষ্ম নীতিবান ও সত্যাশ্রয়ী বলে খ্যাত। তিনি যখন বুঝলেন তাঁর পক্ষে পাণ্ডবদের উপর শরক্ষেপ করা সম্ভব হবে না, তখন তিনি নীতিগত কারণে সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারতেন। তা তিনি করলেন না। সেনাপতির পদগ্রহণ করে অনেকটা খেয়াল খুশী মত যুদ্ধ করে অগণিত সাধারণ পাণ্ডব সেনা নিহত করলেন। যুদ্ধের রীতিনীতি ভঙ্গ করে যেন পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত করতেই পঞ্চপাণ্ডবের উপর শরক্ষেপে বিরত রইলেন। এই কি তাঁর সত্যনিষ্ঠার পরিচয়? হস্তিনাপুর রাজসিংহাসন রক্ষার প্রতিজ্ঞারই বা কী হল?

পূর্বাপর ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় এ সবই ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও বিদুরের ষড়যন্ত্রের ফল

এবং বিদুরই এই ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবক ও নির্বাহক। দুর্যোধন এই ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাষ পেয়েও নিজ পক্ষের স্বার্থরক্ষায় উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলেন। রাজপ্রাসাদের ভিতরের এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে দুর্যোধনের গোয়েন্দাদের কোনপূর্ব সংবাদ ছিল কি না জানা যায় নি। না থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বিদুরের বিশ্বস্ত চরগণ হয়তো দুর্যোধনের হয়ে কাজ করে তাঁকে বিকৃত তথ্য সরবরাহ করেছিল। স্পষ্টতই পরস্পর বিরোধী সংবাদের জন্য দুর্যোধনের পক্ষে সঠিক পন্থা নিরুপণ করা সম্ভব হয় নি।

পরদিন প্রভাতে কৌরবশিবিরে দুর্যোধন যুদ্ধবিষয় আলোচনা কালে পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সেনানীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কতদিনের মধ্যে পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন?

উত্তরে ভীষ্ম বললেন, আমার একমাস সময় লাগবে। দ্রোণাচার্য বললেন, আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসের মধ্যে পাণ্ডব বাহিনী বিনষ্ট করতে সমর্থ হব। কৃপাচার্য বললেন, আমার দুই মাস সময় লাগবে। অশ্বত্থামা বললেন, আমি দশ দিনে এ কাজ সম্পাদন করতে পারি। কর্ণ বললেন, আমার সময় লাগবে মাত্র পাঁচ দিন।

কর্ণের কথায় ভীষ্ম উচ্চ হাস্য করে বললেন, রাধেয়! তুমি বাসুদেবের সঙ্গে রথারোহী অর্জুনের সম্মুখীন কখনও হও নি, তাই যা খুশী বলে যাচ্ছ।

উভয় শিবিরে অপর পক্ষের গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। যুধিষ্ঠিরের গুপ্তচরগণ অচিরেই এই আলোচনার বিষয়বস্তু তাঁকে জানাল। অর্জুন সব শুনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কৌরব যোদ্ধারা নিজেদের সামর্থ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সবই সত্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাসুদেবের সহায়তায় একাকীই আমি ত্রিলোক সংহার করতে পারি। সকল দিব্যাস্ত্র আমার অধিকারে। কিন্তু দিব্যাস্ত্র দ্বারা লোক হত্যা অনুচিত বিবেচনায় আমরা সরল উপায়ে স্বকীয় বীরগণের সহায়তায় শত্রুদের পরাভূত করব।

অতঃপর উভয়পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র মিলিত হয়ে যুদ্ধের নিম্নলিখিত নিয়মাবলী নির্ধারিত করলেন ঃ

(১) সমযোগ্য ব্যক্তিরা কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে পরস্পরের ন্যায় ন্যায় যুদ্ধ করবে।

(২) যুদ্ধশেষে নিজেদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে।

(৩) বাগযুদ্ধ আরম্ভ হলে বাক্যদ্বারাই যুদ্ধ করতে হবে।

(৪) পলায়নকারী সৈনিককে আক্রমণ করা যাবে না।

(৫) রথী রথীর সঙ্গে, গজারোহী গজারোহীর সঙ্গে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে ও পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ করবে।

(৬) অগ্রে সতর্ক করে তবেই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা যাবে ; কিন্তু বিশ্বস্ত বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করা যাবে না।

(৭) অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধে অনিচ্ছুক, অস্ত্রহীন বা বর্মহীন ব্যক্তিকে

আঘাত করা যাবে না।

(৮) সারথী, ভারবাহক, স্তুতিপাঠক এবং ভেরী ও শঙ্খবাদককে আঘাত করা যাবে না।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বদিন রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদের এক নির্জন কক্ষে বিষন্নচিত্তে যুদ্ধে নিজপুত্রদের বিপদের কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময় ত্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, বৎস! এই যুদ্ধে তোমার পুত্রগণ ও বহুরাজন্যবর্গ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কাল প্রভাতেই এমন হবে। অতএব শোক প্রশমিত কর। যদি তুমি যুদ্ধ দেখতে বাসনা কর তবে আমি তোমায় দিব্যদৃষ্টি দিতে পারি।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে তপোধন, আমি জ্ঞাতিবধ দর্শন করতে চাই না। আপনার প্রসাদে এই যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।

বাসদেব তখন সারথী সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, এই সঞ্জয় যুদ্ধের সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে তোমকে জানাবে। সঞ্জয় শস্ত্রে আহত হবে না, কোন পরিশ্রমেই ক্লান্ত হবে না। যুদ্ধে অক্ষত থাকবে। যুদ্ধশেষে আমি কৌরব ও পান্ডবদের কীর্তিগাথা সর্বত্র প্রচার করব। ধৃতরাষ্ট্র, তুমি এখনও এই যুদ্ধ নিবারণ করতে সক্ষম। জ্ঞাতিবধরূপ এই হীন কার্য তুমি সংঘটিত হতে দিও না। পান্ডবগণ তাঁদের রাজ্য লাভ করুক, কৌরবগণ শান্ত হোক।

ধৃতরাষ্ট্র উত্তরে বললেন, পিতা, আমাকে মার্জনা করুন। আমি অসহায়। পুত্রগণ আমার বশবর্তী নয়।

ব্যাসদেব বললেন, সাম ও দান নীতিদ্বারা আরব্ধ জয়ই শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা যাহা হয় তা মধ্যম এবং যুদ্ধ দ্বারা যা হয় তা অধম। সৈন্যবল থাকলেই জয়লাভ সম্ভব নয় ; জয়পরাজয় দৈবের উপর নির্ভরশীল। পূর্বে যারা বিজয়ী হয়েছে তারাই আবার পরাজিত হতে পারে।

পরদিন প্রভাতে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে কৌরব ও পাণ্ডব বাহিনী নানা আয়ুধে সজ্জিত হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হল। ব্যূহবদ্ধ বিরাট কৌরব বাহিনী দর্শনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, হে ধনঞ্জয়, দেবগুরু বৃহস্পতি বলেছেন, নিজ সৈনদল ক্ষুদ্র হলে তাদের সংহত করে যুদ্ধ করবে। সৈন্যদল অধিক হলে তাদের ইচ্ছামতবিস্তার করবে। আমাদের সৈন্যদল বিপক্ষের তুলনায় ক্ষুদ্র। সে জন্য মহর্ষি বৃহস্পতির উপদেশমত সূচিব্যূহ রচনা কর। অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বিধানমত দুর্ভেদ্য 'অচল' ও 'বজ্র'(কখনও সূচিব্যূহের ন্যায় সৈন্যদলকে সংহত করা আবার কখনও বিপক্ষের সমক্ষে সৈন্যদল বৃহৎ বলে বোধ হয় সেইভাবে বিন্যস্ত করা) ব্যূহ রচনা করছি। অর্জুনের কথায় আশ্বস্ত না হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, ধনঞ্জয়, পিতামহ ভীষ্মের নেতৃত্বে সুসজ্জিত কৌরব বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা কেমনে যুদ্ধ করতে সমর্থ হব? আমি ভীষ্মের অভেদ্য ব্যূহ দর্শন করে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। অর্জুন বললেন, মহারাজ, সত্য, অনিষ্ঠুরতা,

ধর্ম ও উদ্যম দ্বারা যে জয়লাভ হয়ে থাকে, বলবীর্যদ্বারা সেরকম হয় না। আপনি সকল প্রকার অধর্ম ও লোভ পরিত্যাগ করে অহংকারশূন্য হয়ে উদ্যমের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আমরা জানি যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। ধর্মের প্রতীক বাসুদেব আমাদের সহায়, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

এরপর বাসুদেবের নির্দেশে যুধিষ্ঠির শত্রুর পরাজয় মানসে দুর্গাস্তব করলেন। দেবী দুর্গা স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে অন্তরীক্ষ হোতে বললেন, হে বীর, তুমি শীঘ্রই শত্রুজয় করতে সক্ষম হবে। কারণ স্বয়ং নারায়ণ তোমার সহায়।

এমন সময় যুদ্ধারম্ভের সূচনা করে পিতামহ ভীষ্ম উচ্চৈঃ স্বরে শঙ্খধ্বনি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রণবাদ্য তুমুল শব্দে বেজে উঠল। বাসুদেব তখন পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমসেন পৌণ্ড্র শঙ্খ, যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মনিপুষ্পক শঙ্খ এবং শিখণ্ডী প্রমূখ অন্যান্য বীরগণ পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজালেন। শঙ্খধ্বনির পর অর্জুন কৌরব যোদ্ধাদের দর্শনের মানসে সারথী কৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ সেইমত রথ স্থাপন করলে উভয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র সখা, শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্তান করছেন দেখে অর্জুন বিষণ্ন মনে বললেন, হে কৃষ্ণ, আমি এই আত্মীয়গণকে নিহত করা শ্রেয়কর মনে করছি না। আমি জয়লাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করছি। রাজ্যলাভের আমার কোন বাসনা নেই। হে মাধব, স্বজন বধ করে আমরা কীভাবে সুখী হব?

এইভাবে গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার নানা কারণ দেখিয়ে অর্জুন অবশেষে শোকাকুল চিত্তে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়লেন।

তখন কৃষ্ণ অশ্রুসিক্ত বিষণ্ন অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, এই সঙ্কটকালে অনার্য-জনোচিত অযকস্কর তোমার এই মোহ কোথা হতে উপস্থিত হল? তুমি কাতর হয়ো না। এরূপ পৌরুষহীনতা তোমার শোভা পায় না। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও।

অর্জুন বললেন, মধুসূদন, আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে কি ভাবে শরাঘাত করব? গুরুজনদের বধ করা অপেক্ষা ভিক্ষায় জীবিকা নির্বাহ করাও শ্রেয়। প্রকৃত ধর্ম কি সে সম্বন্ধে আমি বিমূঢ় হয়েছি। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে উপদেশ দাও।

কৃষ্ণ হেসে বললেন, পার্থ, তুমি প্রাজ্ঞের ন্যায় বড় বড় কথা বলছ; কিন্তু প্রজ্ঞার লক্ষণ তোমার মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যাদের জন্য শোক করা অনুচিত তুমি তাদের জন্য শোক করছ। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী মৃত কি জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না। দেহধারী ব্যক্তি কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়ে শেষে দেহান্তরিত হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না। যিনি সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাঁকে অবিনাশী

বলে জানবে। কেউই এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করতে পারে না। ইনি জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়, অনাদি! শরীর হত হলে এই আত্মা হত হয় না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে। সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর প্রাপ্ত হন। শস্ত্র ইঁহাকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারেনা, জলও তাঁকে আর্দ্র করতে পারে না। যে জন্মগ্রহণ করেছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃতব্যক্তির পুনর্জন্মও অবধারিত। অতএব এই অনিবার্য পরিণতির জন্য শোক করার কোন কারণ নেই। আর স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি দিলেও তোমার ভীত-প্রকম্পিত হওয়া উচিত নয়। ধর্মযুদ্ধ বিনা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নেই। এই ধর্মযুদ্ধ হতে বিরত হলে তুমি স্বধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে পাপগ্রস্থ হবে। মনে রেখো সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। অন্যান্য মহারথগণ মনে করবেন তুমি ভয়বশতঃই যুদ্ধে বিরত হয়েছ। তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থের নিন্দা করে তোমার বিরুদ্ধে নানা বিরুপ মন্তব্য করবে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে? যুদ্ধে হত হলে স্বর্গসুখ ভোগ করবে, বিজয়ী হলে সমস্ত পৃথিবী উপভোগ করবে। সে জন্য সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হও।

এরপর কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যাখ্যা করে বললেন, এই ধর্মের অল্পমাত্র আচরণও মহাভয় হতে পরিত্রাণ করে। হে অর্জুন, বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক— জীবের সংসার-আসক্তিরই প্রতিপাদক। তুমি ত্রিগুণের ভাব অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় লও। কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। কর্মের ফল কামনা করো না, নিষ্কর্মাও হয়ো না। হে ধনঞ্জয়, ফলাশক্তি বর্জন করে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করে তুমি কর্ম কর। সমত্ব বুদ্ধিকেই যোগ বলে। ত্রিলোকে আমার কোন কর্তব্য নেই; তথাপি আমি লোকশিক্ষার জন্য কর্মে নিযুক্ত আছি। স্বধর্ম গুণহীন হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও ভাল; কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। হে ভারত, সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আমি নিজ মায়াবলে জন্ম গ্রহণকরি। যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি দেহ ধারণ করে মর্ত্যে আগমন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কৃষ্ণ ধর্মার্থ বিষয়ে নানা উপদেশ প্রদান করে অর্জুনের অনুরোধে বিশ্বরূপ ধারণ করলেন। বিশ্বরূপ দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত হয়ে অর্জুন কৃতাঞ্জলীপুটে বললেন, হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবগণ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিবিধ সৃষ্ট-পদার্থ, সৃষ্টি-কর্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, নারদাদি দিব্য ঋষিগণ এবং অনন্ত তক্ষকাদি সর্পগণকে দেখছি। বহু বাহু, উদর ও নেত্রবিশিষ্ট তোমার অনন্তরূপ সকল দিকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও দেখছি না। কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন

দুর্নিরীক্ষ্য, অপরিমেয়, তোমার অদ্ভুত মূর্তি সর্বদিকে দর্শন করছি। তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই বিশ্বের আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক, তুমিই অব্যয় সনাতন পুরুষ— সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই। হে মহাবাহো, বহু মুখ, নেত্র, বাহু, উরু, পদ ও উদর বিশিষ্ট এবং বহু বৃহদাকার দন্ত সমন্বিত ভয়ঙ্করদর্শন এই সুবিশাল মূর্তি দর্শনে আমি ভীত হয়েছি। আমার দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে, আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও। রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধবৃন্দ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ঙ্কর দর্শন মুখবিহুরে ধাবিত হয়ে প্রবেশ করছে। পতঙ্গগণ মরণের জন্য যেমন অগ্নিতে প্রবেশ করে সেইরূপ সকল লোক মরণের জন্য তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে। হে বিষ্ণো! সমগ্র জগত তোমার তীব্র তেজরাশিদ্বারা সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে। উগ্রমূর্তি তুমি কে? আমাকে বল? তুমি কী কাজে প্রবৃত্ত হয়েছ বুঝতে পারছি না।

গীতোক্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে যে বিষয়টি আমাদের ন্যায় সংসারী জীবের সবচেয়ে প্রথমে মনে আসে তা হল কর্মযোগ। কোন মানুষই কর্মবিহীন অবস্থায় জীবন ধারণ করতে পারে না। কোন না কোন কাজ তাকে সম্পাদন করতেই হয়। এই কর্ম কী করে যোগে পরিণত করা যায় তা ব্যাখ্যা করে গীতায় বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষের কর্ম পৃথক; কিন্তু সব কর্মই মহৎ। কর্ম সম্পাদনের উপরই মানুষের পরিচয়, কর্মের উপর নয়। কর্মের দাস না হয়ে কর্মের প্রভু হয়ে আপন কতর্ব্য সম্পাদন করতে হবে। কর্ম করতে হবে সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, কোন প্রতিদানের আশা না করে । স্বার্থশূন্য হয়ে ভালবাসার সঙ্গে কর্ম সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত। কর্মে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কর্মযোগের লক্ষণ তিনটি— (১) ফলাকাঙ্খা বর্জন, (২) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ ও (৩) সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ। এরূপ নিষ্কাম কর্মের মধ্যেই কর্মবন্ধনের অবসান ঘটে। এ জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। সব কর্মই ঈশ্বরের, তাঁর ইচ্ছামতই কর্ম সম্পাদিত হয়। সেজন্য কর্মসম্পাদনে কোন প্রাপ্তি বা শাস্তির প্রশ্ন নেই। আত্মত্যাগ ও স্বার্থশূন্যতা হতে মনের সমতা আসে। সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ণ করতে সমর্থ হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই মহান কর্ম যোগের সামান্যতম অনুষ্ঠানও অশেষ ফলপ্রদ। রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। দেশ ও দশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি এই পথেই সম্ভব। ফলাকাঙ্খায় মন শত দিকে ধাবিত হয়ে একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান করেই অর্জুন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্যোধনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে জয়লাভ করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্যেই যে কেবল কর্মযোগের প্রতিফলন হয়েছিল তাই নয়, গুপ্ত সংবাদ আদান প্রদান প্রভৃতি বহু তথাকথিত সাধারণ কর্মের মধ্যেও

আমরা এই যোগের সফল অনুষ্ঠান দেখতে পাই। নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায় পাণ্ডব পক্ষের সকল অধস্তন কর্মীবৃন্দই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে তাদের নির্দিষ্ট কর্মসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিল। যুদ্ধে পাণ্ডবদের সাফল্যের মূলে ছিল এই অগণিত কর্মী বৃন্দের নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠান। যুদ্ধবিগ্রহে শত্রুর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমরা বহু ঘটনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষের চরদের সাফল্য লক্ষ্য করেছি। পাণ্ডবপক্ষের চরদের কর্মবোধ সম্বন্ধে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বৈতবনে বাস করার সময় যুধিষ্ঠির গোপনে দুর্যোধনের রাজ্য শাসন ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিক্ষোভ আছে কি না তা জানার জন্য একজন গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিলেন হস্তিনাপুরে। গুপ্তচর সংবাদ আনল, দুর্যোধনের শাসনে প্রজাবৃন্দ সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করছে, তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ নেই। এই সংবাদ দিয়ে গুপ্তচর বলল, গুপ্তচররাই রাজার চক্ষু, রাজাকে প্রতারণা করা তাদের কখনই উচিত নয়। রাজার পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক চরদের তা বলতেই হবে। বিকৃত সংবাদ পরিবেশন চরদের একটি অমার্জনীয় অপরাধ। যুধিষ্ঠির শান্ত মনে মহাশত্রু দুর্যোধনের সুখ্যাতি বিষয়ে গুপ্তচরের সংবাদ গ্রহণ করলেন। যুধিষ্ঠির ও তাঁর গুপ্তচর— উভয়েই সত্যাশ্রয়ী ও কর্মযোগী ছিলেন বলেই তা সম্ভব হল।

অর্জুন যেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন তখনই যুধিষ্ঠির একটি অদ্ভুত কার্য করলেন। তিনি নিজ কবচ ও আয়ুধসকল পরিত্যাগ করে রথ থেকে অবতরণ করে শত্রুসৈন্য মধ্যস্থ পিতামহ ভীষ্মের দিকে পদব্রজে অগ্রসর হলেন। অর্জুনাদি ভ্রাতাগণ হতবাক হয়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ! আপনি শত্রুগণের মধ্যে কোথায় যাচ্ছেন? যুধিষ্ঠির নিরুত্তর রইলেন। কৃষ্ণ হেসে বললেন, হে পাণ্ডবগণ, আমি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত আছি। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি গুরুজনদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

কৌরব বীরগণ যুধিষ্ঠিরের কাজকে কাপুরুষোচিত বলে মন্তব্য করলেন।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর চরণদ্বয় স্পর্শ করে বললেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! আপনার সহিত সংগ্রাম করব। আপনি অনুমতি দিন এবং আশীর্বাদ করুন।

ভীষ্ম বললেন, হে রাজন! অনুমতি গ্রহণ করতে না এলে আমি তোমাকে 'যুদ্ধে পরাজয় হোক' এই বলে শাপ প্রদান করতাম। আমি প্রীত হয়েছি। আশীর্বাদ করি যুদ্ধে জয়লাভ কর। এখন তোমার অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে পিতামহ! আপনি অপরাজেয়। আপনাকে সংগ্রামে কী ভাবে পরাজিত করব সেই বিষয়ে পরামর্শ দিন। আপনার বধোপায় বলুন।

ভীষ্ম বললেন, বৎস! আমাকে সমরে পরাজিত করতে পারে এমন কেহ নেই। এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় নি। তুমি পরে আমার নিকট এসো।

ভীষ্মের নিকট বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন,

হে দুর্দ্ধর্ষ! ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করব, এই প্রতিজ্ঞা করছি। আপনার আজ্ঞা বিনা কিরূপে শত্রুদের পরাজিত কবব?

দ্রোণাচার্য প্রীতিমনে বললেন, হে রাজন! নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আশীর্বদ করি, তোমার জয় হোক। তোমার কোন প্রার্থনা থাকলে বল।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনি যুদ্ধে অপরাজেয়। আপনার বধোপয় বলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত করুন।

দ্রোণাচার্য বললেন, যুদ্ধকালে আমি যখন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে অচৈতন্য হয়ে পড়ব তখন আমাকে বধ করা সম্ভব হবে।

কৃপাচার্যের নিকট উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, হে আচার্য, আজ্ঞা করুন, শত্রুদের পরাজিত কবি।

কৃপাচার্য বললেন, হে রাজন! আমি অবধ্য। তবে আশীর্বাদ করি যুদ্ধে জয়লাভ কর।

এরপর যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বললেন, হে মহারাজ! আপনি আমার হিতার্থী হয়ে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করুন।

শল্য বললেন, ভাগিনেয়, সংগ্রামে তোমার হিতসাধন কেমনে সম্পাদন করব, বল।

যুধিষ্ঠির বললেন, মাতুল, যুদ্ধকালে আপনি সূতপুত্র কর্ণের বল হ্রাস করবেন।

শল্য বললেন, তোমার অভিলাষ পুর্ণ হবে। তুমি নির্ভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

যুধিষ্ঠির প্রত্যাবর্তন করলে কৃষ্ণ কর্ণের নিকট গিয়ে বললেন, হে কর্ণ! তুমি ভীষ্ম বিরোধী, শুনলাম ভীষ্ম নিহত না হলে তুমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। তুমি এই সময় আমাদেব হয়ে যুদ্ধ কর। ভীষ্ম নিহত হলে তুমি কৌরবপক্ষে যোগ দিও।

কর্ণ কৃষ্ণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বললেন, হে কেশব, আমি দুর্যোধনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারব না। দুর্যোধনের জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি।

কৃষ্ণ তখন ফিরে এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

॥ তের ॥

এরপর কৌরব ও পাণ্ডব সেনার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের উন্মাদনায় দুই সৈন্য দলে বিভক্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ কাউকেও চিনতে পারল না। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হল। বিরাটপুত্র উত্তর মদ্ররাজ শল্যের অস্ত্রাঘাতে নিহত হলেন। বিরাট রাজের অপর পুত্র শ্বেত ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে শল্যকে আক্রমণ করলে ভীষ্ম মন্ত্র সিদ্ধ বাণ দ্বারা তাঁকে শরশায়ী করলেন। ভীষ্মের শরাঘাত সহ্য করতে না পেরে পাণ্ডব সেনা পলায়নপর হল। প্রথম দিনের যুদ্ধে কৌরব পক্ষই জয়ী হলেন।

যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির হতাশ হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, হে বাসুদেব! পিতামহ ভীষ্ম

ভাবে আমাদের সৈন্যদের দগ্ধ করে চলেছেন তাতে মনে হচ্ছে আমাদের সমগ্র সৈন্যদল তাঁরই হস্তে বিনষ্ট হবে। এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয় তা স্থির কর।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার ভ্রাতাগণ মহাবলে বলীয়ান্। আমি ও অন্যান্য বহু নৃপতিবৃন্দ আপনার হিতাকাঙ্খী। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার সেনাপতি পদে নিযুক্ত আছেন। মহারাজ শিখণ্ডী নিশ্চয়ই ভীষ্মকে সংহার করবেন।

পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন অতঃপর ক্রৌঞ্চারণ (ক্রৌঞ্চ অর্থ বক। বকেরা যেমন পঙ্ক্তি বদ্ধ হয়ে গমন করে, তদ্রূপ সৈন্যসজ্জা) নামক ব্যূহ রচনা করে অর্জুনকে সম্মুখে রেখে আগামীকালের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে অর্জুন অগণিত শত্রুসৈন্য নিহত করলেন। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গেও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল। ভীমসেনের হস্তে কলিঙ্গরাজ ও তাঁর পুত্রসহ বহু কলিঙ্গ বীর. জীবন হারালেন। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেনের রথাশ্ব বিনষ্ট করে ফেললেন। ভীমসেন তখন আশ্রয় নিলেন ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে। মহাবীর সাত্যকি ভীষ্মের সারথীকে বধ করলে অশ্বগণ রথস্থ ভীষ্মকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে এল। অর্জুন ও অভিমন্যুর শরাঘাত সহ্য করতে না পেরে কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ চারিদিকে পলায়ন করতে লাগল। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবদেরই জয় হল।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধের জন্য উভয়পক্ষই ব্যূহবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হল। কৌরবপক্ষ গরুড়ব্যূহ (এই ব্যূহে সারি দিয়ে সাজান সৈন্যের অগ্র ও পশ্চাৎভাগ সূক্ষ এবং মধ্যভাগ অতিশয় স্থূল হবে) রচনা করলেন। ব্যূহের সম্মুখে থাকলেন স্বয়ং সেনাপতি ভীষ্ম। অন্য দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহিত পাণ্ডব সৈন্যদলের দক্ষিণে অবস্থান করলেন ভীমসেন ও বামে অর্জুন। সেদিনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ভীমসেনের আঘাতে দুর্যোধন সংজ্ঞাহীন হয়ে সারথীর সহায়তায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। পলায়নপর অসংখ্য কৌরব সেনা ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডব বীরদের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করল। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য বহু চেষ্টা করেও তাঁদের রক্ষা করতে সমর্থ হলেন না। পরে সুস্থ হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, পিতামহ, আপনি, সপুত্র দ্রোণাচার্য ও মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য জীবিত থাকতে কৌরবসেনা পলায়ণ করছে, এর চেয়ে অপযশের বিষয় আর কী হতে পারে? সৈন্যদের প্রতি আপনাদের উপেক্ষা দেখে মনে হয় পাণ্ডবদের অনুগ্রহ করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। আমি কেবল আপনার ও দ্রোণাচার্যের উপর নির্ভর করেই কর্ণের সঙ্গে এই সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছি। আমি আপনাদের দ্বারা পরিত্যাজ্য না হলে আমার অনুরোধ আপনারা নিজ নিজ বিক্রমানুসারে যুদ্ধ করুন। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ বাক্যে .বললেন, হে রাজন! আমি পূর্বেই বলেছি পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি পুরগণেরও অজেয়। তথাপি আমি কথা দিচ্ছি পাণ্ডবদের প্রতিহত করতে সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটি করব না।

এরপর ভীষ্ম তাঁর বলবীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পাণ্ডব সেনাদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলেন। পাণ্ডব বীরগণ তাঁকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেন। সমগ্র পাণ্ডব

বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য মনে করে কৃষ্ণ নিজেই সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হয়ে বললেন, হে ভীষ্ম, তুমিই ওই মহাক্ষয়ের মূল কারণ। দ্যূতাসক্ত নৃপতিকে নিবারণ করা সকল ধর্মানুগ মন্ত্রীর ই অবশ্য কর্তব্য। রাজা সদুপদেশ গ্রহণ না করলে তাঁকে পরিত্যাগ করা উচিত। তুমি তা করনি। উপরন্তু তুমি সেই দুরাত্মার পক্ষেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছ। ভীষ্ম বললেন, হে জনার্দন, আমি ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার এই উপদেশই দিয়েছি। কিন্তু পুত্রদের প্রতি দুর্বলতা বশতঃ তিনি আমার বাক্যে কর্ণপাত করেন নি। মনে হচ্ছে দৈবই বলবান। অর্জুন তখন কৃষ্ণের চরণদ্বয় ধারণ করে বললেন, হে কেশব! তুমি তোমার চক্র সংবরণ কর। কথা দিচ্ছি পূর্বপ্রতিজ্ঞামত তোমার নির্দেশানুসারে আমি সমস্ত কুরুকুল সমূলে বিনষ্ট করব। কৃষ্ণ শান্ত হয়ে রথে আরোহণ করলে অর্জুন মহাবিক্রমে যুদ্ধ করে একাই কৌরব পক্ষীয় বীরদের পরাজিত করলেন। এই দিনের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদেরই জয় হল।

চতুর্থ দিনের যুদ্ধে ভীমসেন যুদ্ধক্ষেত্রে এক নিদারুণ তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন পুত্র তাঁর অস্ত্রাঘাতে নিহত হল। অন্যান্য পুত্রগণ ভীমসেনের পরাক্রম দেখে ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করল। প্রাগজ্যোতিষেশ্বর মহাবীর ভগদত্তের সঙ্গেও ভীমসেনের যুদ্ধ হল। ভগদত্তের শরাঘাতে ভীমসেন আহত হলে পুত্র ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করল। কৌরব বীরগণ ঘটোৎকচের বিক্রম দেখে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে সাহস করলেন না। রণস্থল পরিত্যাগ করাই উচিত মনে করলেন। কৌরবপক্ষের অগণিত সেনা হতাহত হল। সেদিনের যুদ্ধেও পাণ্ডবদেরই জয় হল।

পঞ্চম দিনের যুদ্ধের জন্য কৌরবপক্ষ রচনা করলেন মকরব্যূহ। (মকর ব্যূহে সৈন্যদলের অগ্র ও পশ্চাদ ভাগ বিপুল ও মধ্যভাগ সূক্ষ্ম করা হয়। অগ্র ও পশ্চাতভাগে আক্রমনের সম্ভাবনায় এরূপ ব্যূহের প্রয়োজন হয়।) ভীষ্ম নিজে এই ব্যূহের চর্তুদিক রক্ষায় নিযুক্ত হলেন। অপর দিকে পাণ্ডবগণ রচনা করলেন শ্যেন ব্যূহ। (শ্যেন অর্থাৎ বাজপাখীর আকৃতি অনুসারে এইব্যূহের সম্মুখভাগ সূক্ষ, শেষভাগ অপেক্ষাকৃত কিছুটা স্থূল এবং দুই পার্শ্বদেশ বিস্তীর্ণ হবে।) ভীমসেন অর্জুন প্রমূখ পাণ্ডববীরগণ ব্যূহের বিভিন্ন দিক রক্ষায় নিযুক্ত থাকলেন। সেদিন ভীষ্মের নেতৃত্বে কৌরব বাহিনীর সঙ্গে পাণ্ডব বাহিনীর এক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হল। বহু সময় পর্যন্ত এই সংগাম চলল। শেষ পর্যন্ত ভীষ্মের আক্রমণের মুখে পাণ্ডব সেনা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল।

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডব বীরদের আক্রমনে কৌরব সেনার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হল। দ্বিখণ্ডিত হল দুর্যোধনের রথের ধ্বজা। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসহ বেশ কয়েকজন কৌরব বীর যুদ্ধে নিহত হলেন।

যুদ্ধ শেষে দুর্যোধন কৌরবপক্ষের ক্রম বর্ধমান ক্ষয়ক্ষতি দর্শনে ভীত হয়ে ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেনের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি। পাণ্ডবদের বিনষ্ট করার জন্য আমি আপনারই উপর নির্ভর করে আছি। শত্রুনিধনে

যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আশ্বাস দিয়ে ভীষ্ম বললেন, বিপক্ষের কথা দূরে থাকুক, আমি তোমার জন্য দেব, দৈত্য ও অন্যান্য সকলকে দগ্ধ করে ফেলব। দুর্যোধন ভীষ্মের কথায় প্রীত হয়ে সৈন্যদলকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন।

সপ্তম দিনের যুদ্ধে দ্রোণের শরে বিরাটপুত্র শঙ্খ নিহত হলেও ভীমসেন, অর্জুন, সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ বহু কৌরব সেনা ধ্বংস করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করলেন। সম্মুখ যুদ্ধে প্রধান প্রধান কৌরব বীরগণ পরাজিত হলেন।

এদিকে সপ্তম দিবসের যুদ্ধেও ভীষ্ম পাণ্ডবদের বধ করতে সমর্থ হলেন না দেখে দুর্যোধন অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর অশেষ পীড়াপীড়িতে ভীষ্ম মন্ত্রপূত পাঁচটি শর পাণ্ডবদের বধের জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন অষ্টমদিনের যুদ্ধে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি কিন্তু গোপন থাকল না। চর মারফত অচিরেই তা পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছল। কৃষ্ণের মন্ত্রণায় অর্জুন অবিলম্বে দুর্যোধনের শিবিরে গমন করে ঘোষ পল্লীতে দেয় প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে তাঁর মাথার মুকুট প্রার্থনা করলেন। দুর্যোধন প্রতিশ্রুতিমত নিজমুকুট অর্জুনের হস্তে তুলে দিলেন। অর্জুন সেই মুকুট পরিধান করে দুর্যোধনের ছদ্মবেশে ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রপূত মৃত্যুবাণ পাঁচটি প্রার্থনা করে বললেন, পঞ্চপাণ্ডব বধের এই অপ্রীতিকর কাজটি তিনিই সম্পাদন করবেন— পিতামহ ভীষ্মকে তা করতে হবে না। দুর্যোধন মনে করে ভীষ্ম বাণগুলি অর্জুনকে প্রদান করলেন। ব্যর্থ হল ভীষ্মের পাণ্ডব বধ পরিকল্পনা।

অষ্টম দিনের যুদ্ধেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হল না। ভীমসেনের আক্রমনে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের আরও অনেকে প্রাণ হারাল। ভ্রাতৃবধে কাতর হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, ভীমসেন আমার ভ্রাতাদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। কৃতসংকল্প হয়ে যুদ্ধ করেও আমাদের সৈন্যদল শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছে না; তারা অগণিত সংখ্যায় নিহত হচ্ছে। আর এসব ঘটছে আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও। স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে আপনি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। এখন বুঝতে পারছি আপনার উপর নির্ভর করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আমি ভুল করেছি। ভীষ্ম বললেন, হে দুর্যোধন! আমরা তোমায় বার বার নিষেধ করেছিলাম এই যুদ্ধে অগ্রসর না হতে। তুমি আমাদের হিতবাক্যে কর্ণপাত করনি। তবে কথা দিচ্ছি, আমি কোন অবস্থাতেই রণস্থল পরিত্যাগ করব না। দ্রোণাচার্যও রণে ক্ষান্ত হবেন না। আমি যাকে সম্মুখে পাব তাকেই হত্যা করব। তুমি দৃঢ়সংকল্প হয়ে যুদ্ধ কর।

এই দিনের যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীরদের মধ্যে যাঁরা নিহত হলেন তাঁরা হলেন ধৃতরাষ্ট্রের সাত পুত্র, শকুনির ভ্রাতাগণ ও অর্জুনের পুত্র ইরাবাণ (অর্জুন-পত্নী নাগরাজ কন্যা উলূপীর গর্ভে জন্ম)। ভীমপুত্র ঘটোৎকচের অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন এদিনের যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শিবির মধ্যে দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন একত্র হয়ে পাণ্ডবদের পরাজয়ের

উপায় নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। দুর্যোধন বললেন, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় ভীষ্ম দ্রোণাদি বীরশ্রেষ্ঠগণ আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আমরা পরাজিত হচ্ছি। বোধ হচ্ছে পাণ্ডবগণ দেবতাদেরও অবধ্য। কর্ণ বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবদের প্রতি পিতামহ ভীষ্মের সহানুভূতির কথা সর্বজন বিদিত। নিজের রণ-নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁর দম্ভের শেষ নেই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর ক্ষমতা যথেষ্ট সীমিত। এমতাবস্থায় ভীষ্মের পক্ষে পাণ্ডবদের পরাজিত করা কী ভাবে সম্ভব হবে? আপনি এখনই ভীষ্মকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করুন। ভীষ্ম প্রকৃতপক্ষে আমাদের জয়লাভের বাধা স্বরূপ। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলে আমি নিজেই পাণ্ডবদের ধ্বংস করব।

কর্ণের সঙ্গে একমত হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মের নিকট গমন করে বললেন, পিতামহ, আপনি যদি পাণ্ডবদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বা আমার প্রতি দ্বেষবশতঃ বা আমার মন্দ ভাগ্যের জন্য তাঁদের নিধনে অসমর্থ হন, তবে মহাবীর কর্ণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করুন। তিনি সবান্ধব পাণ্ডবদের পরাজিত করতে সমর্থ হবেন।

ভীষ্ম ক্রোধ সংবরণ করে শান্তভাবে বললেন, হে দুর্যোধন, আমরা পূর্বে কর্ণের কাপুরুষতার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। বলবীর্য সম্বন্ধে তাঁর দম্ভোক্তির কোন মুল্য নেই। বিশ্বপালক বাসুদেব যাঁর সহায় সেই অর্জুনকে কে পরাজিত করতে পারে? যাহোক আমি শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করে পাঞ্চাল ও অন্যান্যদের বিনাশ করব। তুমি সুখে নিদ্রা যাও। কাল আমি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব।

নবম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম নিজেই সর্বতোভদ্র (নানা বর্ণরঞ্জিত বহুদ্বার বিশিষ্ট সুরক্ষিত দুষ্প্রবেশ্য) ব্যূহ রচনা করে কালান্তক যমের ন্যায় রণক্ষেত্রে এক ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করলেন। পাণ্ডব পক্ষের অসংখ্য সৈন্য নিহিত হল। পাণ্ডব যোদ্ধৃবৃন্দ ভীষ্মের আক্রমন প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেন। অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠলে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে ভীষ্মকে বধ করার জন্য নিজেই ধাবিত হলেন। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করে বললেন, হে বাসুদেব! তুমি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন যুদ্ধ করলে তুমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। পিতামহকে বিনাশ করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যাস্ত আছে। আমিই একাজ সম্পাদন করব। অর্জুনের কথায় কৃষ্ণ রথে প্রত্যাবর্তন করলেন। সামান্য বিরতির পর ভীষ্ম শরজালে চারিদিক আচ্ছন্ন করে পাণ্ডব সৈন্যদের ধ্বংস করে চললেন। অবশেষে সন্ধ্যা আগমনে সে দিনের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

শিবিরে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ভীষ্মের বধোপায় নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। যুধিষ্ঠির বিষন্ন মনে কৃষ্ণকে বললেন, হে বাসুদেব, পিতামহ ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদের বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত করছেন। আমরা তাঁকে প্রতিহত করতে পারছি না। আমার আর যুদ্ধে স্পৃহা নেই। অরণ্যে গমন করাই শ্রেয় মনে করছি। আমরা এই বিপদ থেকে কী ভাবে উদ্ধার পেতে পারি তুমি তার উপায় নির্দেশ কর। তখন কৃষ্ণের উপদেশমত ভ্রাতাদের নিয়ে যুধিষ্ঠির সেই রাত্রেই ভীষ্মের বধোপায় জানতে তাঁর শিবিরে উপস্থিত

হলেন। কৃষ্ণও সঙ্গে গেলেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনার শরাঘাতে আমাদের সৈন্যদল ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আপনাকে যাতে জয়লাভ করতে পারি তার উপায় বলুন। ভীষ্ম তখন নিজের বধোপায় ব্যাখ্যা করে বললেন, পূর্বে স্ত্রী ছিল এখন পুরুষ হয়েছে এমন ব্যক্তিকে আমি আঘাত করি না। দ্রুপদপুত্র শীখণ্ডীই সেই ব্যক্তি। শীখণ্ডীকে সম্মুখে দেখলে আমি অস্ত্র সংবরণ করব। এই অবস্থায় অর্জুন আমায় শরাঘাত করলে আমার পতন হবে। সেজন্য অর্জুন শীখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে আমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হোক। এই ভাবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ভীষ্মের বধোপায় জেনে সকলে হৃষ্টচিত্তে নিজেদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

দশম দিনে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হল। শীখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন ভীষ্মের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। শীখণ্ডীও শরাঘাতে ভীষ্মের সারথীকে বিদ্ধ করে তাঁর রথের ধ্বজা ছিন্ন করে ফেললেন। প্রতিজ্ঞামত ভীষ্ম শরনিক্ষেপ থেকে বিরত রইলেন। অর্জুনের শরে ভীষ্মের দেহ এমনভাবে বিদ্ধ হল যে দুই আঙ্গুলী পরিমান স্থানও অবশিষ্ট রইল না। এইরূপ ক্ষতবিক্ষত দেহে ভীষ্ম সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্বে রথ হতে ভূমিতে নিপতিত হলেন। শরজালে আবৃত হওয়ার ফলে তিনি পতিত হয়েও ভূমিস্পর্শ করলেন না; শরশয্যায় শায়িত থাকলেন। ভীষ্ম তাঁর পিতার নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। ধরাতলে অবস্থান করেও তিনি উত্তরায়ণের প্রতিক্ষায় প্রাণ ধারণ করে রইলেন। ভীষ্মের পতনে কৌরবগণ বিষাদ সাগরে মগ্ন হলেন। অন্যদিকে পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা রইল না।

অতঃপর কৌরব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে সাশ্রুনয়নে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁদের দর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করে ভীষ্ম বললেন, হে ভূপতিগণ! আমার মস্তক মাটির দিকে ঝুলে আছে। আমার মাথার নীচে উপাধান রাখার ব্যবস্থা কর। ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপাধান আনয়ণ করলে ভীষ্ম সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এ সকল বীরশয্যার উপযুক্ত নয়। তখন ভীষ্ম কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অর্জুন তিনটি শর নিক্ষেপ করলে সেগুলি তাঁর মস্তকের নীচে আবদ্ধ হয়ে উপাধানের কাজ করল। পরে ভীষ্ম বললেন, সূর্যের উত্তরায়ণ আগমনে আমি প্রাণ বিসর্জন দেব। সে পর্যন্ত আমি এইভাবে শরশয্যায় শায়িত থাকব। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হও।

পরদিন প্রভাতে কৌরব ও পাণ্ডবগণসহ বহু পৌরবাসী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। কন্যাগণ ভীষ্মকে মালাচন্দন দিয়ে সাজিয়েছে। ভীষ্ম পানীয় জল চাইলে ভূপতিগণ শীতল জলপূর্ণপাত্র ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ণের ব্যবস্থা করলেন। ভীষ্ম এ সব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি এখন মনুষ্যলোক ত্যাগ করেছি। সে জন্য আমি মানুষের আহার্য গ্রহণ করতে পারি না। ভীষ্ম তখন অর্জুনকে বললেন, ধনঞ্জয়; আমার শরীর দগ্ধ হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা

কর। অর্জুন তখন পার্জ্জণ্য শর (জল আকর্ষণক্ষম শর) দ্বারা ভীষ্মের মস্তকের দক্ষিণ পাশে পৃথিবীকে বিদ্ধ করলেন। অবিলম্বে সেই স্থল হতে অমৃততুল্য, দিব্যগন্ধযুক্ত অতি শীতল জলধারা উত্থিত হয়ে ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবৃত্ত করল। অর্জুনের কার্য দেখে উপস্থিত নৃপতিগণ বিস্ময়ে হতবাক হলেন। কৌরবদের মনে ভীতির সঞ্চার হল।

ভীষ্ম তৃপ্ত হয়ে অর্জুনকে বললেন, হে মহাবাহো! এ কাজ কেবল তোমার পক্ষেই সম্ভব। দেবর্ষি নারদ তোমাকে পূর্বতন ঋষি বলে আখ্যা দিয়েছেন। দেবগণের সাহায্যে ইন্দ্র যে কাজ সম্পাদন করতে পারবেন না তুমি অনায়াসে সেই কাজ বাসুদেবের সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারবে। তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর। আমরা এ সবই দুর্যোধনকে বহুবার বলেছি; কিন্তু তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। অনতিবিলম্বেই তিনি ভীমসেনের হস্তে নিহত হবেন।

ভীষ্মের বাক্যে দুর্যোধন মনে ভীষণ আঘাত পেলেন। ভীষ্ম তখন দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন, দুর্যোধন, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। এই মাত্র অর্জুন যে কার্যটি করলেন তা এই মর্ত্যভূমিতে অন্য কেই সম্পাদন করতে পারবেন না। অর্জুন দেবগণেরও অপরাজেয়। তুমি অচিরাৎ অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি কর। আমার নিধনে এই মহাযুদ্ধের অবসান হোক। তুমি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ কর। সকলের মধ্যে পুনরায় হৃদ্যতা স্থাপিত হোক। আমার বাক্য গ্রহণ না করলে তোমরা সকলেই বিনষ্ট হবে।

ভীষ্মের উপদেশ দুর্যোধনের মনঃপুত হল না। তিনি নিরব রইলেন।

অন্যান্য সকলে প্রস্থান করলে কর্ণ একাকী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, পিতামহ, আপনি যার সর্বদা দ্বেষ পোষণ করতেন আমি সেই রাধেয়। এই বাক্য শ্রবণে ভীষ্ম রক্ষিগণকে অপসারিত করে কর্ণকে পুত্রবৎ আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন, হে কর্ণ! তুমি সর্বদা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছ; কিন্তু এই সময় তুমি আমার নিকট না এলে তোমার অমঙ্গল হত। আমি নারদাদি ঋষিদের নিকট শুনেছি তুমি কুন্তীর কানীন পুত্র। তুমি রাধেয় নও। অধিরথ তোমার পিতা নন। অকারণে তুমি পাণ্ডবদের নিন্দা করতে। এ জন্য তোমার তেজ হরণের জন্য তোমায় কটুবাক্য বলতাম। তোমার প্রতি আমার কোন দ্বেষ নেই। তোমার শৌর্যবীর্য নিষ্ঠা ও দানদাক্ষিণ্য সবই আমি অবগত আছি। অস্ত্র চালনায় তুমি বাসুদেব ও অর্জুনের সমান। মহাবীর জরাসন্ধও তোমার সমকক্ষ নন। হে সূর্যপুত্র, পৌরুষদ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না। যদি আমার প্রিয়কার্য সাধন করতে চাও তবে নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হও। আমার অবসানে বৈরতারও অবসান হোক।

কর্ণ বললেন, হে মহাবাহো! আপনার বাক্য যথার্থ। আমি কুন্তীরই পুত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে আমি অধিরথের গৃহে বর্দ্ধিত হয়েছি। পরে দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করছি। বাসুদেব যেমন পাণ্ডবদের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন আমিও সেইরূপ দুর্যোধনের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করেছি। পাণ্ডবগণ ও

বাসুদেব অপরাজেয় জেনেও আমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করব বলে কৃতসংকল্প হয়েছি। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। ক্রোধভরে বা চপলতাবশতঃ আপনার প্রতি যে অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছি তার জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম বললেন, হে কর্ণ! যদি ওই বৈরভাব পরিত্যাগ করতে না পার তবে অহংকার বর্জন করে বল ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ কর। ধর্ম যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুভ কাজ আর কিছুই নেই। আমি সন্ধির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু কৃতকার্য হতে পারলাম না।

কর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে ভীষ্মকে প্রণাম করে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ভীষ্মের পতনের পর দ্রোণাচার্য কৌরব সেনার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হলেন। সেনাপতির পদ গ্রহণ করে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে বরপ্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে দুর্যোধন বললেন, আচার্য, আমার প্রার্থনা রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আমার নিকট আনয়ন করুন। দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের বধ কামনা করছ না? দুর্যোধন বললেন, আচার্য, যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করলে অর্জুন আমাদের সকলকেই ধ্বংস করবেন। এখন আমি বুঝতে পারছি পাণ্ডবদের পরাস্ত করা সুরগণেরও অসাধ্য। যিনি অবশিষ্ট থাকবেন তিনিই আমাদের বিনষ্ট করবেন। আমি স্থির করেছি সত্য প্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে আপন অধিকারে এনে আবার তাঁকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করে পাণ্ডবদের সকলকে আর একবার বনবাসে প্রেরণ করব।

বুদ্ধিমান দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের কুঅভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন, হে দুর্যোধন! অর্জুন যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে মনে করবে যুধিষ্ঠির তোমার অধীন হয়েছেন। আমি অর্জুনকে পরাস্ত করতে পারব না। অর্জুন দেবগণেরও অজেয়। অতএব যে উপায়ে পার অর্জুনকে অপসারিত কর। আমি তখন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে তোমার বশীভূত করব সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন মনে করলেন তাঁর প্রার্থীত বর দ্রোণাচার্য স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেইমত বিষয়টি সৈন্যগণের মধ্যে প্রকাশ করলে তারা আনন্দধ্বনি করে উঠল।

অনতিবিলম্বে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দুর্যোধনের কথোপকথনের বিবরণ চরমুখে জানতে পারলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সর্বদা তাঁর নিকটে থেকে যুদ্ধ করতে বললেন যাতে দুর্যোধনের বাসনা পূর্ণ না হয়। অর্জুন আশ্বাস দিয়ে বললেন, তিনি জীবিত থাকতে দ্রোণাচার্য তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেন না।

একাদশ দিনের যুদ্ধে সেনাপতি দ্রোণাচার্যের নির্দেশে কৌরব বাহিনী শকট ব্যূহে (সৈন্য দলের অগ্রভাগ সূচের আকার, পশ্চাদভগে স্থূল অর্থাৎ অগ্রভাগে অল্প ও পশ্চাদভাগে অধিক সৈন্য; পশ্চাদদিক হতে আক্রমণ হলে এই ব্যূহ প্রশস্ত) সুরক্ষিত হল। যুধিষ্ঠির পাণ্ডব বাহিনীর জন্য নির্মাণ করলেন ক্রৌঞ্চব্যূহ। বাসুদেব ও অর্জুন

ব্যূহমুখ রক্ষায় নিযুক্ত রইলেন। সেদিনের যুদ্ধে পাঞ্চাল বীর ব্যাঘ্রদত্ত ও সিংহসেন দ্রোণাচার্যের শরাঘাতে নিহত হলেন। দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলে অর্জুন শরজালে তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করলেন। অর্জুন পুত্র অভিমন্যু অপূর্ব যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করে কৌশলরাজ বৃহদবল ও সৌবীররাজ জয়দ্রথকে পরাজিত করে মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমনোদ্যত হলেন। ভীমসেন তাঁকে নিরস্ত করে নিজেই শল্যের সহিত গদাযুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। যুদ্ধে দুজনেই আহত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা আগমনে সে দিনের যুদ্ধ শেষ হল।

শিবিরে দ্রোণাচার্য লজ্জিত মনে দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ! আমি পূর্বেই বলেছি অর্জুনকে পরাজিত করে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা দেবতাদেরও অসাধ্য। অর্জুনকে কোন উপায়ে দূরে রাখতে পারলে যুধিষ্ঠিরকে হরণ করা অসম্ভব হবে না। সেজন্য অন্য কোন বীরকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ কর। অর্জুন তাঁকে পরাস্ত না করে ফিরবেন না। সেই অবসরে আমি যুধিষ্ঠিরকে হরণ করে নিয়ে আসব।

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতাগণ বললেন, মহারাজ, আমরা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্ভাগে নিয়ে তাঁকে বধ করব। প্রতিজ্ঞা করছি পৃথিবী আজ অর্জুনশূন্য বা ত্রিগর্তশূন্য হবে।

সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতাগণ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধার্থে অর্জুনকে আহ্বান করলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি যুদ্ধের আহ্বান কখনই অগ্রাহ্য করি না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। আপনি অনুমতি করুন আমি সংশপ্তকদের (যারা শপথ ও মরণপণ করে যুদ্ধে যায় তারাই সংশপ্তক) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। ওঁদের বধ করে আমি অচিরেই ফিরে আসব। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রোণাচার্য আমায় বন্দী করতে চান। তাঁর এই অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ না হয় সেইমত ব্যবস্থা কর। অর্জুন জানালেন, পাঞ্চাল বীর সত্যজিত আপনাকে রক্ষা করবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি সত্যজিত নিহত হন, তবে আপনি রণস্থল পরিত্যাগ করবেন।

দ্বাদশ দিনে অর্জুনের সঙ্গে সংশপ্তকদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল। অর্জুনের শরাঘাতে সংশপ্তকগণের অনেকেই বিনষ্ট হলেন। এই সুযোগে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হলেন। যুধিষ্ঠিরকে তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন রক্ষা করছিলেন। উভয়পক্ষ উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করতে লাগল। সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হল না। যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় এগিয়েএসে সত্যজিত দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হলেন। পরিকল্পনা মত যুধিষ্ঠির যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে দ্রোণাচার্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করলেন। প্রবল যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হস্তে পরাজিত হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রমুখ পাণ্ডপক্ষীয় বীরগণ। এদিকে অর্জুন ভ্রাতাদের সঙ্গে সংশপ্তকদের বিমর্দিত করে সুশর্মা ও প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ ভগদত্ত, বৃষল ও অচল নামে শকুনির দুই ভ্রাতা ও অন্যান্য কয়েকজন কৌরবপক্ষীয় বীরকে নিহত করলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তেও নিষাদরাজ বৃহৎক্ষেত্র সহ বেশ কয়েকজন কৌরব যোদ্ধা প্রাণ হারাল।

সন্ধ্যা আগমনে উভয়পক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে নিজ নিজ শিবিরে গমন করলেন।

শিবিরে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে দোষারোপ করে বললেন, আচার্য! আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। সুযোগ পেয়েও আপনি যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে দিলেন। এটা সজ্জনোচিত কাজ নয়। দ্রোণাচার্য লজ্জিত হয়ে বললেন, বাসুদেব ও অর্জুনকে মহাদেব ভিন্ন অন্য কেউই পরাভূত করতে পারবে না। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আগামীকালের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের একজন মহারথকে নিপতিত করব। তুমি যুদ্ধস্থলে অর্জুনের থেকে দূরে যুধিষ্ঠিরকে কোনভাবে আটকে রাখবে।

দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করে ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। (চক্রব্যূহ চক্রাকারে গোল। এতে চক্রাকারে সৈন্য সমাবেশ করতে হয়। এর একটি মাত্র প্রবেশ পথ আটটি কুণ্ডলাকৃতি পংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে)। প্রভাতে সংসপ্তকগণের সহিত অর্জুনের আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। এইভাবে অর্জুন যুধিষ্ঠির হতে বিচ্ছিন্ন হলে দ্রোণাচার্য বিরাট বাহিনী নিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। অন্য কেউই দ্রোণাচার্যকে বাধা দিতে পারবেন না বিবেচনা করে যুধিষ্ঠির অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পন করলেন। তিনি অভিমন্যুকে বললেন, বৎস, আমরা কেউই চক্রব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম নই। তুমিই এখন এই অসাধ্য সাধন করতে পার।

যুদ্ধের আদেশ পেয়ে অভিমন্যু বললেন, আমি আপনাদের জয় কামনায় শত্রুর চক্রব্যূহে প্রবেশ করব। কিন্তু কোন বিপদ হলে ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। কারণ পিতা আমাকে কেবল ব্যূহে প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন। যুধিষ্ঠির আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি আমাদের জন্য দ্বার করে দাও; আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে তোমায় রক্ষা করব। ভীমসেনও অভিমন্যুকে আশ্বস্ত করে বললেন, একবার ব্যূহ দ্বার উন্মুক্ত হলে আমি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবৃন্দ তোমায় অনুসরণ করে শত্রু সৈন্য বিধ্বস্ত করে ফেলব।

অতঃপর অভিমন্যু রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কৌরব সেনাদের বিমর্দিত করে চক্রব্যূহে প্রবেশ করলেন। দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ অভিমন্যুর গতিরোধ করতে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু জয়দ্রথ মহা বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের অভিমন্যুকে অনুসরণ করতে বাধা দিলেন। কৌরব সেনা অভিমন্যুকে ব্যূহমধ্যে বেষ্টন করে ফেলল। অভিমন্যু পাণ্ডব সেনানীদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী শত্রু সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপুত্র রুক্মরথ ও দুর্যোধন পুত্র লক্ষণ অভিমন্যুর শরে মৃত্যু বরণ করলেন। পুত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধন কৌরবপক্ষীয় বীরদের অভিমন্যুকে বধ করতে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তখন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ বৃহদ্‌বল ও কৃতবর্মা অভিমন্যুকে বেষ্টন করে ফেললেন। বৃহদ্‌বল ও আরও বহু কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধা অভিমন্যুর হস্তে নিহত হলেন। কর্ণও ভীষণভাবে আহত হলেন। দ্রোণাচার্যের নির্দেশে কর্ণ আহত অবস্থায় অভিমন্যুকে পিছন দিক থেকে

আক্রমণ করে তাঁর ধনু ছিন্ন করে পরে তাঁর অশ্ব ও সারথীকে বধ করলেন। এরপর দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ রথচ্যুত বালক অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। অভিমন্যু তখন খড়্গ ও চক্র নিয়ে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দ্রোণাচার্যের শরে অভিমন্যুর খড়্গ দ্বিখণ্ডিত হল। অভিমন্যু চক্র নিয়ে ধাবিত হলেন। শত্রুর শরাঘাতে চক্রও ছিন্ন হল। অভিমন্যু তখন গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুঃশাসনের পুত্র গদাদ্বারা অভিমন্যুর মস্তকে আঘাত করলে তিনি চৈতন্য হারিয়ে পড়ে গেলেন।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে আতঙ্কিত হয়ে পাণ্ডবসেনা চারিদিকে পলায়ণপর হল। যুধিষ্ঠির তাদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। সন্ধ্যাকাল আগমনে উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল রণে ক্ষান্ত দিয়ে নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করল।

এদিকে অর্জুন সংশপ্তকদের বিনষ্ট করে শিবিরে এসে পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করে কম্পিত দেহে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি পলায়ন না করে তবে জয়দ্রথকে আমি কালই বধ করব। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি কাল সূর্যাস্তের পূর্বে তাঁকে বধ করতে ব্যর্থ হলে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেব।

চরমুখে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পেরে জয়দ্রথ দুর্যোধন ও অন্যান্য কৌরব বীরদের বললেন, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, আমায় অনুমতি দাও, আমি আত্মগোপন করি। দুর্যোধন বললেন, তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, আমরা সসৈন্যে তোমায় রক্ষা করব। রাত্রে দ্রোণাচার্যের নিকট জয়দ্রথ নিজ বিপদের কথা জানালেন। দ্রোণাচার্য বললেন, যদিও অর্জুন তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিধর, তথাপি তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় নিশ্চয়ই রক্ষা করব। স্বধর্মঅনুসারে যুদ্ধ কর। দ্রোণাচার্যের কথায় জয়দ্রথ আশ্বস্ত হলেন এবং ভয় ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

এদিকে কৃষ্ণের চরগণ সংবাদ আনল কর্ণ, ভুরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, কৃপাচার্য ও শল্য—এই ছয় জন জয়দ্রথকে রক্ষা করবেন। অর্জুনকে এই সংবাদ জানিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আমার সঙ্গে কথা না বলেই তুমি জয়দ্রথ বধের এই শক্ত প্রতিজ্ঞা করেছ। দেখ যেন আমাদের মুখ রক্ষা হয়। এই সকল কৌরব বীরদের পরাজিত করতে না পারলে তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। অর্জুন বললেন, তুমি দেখো, কাল আমি দ্রোণাদি সকলের সমক্ষেই জয়দ্রথকে বধ করব।

চতুর্দশ দিবসে অর্জুন দ্রোণাদি কৌরব বীরদের বিমর্দিত করে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে জয়দ্রথের সম্মুখীন হলেন। কাল বিলম্ব না করে শরাঘাতে তিনি জয়দ্রথের সারথীর মস্তক ও রথের ধ্বজ ছিন্ন করলেন। সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, পার্শ্বরক্ষক ছয় কৌরব মহারথীদের জয় না করে কিংবা কোন ছলনার আশ্রয় না নিয়ে তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে সমর্থ হবে না। আমি যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব।

সূর্য অস্ত গেছেন দেখে জয়দ্রথ আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসবেন, সেই সময় তুমি তাঁকে আঘাত করবে।

কৃষ্ণ সেইমত যোগযুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে, এখন প্রতিজ্ঞামত অর্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করে জীবন বিসর্জন দেবেন—এই ভেবে কৌরব যোদ্ধাদের আনন্দের সীমা রইল না। জয়দ্রথ ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি দিয়ে সূর্যকে দেখতে পেলেন না। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিঃশঙ্কিত চিত্তে সূর্যকে দেখবার চেষ্টা করছেন। এঁকে বধ করার এটাই উপযুক্ত সময়। তুমি কালবিলম্ব না করে এখনই তাঁর শিরচ্ছেদ কর। কিন্তু জয়দ্রথের বধ বিষয়ে যা বলছি তা মন দিয়ে শ্রবণ কর। জয়দ্রথের জন্মকালে পিতা বৃদ্ধক্ষেত্র দৈববাণী শুনেছিলেন যে রণক্ষেত্রে কোন শত্রুর হস্তে এই পুত্রের শিরচ্ছেদ হবে। বৃদ্ধক্ষেত্র তখন অভিশাপ দিলেন যিনি তাঁর পুত্রের শিরচ্ছেদ করবেন, তাঁর মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। অর্জুন, তুমি এমনভাবে বাণ নিক্ষেপ করবে যাতে জয়দ্রথের শির মাটিতে না পড়ে পিতা বৃদ্ধক্ষেত্রের কোলে পড়ে। মাটিতে পড়লে তোমার মস্তক বিদির্ণ হবে। বৃদ্ধক্ষেত্র এখন বনে তপস্যায় রত।

নির্দেশমত অর্জুন এক মন্ত্রসিদ্ধ শরদ্বারা জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত আরও কয়েকটি শর জয়দ্রথের কর্তিত মুণ্ড আকাশে বহন করে নিয়ে বনে সন্ধ্যাবন্দনারত বৃদ্ধক্ষেত্রের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করল। বৃদ্ধক্ষেত্র ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলে, কৃষ্ণবেশ ও কুণ্ডলে শোভিত পুত্রের মুণ্ড মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে নিজের অভিশাপের ফলস্বরূপ আপন মস্তক বিদীর্ণ হয়ে বৃদ্ধক্ষেত্র মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

এরপর সূর্য পশ্চিম আকাশে পুনঃপ্রকাশিত হলেন। কৌরবগণ বুঝতে পারলেন, বাসুদেবের মায়া প্রভাবেই এমন হয়েছে। জয়দ্রথের মৃত্যুতে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা মহাশোকে নিমগ্ন হলেন।

এই দিনের যুদ্ধের আরও কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণার্জুন যখন জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হলেন তখন ভীমসেনও তাঁদের অনুগামী হলেন। কর্ণ ভীমসেনকে দেখে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলে উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হল। কর্ণ প্রথমে মৃদুভাবে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। ভীমসেন পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করে অতি কঠোরতারসঙ্গে কর্ণের প্রতি শরাঘাতে লিপ্ত হলেন। দুর্যোদনের আদেশে তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে একত্রিশ জন কর্ণের সাহায্যে এগিয়ে এসে ভীমসেনের হস্তে প্রাণ হারাল। অতঃপর কর্ণ ও ভীমসেনের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুরু হল। শেষে কর্ণের শরাঘাতে ভীমসেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হলেন। মাতা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করে কর্ণ ভীমসেনকে বধ করলেন না। কেবল ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করে সহাস্যে বললেন, হে মাকুন্দে, (ভীমসেন দাড়ি গোঁফহীন মাকুন্দ ছিলেন) তুমি কেবল উদরসর্বস্ব, যুদ্ধবিদ্যার কিছুই জান না। খাদ্যপানীয় যেখানে থাকে সেখানেই তোমার স্থান। তুমি

রণভূমির অযোগ্য। ভীমসেন উত্তরে বললেন, তুমি কী গর্ব করছ? পূর্বে তোমায় বহুবার পরাজিত করেছি। দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তুমি আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর। আমি তোমায় কীচকের ন্যায় বিনষ্ট করব।

ভীমসেন তখন সাত্যকির রথে উঠে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হলেন। কুরুবংশীয় যোদ্ধা ভুরিশ্রবা সাত্যকিকে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কৃষ্ণার্জুন নিকটেই ছিলেন। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন তীক্ষ্ণশরে ভুরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেললেন। ভুরিশ্রবা অর্জুনকে বললেন, হে কৌন্তেয়, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত আছি। এই অবস্থায় আমার বাহুচ্ছেদ করে তুমি অতি গরহিত কাজ করলে। তোমার ক্ষত্রিয় ধর্মভ্রষ্ট কৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত হয় নি। এই বলে ভুরিশ্রবা ধ্যানে মগ্ন হলেন ব্রহ্মালোকে যাবার মানসে। অর্জুন ভুরিশ্রবাকে বললেন, তুমি আমার কাজকে নিন্দনীয় মনে করছ। কিন্তু রথ, বর্ম ও শস্ত্রবিহীন বালক অভিমন্যুর হত্যা কোন নীতিশাস্ত্র সম্মত? ভুরিশ্রবা নিরুত্তর রইলেন। কিয়ৎকাল পরে সাত্যকি চৈতন্যলাভ করে খড়্গ দিয়ে ধ্যানমগ্ন ভুরিশ্রবার শিরচ্ছেদ করলেন।

এদিনের যুদ্ধে অন্যান্য নিহত কৌরব বীরদের মধ্যে ছিলেন কম্বোজরাজ ও রাক্ষসবীর অলম্বুষ। নিজ পক্ষের বিপর্যয় দর্শনে হতাশ হয়ে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আচার্য, আমি একজন মহাপাপী। আমার জন্যই এই সকল নৃপতিবৃন্দ ও যোদ্ধৃগণ জীবন বিসর্জন দিলেন। এই অবস্থায় আমার জীবন ধারণের আর কি আবশ্যকতা আছে? আমি শপথ নিচ্ছি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের বিনষ্ট করে তৃপ্তিলাভ করব, নয়তো তাঁদের হাতে আমি মৃত্যুবরণ করব। আমার প্রতি আপনার উপেক্ষার জন্যই এই অবস্থা। আপনি আমায় আজ্ঞা দিন।

দ্রোণাচার্য বললেন, দুর্যোধন, তুমি এমন কঠোর বাক্যে আমাকে নিপীড়িত করছ কেন? আমি সর্বদাই বলে আসছি অর্জুন অজেয়। শিখণ্ডী অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করেছেন। এতেই অর্জুনের বলবীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য ও তুমি জীবিত থাকতে জয়দ্রথ কেন নিহত হলেন? হে দুর্যোধন! তোমার ও দুঃশাসনের সম্মুখেই দেবরাজের অজেয় সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের পতন দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছে সমগ্র বসুন্ধরা তোমায় পরিত্যাগ করেছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস না করে বর্ম পরিত্যাগ করব না। তুমি পুত্র অশ্বত্থামাকে বলবে সে যেন সোমকদের বিনষ্ট না করে ক্ষান্ত না হয়। আমি শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করছি। তুমি কৌরব সৈন্য রক্ষার ব্যবস্থা কর। আজ সারারাত যুদ্ধ হবে। এই বলে তিনি শত্রু সৈন্যের দিকে ধাবিত হলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, হে রাধেয়! একমাত্র কৃষ্ণের সহায়তায় অর্জুন আচার্য রচিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে জয়দ্রথকে নিহত করলেন। পরিতাপের বিষয় আচার্যের সম্মুখেই আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবৃন্দ জীবন হারালেন। আমার বিশ্বাস আচার্য

আরও দৃঢ়তার সঙ্গে অর্জুনকে বাধা দিলে জয়দ্রথ রক্ষা পেতেন। অর্জুন আচার্যের প্রিয় শিষ্য। মনে হয় সে জন্যই তিনি যুদ্ধ না করে অর্জুনকে ব্যূহ প্রবেশের পথ সুগম করে দিয়েছেন। আশ্চার্যের বিষয় তিনিই জয়দ্রথকে অভয় দিয়েছিলেন। সবই আমার দুর্ভাগ্য।

কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি আচার্যের নিন্দা করবেন না। আমি তাঁর সামান্যতম বিচ্যুতিও দেখছি না। তিনি অশক্ত, স্থবির ও শীঘ্র গমনে অক্ষম। তা সত্যেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন অর্জুনকে বাধা দিতে। অন্যদিকে অর্জুন যুবক ও সর্বাস্ত্রবিশারদ। কেবল আচার্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরাও অর্জুনের গতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে দৈবের উপর কারও হাত নেই। পূর্বেও দৈবপ্রভাবে পাণ্ডবগণ রক্ষা পেয়েছেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারি নি।

সেদিন সন্ধ্যায় পাণ্ডব পাঞ্চাল ও সঞ্জয়গণ এক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যের সঙ্গে এক নিদারুণ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ভুরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত ভীমসেন ও সাত্যকির বাণে জীবন বিসর্জন দিলেন। যুধিষ্ঠিরও বহু কৌরবপক্ষীয় বীর ধ্বংস করলেন। অন্যদিকে পাণ্ডব পক্ষে ঘটোৎকোচ পুত্র অঞ্জনপর্বা ও তাঁর অসংখ্য অনুচর অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণ হারাল।

দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদলের বিক্রম দর্শনে বিচলিত হয়ে কর্ণকে অনুরোধ করলেন কৌরব যোদ্ধাদের রক্ষা করতে। কর্ণ উত্তরে বললেন, আজ আমি অর্জুনকে যুদ্ধে নিহত করব। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসলে তিনিও নিহত হবেন।

কর্ণের বাক্য শুনে কৃপাচার্য বললেন, সুতপুত্র, এখন বৃথা আস্ফালন না করে যুদ্ধ কর। পূর্বে তুমি সর্বদাই পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত হয়েছ। তখন কর্ণ ও কৃপাচার্যের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হল। শেষে কর্ণ বললেন, ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তির সাহায্যে আমি অর্জুনকে বধ করব। আপনি পাণ্ডবদের প্রতি অনুরক্ত, সেজন্য আমায় অবজ্ঞা করছেন। পুনরায় আমায় অপমানিত করলে আমি আপনার জিহ্বা কর্তন করে ফেলব। আপনার দুষ্ট অভিপ্রায় আমি বুঝতে পেরেছি; আপনি পাণ্ডবদের স্বার্থে কৌরব সেনাদের ভয় দেখাতে চান।

মাতুল কৃপাচার্যের প্রতি কর্ণের এরূপ ব্যবহার অশ্বত্থামার অসহ্য মনে হল। তিনি খড়্গ উদ্যত করে কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। দুর্যোধন ও কৃপাচার্য তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। দুর্যোধনের অনুরোধে শান্ত হয়ে অশ্বত্থামা বললেন, সুতপুত্র! আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু অর্জুন তোমার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করবেন। দুর্যোধন বললেন, এখন কলহের সময় নয়। আপনাকে এবং কৃপাচার্য, কর্ণ, দ্রোণাচার্য ও শকুনিকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থে এগিয়ে আসছেন।

এরপর রাত্রিব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হল। উভয়পক্ষই অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হলেন। অজুর্নের শরবর্ষণে কৌরব সেনা পলায়ন করতে লাগল। অধীর হয়ে দুর্যোধন দ্রোণাচার্য ও কর্ণকে বললেন, আমাদের সৈন্যদল পাণ্ডবদের হস্তে

নিহত হচ্ছে। যদি আমাকে পরিত্যাগ না করে থাকেন, তবে আপনাদের বিক্রম প্রদর্শনের এটাই প্রশস্ত সময়। দুর্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত হয়ে দ্রোণাচার্য ও কর্ণ প্রবলবেগে পাণ্ডব সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। কর্ণের শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন হল। পাণ্ডব সেনা ভয়ে পালাতে লাগল। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন কর্ণকে প্রতিহত করতে। অর্জুন সারথী কৃষ্ণকে রথ কর্ণের নিকট নিতে বললে কৃষ্ণ বললেন, তুমি ও ঘটোৎকচ ভিন্ন অন্য কারও কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ নেই। কিন্তু তোমার পক্ষে এখন কর্ণের সম্মুখীন হওয়া উচিত হবে না। কর্ণ তোমার বধের জন্যই দেবরাজ ইন্দ্রপ্রদত্ত একশত্রুঘাতিনী শক্তি যত্ন সহকারে রক্ষা করছেন। ভীম পুত্র মহাবীর ঘটোৎকচ দিব্য, অসুর ও রাক্ষস অস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। সে অবশ্যই কর্ণকে পরাজিত করতে সমর্থ হবে।

কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ঘটোৎকচ মায়াবলে নানা রূপ ধারণ করে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস ঘটোৎকচকে আক্রমণ করলে সে তার মুণ্ড কর্তন করে দুর্যোধনের দিকে নিক্ষেপ করল। ঘটোৎকচ কর্তৃক কর্ণের রথাশ্বও নিহত হল। অবস্থা সঙ্গীন দেখে কৌরব যোদ্ধাদের অনুরোধে কর্ণ অর্জুন বধের জন্য রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত বৈজয়ন্তী শক্তি ঘটোৎকচের দিকে নিক্ষেপ করে তার বক্ষবিদীর্ণ করে ফেললেন। ঘটোৎকচের প্রাণহীন দেহ আকাশে উড্ডীন হয়ে ভীষণ শব্দে ভূতলে পতিত হল। তার দেহের ভারে কৌরব সেনার একাংশ পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাল।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকে মূহ্যমান হলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। অর্জুন কৃষ্ণের ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে বললেন, মধুসূদন, ঘটোৎকচের মৃত্যুতে তোমার আনন্দ দেখে আশ্চর্য বোধ করছি। কিন্তু এর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। গোপনীয় না হলে সব কিছু খুলে বল।

কৃষ্ণ বললেন, ঘটোৎকচের মৃত্যু না হলে কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি আজ তোমায় নিহত করত। মহারথ কর্ণ কবচকুণ্ডলের বিনিময়ে ইন্দ্রের নিকট শক্তি অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি স্থির করেন এই অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে তোমায় বধ করবেন। আমা কর্তৃক বিমোহিত হয়ে কর্ণ পুর্ব সিদ্ধান্ত ভুলে শক্তি অস্ত্র ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করেন। তাঁর তোমাকে বধ করার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। পূর্বেই ইন্দ্র তোমার হিতের জন্য অভেদ্য কবচকুণ্ডল হরণ করেছেন। এক্ষণে ঘটোৎকচের মৃত্যুর মধ্যে এই অমোঘ শক্তি অস্ত্র নিঃশেষিত হল। কর্ণের নিকট হতে এখন তোমার কোন বিপদ নেই। ঘটোৎকচের এইভাবে মৃত্যুর আরও একটি কারণ আছে। ঘটোৎকচ ছিল ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী পাপাত্মা। কর্ণের হাতে তার মৃত্যু না হলে আমিই তাকে বধ করতাম। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ধর্মনাশক সকলকেই বিনষ্ট করব। হে অর্জুন, কর্ণবধের জন্য তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। আমার উপদেশমত কাজ করলে তুমি অনায়াসে কর্ণকে বধ করতে পারবে। যথাসময়ে দুর্যোধন বধের উপায়ও ভীমসেনকে জানিয়ে

দেব।

সে রাত্রে উভয় পক্ষই পরস্পরের বহু সৈন্য নিহত করে ক্লান্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশ্রাম নিলেন। রাতের শেষভাগে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হল। বিরাট ও দ্রুপদ তিন পুত্র সহ দ্রোণাচার্যের হস্তে নিহত হলেন। ধীরে ধীরে সূর্য পূর্বাকাশে উদয় হলেন। দ্রোণাচার্য পাণ্ডব সেনা পর্যদস্ত করে অগ্রসর হতে লাগলেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, অস্ত্র হাতে থাকলে দ্রোণাচার্য ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও অজেয়। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে ধর্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমাদের জয়ের উপায় স্থির করতে হবে। যুদ্ধে পুত্র অশ্বত্থামা হত হয়েছেন এই কথা শুনলে দ্রোণাচার্য শোকে মুহ্যমান হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন। এখন কেউ ওঁকে বলুক অশ্বত্থামা হত হয়েছেন। অর্জুন এরূপ অসত্য বাক্য বলতে অস্বীকার করলেন। শেষে যুধিষ্ঠির নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজী হলেন। এমন সময় ভীমসেনের আঘাতে অশ্বত্থামা নামে মালবরাজের এক হস্তী নিহত হল। ভীমসেন দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হয়ে লজ্জিতভাবে বললেন, অশ্বত্থামা হত হয়েছে। নিজ পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন মনে করে দ্রোণাচার্য অবসন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভীমসেনের কথায় অধীর না হয়ে তিনি পাণ্ডব সেনার উপর আক্রমণ তীব্রতর করলেন। অসংখ্য শত্রু সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব বিনষ্ট হল। এমন সময় বিশ্বামিত্র, জগদগ্নি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সূক্ষ্মদেহে দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত বললেন, দ্রোণ, তোমার মৃত্যুসময় উপস্থিত হয়েছে। তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অগণিত অনভিজ্ঞ লোকদের হত্যা করে মহাপাপ করেছ। এখন অস্ত্র সংবরণ কর।

যুদ্ধ বন্ধ করে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুত্র অশ্বত্থামা সত্যই নিহত হয়েছেন কি না? দ্রোণাচার্যের বিশ্বাস ছিল যুধিষ্ঠির কোন প্রলোভনেই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ইতস্ততঃভাব দেখে বললেন, আর অর্ধদিবসের মধ্যে দ্রোণাচার্য আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করে ফেলবেন। আমাদের রক্ষার জন্য এখন মিথ্যাই বলা উচিত। জীবন রক্ষায় মিথ্যা বললে পাপ স্পর্শ করে না। ভীমসেনও যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণের উপদেশমত কাজ করতে বললেন। যুধিষ্ঠির তখন উচ্চৈঃস্বরে বললেন, অশ্বত্থামা হত হয়েছেন। তারপর অস্ফুটস্বরে পললেন, 'নর নহে গজ'।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে দ্রোণাচার্য শোকাহত হয়ে নিজের সমস্ত অস্ত্র হাত থেকে ফেলে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেইসময় এক সুদীর্ঘ শরদ্বারা দ্রোণাচার্যকে আঘাত করলেন। ভীষণ ভাবে আহত হয়ে দ্রোণাচার্য উচ্চৈঃস্বরে পুত্র অশ্বত্থামাকে ডাকলেন এবং রথের উপর ধ্যানস্থ হয়ে পরমপুরুষ বিষ্ণুকে স্মরণ করে ব্রহ্মালোকে যাত্রা করলেন। তাঁর মৃত দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে নিমেষে অদৃশ্য হল। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাণহীন দ্রোণাচার্যের শিরচ্ছেদ করে মুণ্ড তুলে কৌরব সেনার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে কৌরব সেনা ত্রাসিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে ভীমসেন বললেন, সূতপুত্র কর্ণ ও দুর্যোধন নিহত হয়ে অবার তোমায়

আলিঙ্গন করব। এই ভাবে চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধ শেষ হল।

দ্রোণাচর্যের মৃত্যুর সময় পুত্র অশ্বত্থামা অন্যত্র পাণ্ডব যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। চারিদিকে কৌরব সেনা পলায়ন করছে দেখে তিনি সত্বর দুর্যোধনের নিকট এসে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলেন। অশ্বত্থামা চোখের জল মুছে ক্রোধে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নীচাশয় পাণ্ডবদের নিরস্ত্র পিতার এই হত্যা ও ধর্মধ্বজী যুধিষ্ঠিরের এই অনার্যোচিত কার্যে নিন্দার ভাষা নেই। ন্যায়যুদ্ধে মৃত্যুবরণে দুঃখ নেই। কিন্তু সৈন্যদের সম্মুখে পিতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। আমি শপথ গ্রহণ করছি সমস্ত পাঞ্চালদের ধ্বংস না করে আমি অস্ত্র সংবরণ করব না। আমার হাতে এক অমোঘ অস্ত্র আছে যা পিতা নারায়ণকের পূজা করে পেয়েছিলেন। দুর্যোধন, আমি এই নারায়ণ প্রদত্ত অস্ত্র দিয়ে শত্রুদের বিনষ্ট করব।

অশ্বত্থামা এই বলে সমগ্র রণস্থল কম্পিত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

কৌরবসেনা আশ্বস্ত হয়ে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিয়ে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হল। এই শব্দ শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, পলায়নরত কৌরব সেনাকে কে ফিরিয়ে আনল? আর এমন নিদারুণ গর্জনই বা কে করছে? অর্জুন বললেন, এই গর্জন অশ্বত্থামার। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃস্বরে হ্রেষারব করেছিলেন। সে জন্য তাঁর নাম অশ্বত্থামা। ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু দ্রোণাচার্যের কেশাকর্ষণ করেছেন। অশ্বত্থামা তাঁকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। অন্যায়ভাবে বানররাজ বালীকে বধ করে রামের যে অকীর্তি হয়েছিল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আচার্য দ্রোণের নিধনের জন্য আপনিও ত্রিভূবনে সেইরূপ অকীর্তির ভাগী হলেন। আমি নিজেও একজন মহাপাপী। গুরু দ্রোণাচার্যের বিশ্বাস ছিল আমি তাঁর হিতের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি। কিন্তু তাঁর অন্যায় নিধনের সময় আমি নিঃশ্চুপ ছিলাম। আমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। আমার মরণই ভাল।

অর্জুনের কথা শুনে ভীমসেন ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, হে পার্থ! তুমি ক্ষাত্রধর্মের কথা ভুলে অরণ্যবাসী মুনি জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় ধর্মকথা বলছ। তুমি কৌরবদের অধার্মিক কার্যকলাপ সব ভুলে গেলে? তাঁরা কপটতার আশ্রয় নিয়ে ধর্মরাজকে রাজ্যচ্যুত করেছে, কেশাকর্ষণ করে এনে প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেছে। তের বৎসর নির্বাসনে পাঠিয়ে আমাদের নিদারুণ দুঃখকষ্ট দিয়েছে। আমরা এখন তাদের দুষ্কর্মের প্রতিশোধ নিচ্ছি মাত্র। তোমরা চারভ্রাতা যুদ্ধ না করলেও আমি একাই অশ্বত্থামাকে পরাজিত করব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে বললেন, দ্রোণাচার্য নিজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে এ কাজ অতি নীচ। তিনি নানা অলৌকিক

অস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যদের ধ্বংস করছিলেন। আমরা যদি কুটিলতার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে বধ করে থাকি, তবে এতে অন্যায় কী হয়েছে? দ্রোণকে বধের জন্যই আমি যজ্ঞাগ্নি হতে দ্রুপদপুত্ররূপে উৎপত্তি হয়েছি। তাঁর বধের জন্য আমার কোন ক্ষোভ নেই। তুমি জয়দ্রথের মুণ্ড কর্তন করে অনার্যদের দেশে নিক্ষেপ করেছিলে। আমি তা করিনি বলে দুঃখ হচ্ছে। তুমি যেমন তোমার পিতৃবন্ধু ভগদত্তকে সংহার করেছিলে আমি সেরূপ দ্রোণাচার্যকে নিহত করেছি। পিতামহ ভীষ্মের বিনাশ যদি অধার্মিক না হয়, তবে দ্রোণাচার্যের বিনাশই বা অধার্মিক হবে কেন? দ্রোণাচার্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন। সে জন্যই আমি তাঁকে বিনষ্ট করেছি। হে অর্জুন, যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন। আমিও অধার্মিক নই। এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি জয়লাভ করবে।

অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা শুনে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ লজ্জায় মস্তক অবনত করে নিরব রইলেন। সাত্যকি ক্রোধের সঙ্গে বললেন, এই দম্ভোক্তিকারী নরাধম পাঞ্চাল কুলাঙ্গারকে বিনষ্ট করতে পারে এমন কি কেউ এখানে উপস্থিত নেই! হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, তুমি আচার্যকে অতি জঘন্য উপায়ে হত্যা করে আবার তাঁরই নিন্দায় ব্যাপৃত হয়ে আত্মশ্লাঘা করছ। পিতামহ ভীষ্ম নিজেই তাঁর মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন, আর তোমার ভ্রাতা শিখণ্ডীই তাঁকে বধ করেছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে আচার্যের অন্যায় নিধনের কোন তুলনা হয় না। তুমি যদি পুনরায় আচার্যের নিন্দা কর তবে আমি পদাঘাতে তোমার মস্তক বিদীর্ণ করব।

অতঃপর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি পরস্পরকে নিন্দা করে বাগ্‌যুদ্ধে রত হলেন। এক সময় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গদাহস্তে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হলেন। ভীমসেন তাঁকে বাধা দিলেন কৃষ্ণের নির্দেশে। তখন সহদেব বললেন, অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ সকলেই আমাদের মিত্র। সুতরাং তোমার ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে সৌহার্দ থাকাই সঙ্গত। তোমরা পরস্পরকে ক্ষমা কর। এরপরও সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শান্ত হলেন না। অবশেষে বাসুদেব ও যুধিষ্ঠিরের হস্তক্ষেপে তাঁরা নিরস্ত হলেন।

অশ্বত্থামা কর্তৃক নারায়ণ-অস্ত্র নিক্ষেপের মধ্যে পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধ আরম্ভ হল। এ অস্ত্র থেকে অসংখ্য প্রজ্বলিত শর, লৌহ গোলক, শতঘ্নী শূল, গদা ও ক্ষুরধার চক্র নির্গত হয়ে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করে পাণ্ডব সৈন্যদের বিনষ্ট করতে লাগল। এই আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব বিবেচনা করে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করতে আদেশ দিয়ে বললেন, এই অবস্থায় আমাদের পরিত্রাণের উপায় একমাত্র ধর্মাত্মা বাসুদেবই নির্ণয় করতে সক্ষম। সকল সৈন্যদের বলছি, তোমরা যুদ্ধ বন্ধ কর। আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ বিসর্জন দেব। আমরা আমাদের পরমপূজনীয় আচার্যকে অন্যায়ভাবে বধ করেছি। আমাদের জীবনে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

কৃষ্ণ তখন দুই বাহুতুলে সৈন্যগণকে বাহন থেকে নেমে অস্ত্রত্যাগ করতে নির্দেশ

দিয়ে বললেন, নারায়ণ-অস্ত্র নিবারণের এটাই একমাত্র উপায়। ভীমসেন কৃষ্ণের নির্দেশ উপেক্ষা করে রথারোহণে অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা অগ্নি উদ্গারী শরজালে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন সত্বর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক তাঁকে রথ থেকে নামিয়ে তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তখন নারায়ণ-অস্ত্রের তেজ প্রশমিত হল। পাণ্ডব সৈন্য দুর্যোধনের দিকে অগ্রসর হলে তিনি অশ্বত্থামাকে পুনরায় নারায়ণ-অস্ত্র প্রয়োগ করতে বললেন। অশ্বত্থামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, এই অস্ত্র পুনরায় প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারী নিজেই ধ্বংস হবেন। বাসুদেবের কৌশলে নারায়ণ-অস্ত্র প্রতিহত হয়েছে। সেজন্য পরিকল্পনামত শত্রু সৈন্য সংহার করা সম্ভব হল না।

এরপর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অশ্বত্থামা পান্ডব সৈন্য পরাজিত করলেন। সন্ধ্যা আগমনে সেদিনের যুদ্ধের অবসান হল।

সে রাত্রিতে দুর্যোধন স্বপক্ষীয় যোদ্ধৃদের এক বৈঠকে যুদ্ধের এই অবস্থায় তাঁদের মতামত জানতে চাইলে তাঁরা বিবিধ যুদ্ধকৌশল ব্যাখ্যা করে যুদ্ধে অগ্রসর হতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অশ্বত্থামা বললেন, পণ্ডিতগণ কার্যসিদ্ধির চারটি উপায় নির্ধারিত করেছেন। এগুলি হল—কার্যে অনুরাগ, পরিস্থিতির সম্যক জ্ঞান, দক্ষতা ও নীতিপরায়ণতা। আমাদের বহু দক্ষ ও নীতিজ্ঞ মহারথ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তথাপি আমাদের জয়ের আশা ত্যাগ করা উচিত নয়। উপযুক্ত নীতি প্রয়োগে দৈবকেও বশে আনা যায়। আমরা মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করে শত্রুগণকে বিনাশ করব।

সেইমত দুর্যোধনের আদেশে কর্ণ সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হয়ে কৌরব বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ষোড়শ দিনের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উভয়পক্ষের অগণিত সৈন্য ধ্বংস হল। এক সময় অর্জুনের শরবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে কৌরবগণ আপন শিবিরে এসে মন্ত্রণায় বসলেন। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, অর্জুন দক্ষ ও ধৈর্যশীল; তদুপরি কৃষ্ণ তাঁকে সর্বদা মন্ত্রণা দিয়ে সাহায্য করছেন। অদ্য আমরা তাঁর অতর্কিত অস্ত্র প্রয়োগে পরাজিত হয়েছি; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করছি আমি তাঁর সংকল্প বিনষ্ট করব।

পরদিন প্রভাতে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, অদ্য অর্জুন ও আমার মধ্যে একজন নিহত হবে। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ হত হয়েছেন, আমার ইন্দ্র দত্ত শক্তিও বিনষ্ট হয়েছে। তথাপি অস্ত্রবিদ্যায়, শৌর্যবীর্যে ও জ্ঞানে আমি অর্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পরশুরাম প্রদত্ত আমার ধনু অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু অপেক্ষা অধিক কার্যকরী। কিছু কিছু বিষয়ে আমি অর্জুনের চেয়ে হীন সন্দেহ নেই। অর্জুনের ধনু দিব্য জ্যা সম্পন্ন, দুটি অক্ষয় তূণীরও তাঁর অধিকারে; তদুপরি বাসুদেব তাঁর সারথি ও রক্ষক। তাঁর অগ্নিদত্ত দিব্য রথ অচ্ছেদ্য। অশ্বসকল মনের ন্যায় দ্রুতগামী এবং রথধ্বজের উপর অবস্থিত বানর ও অতি ভয়ংকর। এ সব সত্ত্বেও আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাসনা করি। মদ্ররাজ শল্য কৃষ্ণের সমান। তাঁর ন্যায় অশ্বতত্ত্বজ্ঞ আর কেউ নেই। তিনি আমার

সারথি হলে ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার হাতে পরাজয় বরণ করবেন।

দুর্যোধন তখন শল্যের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, মদ্ররাজ, যুদ্ধের পরিস্থিতি আপনি সবই অবগত আছেন। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হয়েছেন। কেবল আছেন মহাবীর কর্ণ ও মহারথ আপনি। কর্ণের উপর আমার অশেষ ভরসা, কিন্তু তাঁর উপযুক্ত সারথীর অভাব। আপনি ভিন্ন অন্য কেউই কর্ণের সারথী হবার যোগ্য নন। আপনি অনুগহ করে কর্ণের সারথ্যপদ গ্রহণ করে অর্জুনকে বিনষ্ট করুন।

দুর্যোধনের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে শল্য বললেন, মহারাজ, আমি রাজর্ষিকুলজাত, রাজপদে অভিষিক্ত ও মহারথ। আমি সুতপুত্র কর্ণের সারথ্য করতে পারি না। এরূপ প্রস্তাব করে তুমি আমায় অপমান করছ; কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। শৌর্যবীর্যে কর্ণ আমার ষোলভাগের এক ভাগও নয়। অপমানিত হয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারি না। অনুমতি দাও আমি নিজ রাজ্যে ফিরে যাই। এই বলে তিনি নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

দুর্যোধন শল্যের গাত্র স্পর্শ করে মিষ্ট বাক্যে বললেন, মদ্রেশ্বর, আপনার কথা যথার্থ। আপনার সঙ্গে কর্ণ বা অন্য কোন রাজার তুলনা হয় না। কৃষ্ণও আপনার তেজ সইতে পারবেন না। সব দিক বিবেচনা করেই আমি আপনাকে কর্ণের সারথীরূপে বরণ করেছি। আমি মনে করি কর্ণ অর্জুনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আপনাকেও লোকে বাসুদেবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অশ্বহৃদয়জ্ঞ হিসাবে আপনার জ্ঞান বাসুদেবের দ্বিগুণ।

শল্য বললেন, দুর্যোধন, তুমি আমায় কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছ সেজন্য আমি প্রীত হয়েছি। আমি কর্ণের সারথী হতে রাজী আছি, তবে আমার একটি শর্ত থাকবে, আমি কর্ণের প্রতি ইচ্ছমত বাক্য প্রয়োগ করব।

দুর্যোধন ও কর্ণ মদ্ররাজের শর্ত স্বীকার করে নিলেন।

এরপর দুর্যোধন জনান্তিকে শল্যকে বললেন, ভৃগুবংশীয় জমদগ্নিপুত্র মহাতপা পরশুরাম তপস্যায় তুষ্ট করে মহাদেবের নিকট অমোঘ অস্ত্র পেয়েছিলেন। এই অস্ত্র তিনি শিষ্য কর্ণকে দান করেছেন। কর্ণ সূতকুলোদ্ভব হলে তাঁর পক্ষে এই দিব্যাস্ত্র ধারণ করা সম্ভব ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন, পরিচয় গোপনের জন্য পরিত্যক্ত হয়েছেন। কোন সূতনারী কবচকুণ্ডলধারী দীর্ঘবাহু সূর্যতুল্য এই মহারথের জননী হতে পারে না।

শল্য উত্তরে বললেন, আমি এসব কাহিনী শুনেছি। তবে কর্ণ অর্জুনকে বধ করলেও তোমার সৈন্যদলের নিস্তার নেই। বাসুদেব স্বয়ং তাদের ধ্বংস করবেন। ক্রোধোদ্দীপ্ত কৃষ্ণকে বাধা দিতে পারেন এখন কোন রাজা নেই।

কর্ণের বলবীর্যের নানা ঘটনাবলী বিবৃত করে দুর্যোধন বললেন, ক্রুদ্ধ হলে কর্ণ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও বধ করতে সমর্থ। বাহুবলে আপনার তুল্য বীর নেই। অর্জুনের

অবর্তমানে কৃষ্ণ কর্তৃক পাণ্ডব সৈন্য রক্ষিত হলে আপনিই কর্ণের মৃত্যুর পর কৌরব বাহিনীর সেনাপতি হবেন।

শল্য বললেন, গান্ধারীপুত্র, তুমি সকলের সম্মুখে বলেছ আমি কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এতেই আমি প্রীত হয়েছি। তোমার অভিলাষমত আমি কর্ণের সারথী হব।

দুর্যোধন শল্যের আরও নানা গুণাবলীর প্রশংসা করে বললেন, হে পুরুষব্যাঘ্র, আজ কর্ণ অর্জুন বধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। আমার প্রার্থনা আপনি কর্ণের অশ্ব পরিচালনা করুন। কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সারথি ও উপদেষ্টা হয়ে তাঁকে রক্ষা করছেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণকে রক্ষা করুন।

শল্য বললেন, তোমার কথামত কাজ করতে রাজী আছি। তবে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি কর্ণের প্রতি যে সকল প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করব তা তোমাদের দুজনকেই সইতে হবে।

তখন কর্ণ সম্মত হয়ে বললেন, মদ্ররাজ, ব্রহ্মা যেমন মহাদেবের, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সেইরূপ সর্বদা আপনি আমাদের হিতেরত থাকুন।

পরদিন প্রভাতে শল্যের সারথ্যে কর্ণ রথে আরোহণ করে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। সেই সময় ভূমিকম্প, উল্কাপাত প্রভৃতি নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিল। কৌরব সেনা এসব অগ্রাহ্য করে কর্ণের জয়ধ্বনি করে উঠল।

রথে কর্ণ শল্যকে বললেন, পরশুরাম প্রদত্ত দিব্যাস্ত্রদ্বারা অদ্য আমি অর্জুনকে বধ করব। আর দৈব বিমুখ হলে রণে আপন প্রাণ বিসর্জন দেব। আপনি শত্রু সৈন্যের দিকে রথ পরিচালনা করুন।

শল্য উত্তরে বললেন, কর্ণ, বৃথা আত্মশ্লাঘা করো না। তোমার স্মরণে আছে কি ঘোষপল্লীতে গর্ন্ধর্বদের হাতে বন্দী দুর্যোধনকে অর্জুন উদ্ধার করেছিলেন? তখন কিন্তু তুমি পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেছিলে। বিরাট নগরেও তোমাদের সকলকে অর্জুনের হাতে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। সূতপুত্র, পূর্বে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেও অদ্য তোমার মৃত্যু অবধারিত। কর্ণ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, কী নিমিত্ত আপনি অর্জুনের এত প্রশংসা করছেন? এ প্রশংসা সার্থক হবে তখনই যখন সে আমায় পরাজিত করতে পারবে। শল্য 'তাই হোক' বলে নিরস্ত হয়ে কর্ণের নির্দেশমত রথ চালনা করলেন। রথ পাণ্ডব সেনার নিকট এলে কর্ণ বহুবিধ পুরস্কার ঘোষণা করলেন কৃষ্ণার্জুনের অবস্থান জানতে।

শল্য বললেন, কর্ণ তুমি কাকেও পুরস্কৃত না করেই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। তুমি অজ্ঞানবশতঃ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনষ্ট করতে বাসনা করেছ। তোমার সকল চেষ্টা বিফল হবে সন্দেহ নেই। শৃগাল সিংহকে নিহত করেছে এ কথা কেউ শুনেনি। তুমি আত্মহননের পথে অগ্রসর হচ্ছ। যদি মঙ্গল চাও, যোদ্ধা ও সেনাদের ব্যূহে রক্ষিত করে তুমি নিজ শিবিরে গমন কর। দুর্যোধনের হিতের জন্যই আমি একথা বলছি।

যদি জীবিত থাকার বাসনা থাকে তবে আমার নির্দেশমত কাজ কর।

কর্ণ বললেন, হে শল্য! আমি নিজ বাহুবলে অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে বাসনা করেছি। আপনি মিত্রের ভান করে শত্রুর ন্যায় আচরণ করছেন যাতে আমি ভীত হয়ে নিজ কর্তব্যে বিরত থাকি। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রও আমায় নিবৃত করতে পারবেন না। শল্য কর্ণকে আরও উত্তেজিত করতে বললেন, হে সূতপুত্র, অর্জুনের শরজাল যখন কৌরব সেনা ও তোমায় নিপীড়িত করবে তখন তোমাকে অনুতাপে দগ্ধ হতে হবে। বালক যেমন মাতৃক্রোড়ে শায়িত থেকে আকাশের চাঁদকে পেতে চায়, তুমিও তেমনি মোহের বশে অর্জুনকে আহ্বান করছ। তুমি ভেক হয়ে মহাগজস্বরূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি তর্জন গর্জন করছ। শশক বেষ্টিত শৃগাল যেমন সিংহ না দেখেই নিজেকে সিংহ বলে মনে করে, তুমিও সেরূপ ধনঞ্জয়কে না দেখেই নিজেকে সিংহ বলে মনে করছ। হে সূতপুত্র. মুষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও হস্তীর, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যে প্রভেদ, তোমার ও ধনঞ্জয়ের মধ্যেও সেই প্রভেদ বিদ্যমান।

শল্যের বাক্যে নিপীড়িত হয়ে কর্ণ ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সর্বগুণবর্জিত। আপনার পক্ষে অন্যের গুণাগুণ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অর্জুন ও কেশবের বলবিক্রম ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই, আমার আছে। স্বর্ণপুঙ্খ সম্বলিত এক ভীষণ শর আমি বহুকাল থেকে কৃষ্ণ ও অর্জুন বধের জন্য রক্ষা করে আসছি। এই শরে আমি এঁদের দুজনকে নিহত করে আপনাকেও সবান্ধব যমালয়ে প্রেরণ করব।

কর্ণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শল্যের প্রতি বিষোদ্‌গার করে আরও বললেন, হে দুর্বুদ্ধি! ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার, আপনি জেনে রাখুন আপনার শত চেষ্টাতেও কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আমি ভয় করব না। নিজের শক্তি সম্বন্ধে আমার সঠিক ধরণা আছে। আমার হস্তে কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিধন অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্যরা মদ্রবাসীদের সম্বন্ধে কী বলেন শুনুন। মদ্রবাসীরা মিত্রদ্রোহী ও পরবিদ্বেষী, তাদের নিজেদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। তারা নীচাশয়, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব। তাদের সঙ্গে মিত্রতা করা অকর্তব্য। তাদের যৌন শালিনতা বলে কিছু নেই। তারা গোমাংসের সঙ্গে মদ্যপান করে। মদ্রদেশের স্ত্রীলোক অসংযত ও স্বেচ্ছাচারিণী। মদ্র, সিন্ধু ও সৌবীর এই তিনটি দেশই পাপে পরিপূর্ণ। সেখানকার লোকজনও, ধর্মজ্ঞানহীন। নিশ্চয়ই পাণ্ডবেরা আমাদের মধ্যে ভেদসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপনাকে পাঠিয়েছে। আপনি দুর্যোধনের মিত্র বলে এবার আপনাকে ক্ষমা করলাম। আবার আমার প্রতি এরূপ বাক্য ব্যবহার করলে আমি গদার আঘাতে আপনার মস্তক বিদীর্ণ করব।

শল্য কোনরূপ দমিত না হয়ে বহুল প্রচারিত কাক ও হংসের কাহিনী বর্ণনা করে বললেন, কাক যেমন অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গর্বভরে হংসকে উড্ডীন

ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে শেষে বিপন্ন হয়ে হংসের সাহায্যে জীবন রক্ষা করেছিল, তুমিও সেরূপ পরিত্রাণের জন্য কৃষ্ণার্জুনের শরণ লও। তুমি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে সর্বদা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অবজ্ঞা করে থাক।

কর্ণ বললেন, পরশুরামের শাপের জন্যই আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। আমি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তির জন্য ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম। একদিন তিনি আমার উরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সেই সময় অর্জুনের হিতকামী দেবরাজ ইন্দ্র এক বিকট কীটের রূপ ধারণ করে আমার উরু দংশন করলে সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল। পাছে গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে আমি নিশ্চল হয়ে থাকলাম। নিদ্রা থেকে উঠে গুরুদেব আমার সহিষ্ণুতা দেখে সন্দিহান হলেন আমি সত্যই ব্রাহ্মণ কি না। কারণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণের এরূপ সহ্য শক্তি থাকা সম্ভব নয়। গুরুদেবের প্রশ্নে আমি সত্য প্রকাশ করলে তিনি আমাকে এই বলে শাপ দিলেন, তাঁর নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র কার্যকালে স্মরণ হবে না, কারণ বেদমন্ত্রযুক্ত অস্ত্র অব্রাহ্মণের নিকট স্থায়ী হয় না। এ জন্য আমি অন্য অস্ত্র স্মরণ করছি অর্জুনাদি শত্রুপক্ষীয় বীরদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য। আমার বিশ্বাস এই অস্ত্রতেই কার্যসিদ্ধি হবে যদি না আমার রথ চক্র গর্তে পড়ে। মদ্ররাজ, বহুপূর্ব অসাবধানতা বশতঃ আমি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎসকে শরাঘাতে বধ করেছিলাম। এই অপরাধে ব্রাহ্মণ আমায় অভিশাপ দিলেন যুদ্ধে আমার মহাভয় উপস্থিত হবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমার রথ গর্তে পতিত হবে। আপনার নিন্দা সত্ত্বেও সৌহার্দের খাতিরে আমি এই সব অভিশাপের কথা আপনাকে বললাম। কর্ণ কাকেও ভয় করেন না। সহস্র শল্যের অভাবেও আমি শত্রুজয়ে সক্ষম।

শল্য প্রত্যুত্তরে বললেন, কর্ণ! তুমি প্রলাপ বকছ। সহস্র কর্ণ ব্যতিরেকে আমারও শত্রুজয়ের ক্ষমতা আছে।

এরপর কর্ণ ও শল্য পরস্পরের দেশবাসীর বিশেষত নারীদের নানা কুৎসা বর্ণনা করতে লাগলেন। শেষে দুর্যোধনের মধ্যস্থতায় তাঁদের কলহের অবসান হল। কর্ণ হেসে শল্যকে রথ চালনা করতে বললেন।

সপ্তদশ দিবসের ভীষণ যুদ্ধে উভয়পক্ষের অগণিত সৈন্যসহ অনেক বীরযোদ্ধা ধরাশয্যা গ্রহণ করলেন। এক সময় কর্ণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন যুধিষ্ঠিরের আঘাতে। কিছুক্ষণ বাদে সংজ্ঞালাভ করে কর্ণ যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষকদের বিনষ্ট করে তাঁর বর্ম বিদীর্ণ করে ফেললেন। পরে যুধিষ্ঠিরের রথও কর্ণের আঘাতে বিনষ্ট হল। কর্ণ নিজ রথ থেকে নেমে যুধিষ্ঠিরের স্কন্ধ স্পর্শ করে বললেন, হে কুন্তীপুত্র, আপনি যুদ্ধবিদ্যার কিছুই জানেন না। আপনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করুন। যুধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে অন্যত্র গমন করলে ভীমসেন কৌরব সেনা আক্রমণ করে শরাঘাতে কর্ণকে অচৈতন্য করে ফেললেন। শল্য কর্ণকে অন্যত্র সরিয়ে নিলেন। পরে সুস্থ হয়ে কর্ণ

ভীমসেনের ধনু ও গদা বিনষ্ট করলেন। এদিকে অর্জুন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে সংসপ্তকদের ছত্রভঙ্গ করলেন। পরে তাঁর আঘাতে অশ্বত্থামা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অশ্বত্থামার সারথী তাঁকে অন্যত্র নিয়ে গেল।

সুযোগ বুঝে কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণের শরবর্ষণে যুধিষ্ঠির ও নকুল গুরুতরভাবে আহত হলেন। তখন শল্য কর্ণকে বললেন, তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজে অস্ত্রশস্ত্র বৃথা নষ্ট করছ? তোমার প্রতিযোদ্ধা যে অর্জুন সে কথা ভুলে যেও না। অর্জুনকে বধ করবে বলেই দুর্যোধন তোমায় এত সম্মান করেন। শল্যের বাক্যে আহত যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডব যোদ্ধাদের ছেড়ে কর্ণ ভীমসেন কর্তৃক আক্রান্ত দুর্যোধনের সাহায্যে এগিয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির আহত অবস্থায় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনও আহত যুধিষ্ঠিরের সংবাদ নিতে সেখানে উপস্থিত হলেন। রণস্থলে কর্ণ পাণ্ডব সেনাদের ধ্বংস করে চললেন।

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখে যুধিষ্ঠির মনে করলেন কর্ণবধের শুভ সংবাদ দিতেই তাঁরা শিবিরে এসেছেন। কর্ণ তখনও জীবিত আছেন জেনে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধস্বরে অর্জুনকে অনেক গালমন্দ করে বললেন, অর্জুন, তুমি যে কর্ণকে এতটা ভয় কর আমি জানতাম না। মহামতি কেশবের সারথ্যে বিশ্বকর্মা নির্মিত শব্দহীন কপিধ্বজ রথে আরোহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত খড়্গ ও গাণ্ডীবধনু ধারণ করে তুমি কেমনে কর্ণের ভয়ে পালিয়ে আসতে পারলে? কর্ণকে বধ করতে অসমর্থ হলে তুমি গাণ্ডীবধনু তোমার চেয়ে নিপুণ কোন শস্ত্রবিদ রাজাকে প্রদান কর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ণ অপেক্ষা তোমার মাতৃগর্ভে মৃত্যুই শ্রেয়কর ছিল। ধিক্ তোমার গাণ্ডীবধনু, ধিক্ তোমার বাহুবল ও মন্ত্রপুতঃ বাণসমূহ। তোমার বানর ধ্বজ ও অগ্নিদত্ত রথেও ধিক্।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যবাণে রোষাবিষ্ট হয়ে অর্জুন তাঁকে অসি নিয়ে বধ করতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বাধা দিয়ে বললেন, হে পার্থ, এখানে তোমার বধযোগ্য কাকেও দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই তোমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয়েছে।

অর্জুন উত্তরে বললেন, হে জনার্দন! আমার প্রতিজ্ঞা আছে যিনি আমাকে গাণ্ডীবধনু অন্যকে সমর্পণ করতে বলবে তাঁকে আমি বধ করব। তোমার সমক্ষেই মহারাজ যুধিষ্ঠির আমায় এই কথা বলেছেন। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই আমি ওঁকে বধ করতে অগ্রসর হয়েছি। এক্ষণে আমার কী করণীয়, বল।

কৃষ্ণ বললেন, হে ধনঞ্জয়, মনে হচ্ছে তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ কর নি। তুমি ধর্মভীরু; ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহ। যে অকর্তব্য কাজকে কর্তব্য ও কর্তব্য কাজকে অকর্তব্য মনে করে সে নরাধম। আমার মতে অহিংসা পরম ধর্ম। বরং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করবে; কিন্তু কখনই প্রাণীহত্যা করবে না। তুমি মুর্খের ন্যায় যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করতে যাচ্ছো। ভীষ্মাদি গুরুজনগণ

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা কীর্তন করছি, মন দিয়ে শোন। সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। কিন্তু সময় সময় সত্যাসত্য নির্ণয় করা অতি দূরুহ। যেখানে মিথ্যাকথন হিতকর সেখানে সত্য না বলে মিথ্যা বলাই ভাল। বিবাহ, রতিক্রীয়া, প্রাণসংশয়, সর্বনাশের সম্ভাবনায় ও ব্রাহ্মণের হিতের জন্য মিথ্যা কথনে পাপ স্পর্শ করে না।

অতঃপর কৃষ্ণ ধর্মবিষয়ক নানা উপদেশ প্রদান করে বললেন, যে কাজে হিংসা নেই তাই ধর্ম। হিংসা নিবারণের জন্যই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যের জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা বলার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। প্রাণনাশ, বিবাহ, জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস—এই কয়েকটি স্থলে মিথ্যা বললে কোন দোষ হয় না। মিথ্যা অঙ্গীকার দ্বারা দুষ্টলোকের কবল থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হলে মিথ্যাই বলা উচিত। এখানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ।

কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের জ্ঞানোদয় হল। তিনি বললেন, ধর্মরাজের বধ চিন্তা করে আমি মহাপাপ করেছি। এক্ষণে তুমি এমন উপায় কর যাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং সেই সঙ্গে আমার ও ধর্মরাজের জীবন রক্ষা পায়।

কৃষ্ণ বললেন, সখে! ধর্মরাজ কর্ণের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে পরিশ্রান্ত ও অপমানিত হয়ে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। মনের এই অস্বাভাবিক অবস্থান হেতু তিনি তোমার প্রতি এই কটুবাক্য ব্যবহার করেছেন। ধর্মরাজের উদ্দেশ্য ছিল কর্ণের বিরুদ্ধে তোমাকে উত্তেজিত করা। কারণ তুমিই কর্ণকে বধ করার ক্ষমতা রাখ এবং কর্ণের মৃত্যু হলেই তোমাদের জয় সুনিশ্চিত। যাক্ আমি একটি উপায় বলছি যাতে ধর্মরাজ জীবিত থেকেও মৃত বলে নির্দিষ্ট হতে পারেন। এতে তোমার প্রতিজ্ঞাও পালিত হবে এবং ধর্মরাজের জীবনও রক্ষা পাবে। পার্থ, এই জগতে মাননীয় ব্যক্তি অপমানিত হলেই তিনি জীবন্মৃত বলে কথিত হন। তুমি ধর্মরাজকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে তাঁকে নানা কথায় অপমানিত কর।

নির্দেশ মত অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে রাজন, তুমি রণস্থল থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিলে। সেজন্য যুদ্ধপরিস্থিতি সম্বন্ধে তোমার কোনই ধারণা নেই। ভীমসেন কৌরবদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধে রত ছিলেন। আমার কোন বিচ্যুতি হলে তিনিই অমায় তিরস্কার করতে পারতেন। তুমি সর্বদা সুহৃদগণ দ্বারা সুরক্ষিত থাক। যুদ্ধে তোমার কোন অবদান নেই। আমাকে তিরস্কার করার তোমার কোন অধিকার নেই।

এইভাবে আরও নানা কটুকথায় অন্যান্যদের সম্মুখে ধর্মরাজকে নিদারুণভাবে অপমানিত করে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করে নিতান্ত গর্হিত কার্য করেছি। আত্মহত্যা করে আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে পার্থ! তুমি আত্মঘাতী হলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা গুরুতর নরকে নিপতিত হবে। এক্ষণে সকলের সম্মুখে নিজের গুণকীর্তন কর। তাহলেই তোমার

আত্মবিনাশ হবে। সেইমত অর্জুন আত্মশ্লাঘা করে বললেন, হে রাজন, মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহ নেই। সমস্ত জগত ধ্বংস করার ক্ষমতা আমার আছে। আমার পরাক্রমেই ইন্দ্রপ্রস্থে দিব্য সভাগৃহ নির্মিত হয়েছিল। রাজসূর্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানও আমার জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। আমি এই যুদ্ধে কৌরব সেনার প্রায় অর্ধাংশ ধ্বংস করেছি। কৃষ্ণ ও আমি এখন কর্ণবধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। প্রতিজ্ঞা করছি অদ্য কর্ণকে বধ না করে আমি আমার রক্ষাকবচ পরিত্যাগ করব না।

এই কথা বলে অস্ত্রাদি রেখে অধোমুখে কৃতাঞ্জলীপুটে ধর্মরাজ সমীপে গমন করে বললেন, হে মহারাজ, আপনাকে নমস্কার করছি। আপনি প্রসন্ন হয়ে আমায় ক্ষমা করুন। আমি কর্ণবধের জন্যই জীবন ধারণ করে আছি।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, হে অর্জুন, আমার দোষের জন্যই তোমরা এই বিপদে পতিত হয়েছ। আমা হতেই আমাদের কুলবিনষ্ট হল। আমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তুমি এখনই আমার মস্তক ছেদন কর। অথবা আমি বনে গমন করব। ভীমসেন রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আমি তোমার নিষ্ঠুর বাক্য সইতে পারছি না। এই বলে যুধিষ্ঠির গাত্রোত্থান করে বনগমনের উদ্দেশ্যে শিবির পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

এমন সময় কৃষ্ণ ধর্মরাজকে প্রণাম করে বললেন, হে মহারাজ, গাণ্ডীব সম্বন্ধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা আপনার অবিদিত নেই। আপনি অর্জুনকে গাণ্ডীবধনু অন্যের হস্তে সমর্পন করতে বলেছেন, সে জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য আমার নির্দেশে আপনাকে অপমান করেছেন। সম্মানিত ব্যক্তির অপমানই মৃত্যুস্বরূপ। আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হলাম। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমরা যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন। আপনাকে কথা দিচ্ছি অর্জুন অদ্যই-সূতপুত্র কর্ণকে বধ করবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ, তোমার বাক্য যথার্থ। আমি অর্জুনকে গাণ্ডীবধনু অন্যের হাতে অর্পণ করতে বলে অন্যায় করেছি। তুমি আজ আমাদের ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করলে।

তখন কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রতি কটুবাক্য বলার জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর পদতলে পতিত হলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে উঠিয়ে আলিঙ্গনা বদ্ধ করে রোদন করতে লাগলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় নিয়ে কর্ণ বধের জন্য রথে রণস্থল অভিমুখে ধাবিত হলেন।

রথে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, অর্জুন, যদিও তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই, তবুও তুমি কর্ণকে হেয়জ্ঞান করো না। এ পর্যন্ত দুপক্ষেরই বিপুল সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছে। কৌরব পক্ষে এখন অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কর্ণ, শল্য ও কৃপাচার্য—এই পাঁচজন মহারথ জীবিত আছেন। অশ্বত্থামা তোমার গুরু দ্রোণের পুত্র, কৃপ তোমার কুলগুরু ও আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলের বান্ধব, শল্য তোমার বিমাতার ভ্রাতা। এ কারণে এঁদের

প্রতি তোমার দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পাপাত্মা কর্ণকে কোন দুর্বলতা না দেখিয়ে সত্বর তাঁকে বধ কর। অর্জুন বললেন, বাসুদেব! তোমার সহায়তায় এই ত্রিলোকের সকলকে পরলোকে পাঠাতে পারি।

যুধিষ্ঠির আহত হয়ে শিবিরে প্রস্থান করেছেন। অর্জুনও শিবির থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন না। ভীমসেন ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অচিরেই অর্জুনের রথধ্বজ দৃষ্টিগোচর হলে ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডব বীরগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কর্ণের আদেশে দুর্যোধন, কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণ কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করলেন। কর্ণের উদ্দেশ্য এই ভাবে কৃষ্ণার্জুন পরিশ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হলে পরে তিনি তাঁদের বধ করবেন। কিন্তু কর্ণের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। কৌরব বীরগণ অর্জুনের শরজালে নিপীড়িত হয়ে চারিদিকে পলায়ন করলেন। অর্জুন তখন ভীমসেনের নিকট গিয়ে তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কুশল সংবাদ জানিয়ে অন্যত্র যুদ্ধে নিযুক্ত হলেন এবং বহু শত্রুসৈন্য ধ্বংস করলেন।

এদিকে দুঃশাসন শরনিক্ষেপ করতে করতে ভীমসেনের নিকট এগিয়ে এলেন। দুজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। ভীমসেনের পদাঘাতে দুঃশাসন গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সেই সময় ভীমসেন নিজ রথ থেকে নেমে অসি দিয়ে দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে পূর্ব প্রতিজ্ঞামত হস্তিনাপুর রাজসভায় দ্রোপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাঁর রক্তপান করলেন। রক্তপায়ী ভীমসেনকে দেখে কৌরব সেনা আতঙ্কিত হয়ে চারিদিকে পলায়ন করল।

দুঃশাসনের পর ভীমসেনের হস্তে প্রাণ দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের দশপুত্র সহ কর্ণপুত্র বৃষসেন। পুত্রবধে অধীর হয়ে কর্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে সেখানে সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হলেন ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ পুত্রদের জয় কামনায় নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে লাগলেন। কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি ভয়ঙ্কর মহাস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করে রণস্থল মথিত করে ফেললেন। উভয় পক্ষের অসংখ্য হস্তী, রথ ও পদাতিক বিধ্বস্ত হল। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দর্শনে বিচলিত হয়ে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের হাত ধরে বললেন, দুর্যোধন, এই যুদ্ধ বন্ধ কর। পাণ্ডবদের বিরোধিতা পরিত্যাগ কর। আমি বারণ করলে অর্জুন অস্ত্র সংবরণ করবেন; কৃষ্ণও যুদ্ধ চান না। সন্ধি করলে পাণ্ডবগণ তোমার অনুগত হয়ে থাকবেন।

দুর্যোধন উত্তরে বললেন, সখা, তোমার প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য; কিন্তু ভীমসেনের হস্তে দুঃশাসনের নৃশংস হত্যার পর শান্তি কী ভাবে সম্ভব? পাণ্ডবগণ আমাকে বিশ্বাস করবেন না পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে। কর্ণকেও নিরস্ত করা যাবে না। আজ যুদ্ধে অর্জুন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছেন। কর্ণের পক্ষে তাঁকে বধ করা কঠিন হবে না।

কর্ণ ও অর্জুন অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে শরনিক্ষেপ করে পরস্পরকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। একবার কর্ণের শরে অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুর জ্যা ছিন্ন হয়ে গেল। এই অবসরে

কর্ণ বানবর্ষণে অর্জুনকে আচ্ছন্ন করে কৃষ্ণকে নারাচ (দীর্ঘ বাণ) দিয়ে বিদ্ধ করলেন। অবস্থা দেখে মনে হল কৃষ্ণার্জুন পরাভূত হয়েছেন। কৌরব সেনা উল্লাসে সিংহনাদ করে উঠল। কিয়ৎকাল পরে অর্জুন গাণ্ডীবে নূতন জ্যা আরোপ করে কর্ণ, শল্য, ও অন্যান্য কৌরব যোদ্ধাদের বিদ্ধ করে কর্ণের পার্শ্বরক্ষীদের বিনষ্ট করে ফেললেন। হতাবশিষ্ট কৌরব বীরগণ দুর্যোধনের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করতে লাগলেন।

তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের মাতা পাণ্ডবদাহের সময় অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। সে মাতৃবধের প্রতিশোধ নিতে শররূপ ধারণ করে কর্ণের তূণে প্রবিষ্ট হল। কর্ণ না জেনে এই শর ধনুতে যোগ করলেন। সারথি শল্য কর্ণকে অন্য শর ব্যবহার করতে বললেন। তাঁর মতে এই শরে অর্জুনের শিরচ্ছেদ করা সম্ভব হবে না। কর্ণ বললেন, আমি—দুবার শরসন্ধান করি না। এই বলে তিনি শর নিক্ষেপ করলেন। সকলে হাহাকার করে উঠল। এই ভীষণ দর্শন শর সশব্দে উড্ডীন হয়ে আকাশ অগ্নিবর্ষণে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অর্জুনের বিপদ দেখে কৃষ্ণ তাঁর রথ একহাত মাটিতে প্রোথিত করলেন। রথের চার অশ্বও দ্বারা মাটি স্পর্শ করল। নাগশরে অর্জুনের স্বর্ণ কিরীট দগ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অর্জুন প্রাণে বেঁচে গেলেন। শররূপী মহানাগ অশ্বসেন কর্ণের নিকট নিজ পরিচয় দিয়ে আবার তাকে শর নিক্ষেপ করতে অনুরোধ করল লক্ষ্য বস্তুর দিকে দৃষ্টি রেখে। বলল, এতেই তাঁদের উভয়ের শত্রু অর্জুনকে বধ করা সম্ভব হবে। কর্ণ অশ্বসেনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে জানালেন তিনি অন্যের শক্তি, অবলম্বন করে কার্যোদ্ধার করতে চান না। তখন অশ্বসেন নিজেই অর্জুনকে বধ করতে অগ্রসর হলে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন তাকে বাণদ্বারা কেটে ভূপাতিত করলেন। অর্জুন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হলে কৃষ্ণ দুইহাতে টেনে তাঁদের রথ ভূমি থেকে উঠিয়ে আনলেন। ব্যর্থ হল অশ্বসেনের অর্জুন বধের সকল পরিকল্পনা।

এরপর কর্ণ ও অর্জুন পুনরায় পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অর্জুনের শরে কর্ণের স্বর্ণ কিরীট, কুন্ডল ও বর্ম বিনষ্ট হল। এই অবস্থায় অর্জুন এক লৌহময় বাণে বর্মহীন কর্ণের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করলেন। কর্ণ ধনুর্বান ত্যাগ করে রথের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ধর্মজ্ঞ অর্জুন অস্ত্রবিহীন আহত কর্ণকে বধ অনুচিত বিবেচনা করে শরবর্ষণে বিরত থাকলেন। অর্জুনের মনোভাব বুঝে কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, তুমি অকারণে প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ। পণ্ডিতগণ বিপদগ্রস্ত শত্রুকে নিধন করে ধর্ম ও যশ দুইই লাভ করেন। তুমি কর্ণকে এখনই বধ কর। নচেৎ কর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে তোমাকে আক্রমণ করবেন। কৃষ্ণের উপদেশমত অর্জুন উপর্যোপরি শরবর্ষণ করে কর্ণকে বিদ্ধ করে ফেললেন। কর্ণ গুরুতর আহত অবস্থায় অতি কষ্টে অর্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। কর্ণের বিনাশ সময় উপস্থিত হওয়ায় কাল অদৃশ্যভাবে ব্রাহ্মণের শাপের কথা জানিয়ে বললেন, সূতপুত্র, বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করছেন। কালের বাক্য

শেষ হতেই কর্ণ গুরু পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হলেন। বসুন্ধরাও তাঁর রথচক্র গ্রাস করতে লাগলেন। এই ঘোরতর বিপর্যয়ে কর্ণ অতিশয় বিষণ্ণ ও বিহ্বল হয়ে আক্ষেপের স্বরে বললেন, ধার্মিক ব্যক্তিরা বলে থাকেন, ধর্ম ধার্মিককে সতত রক্ষা করেন। সর্বদা ধর্মপথে থেকেও ধর্ম আমায় রক্ষা করলেন না। মনে হয় ধর্ম ধার্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা না করে বিনাশই করেন। এরপরও কর্ণ শরবর্ষণ করে অর্জুনকে বিব্রত বিপর্যস্ত করতে লাগলেন। তখন কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন এক ভয়ংকর দিব্যাস্ত্র ধনুতে যোজনা করলেন। এদিকে কর্ণের রথচক্র ভূমিতে আরও প্রোথিত হল। উপায় না দেখে কর্ণ নিজেই রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে হস্তদ্বারা রথচক্র উদ্ধারের চেষ্টা করলেন; কিন্তু কিছুতেই সফল হলেন না। ক্রোধে অশ্রুবিসর্জন করে কর্ণ আক্রমণোদ্যত অর্জুনকে বললেন, হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি মুহূর্তকালে যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। দৈবাক্রমে আমার রথচক্র ভূমিতে প্রোথিত হয়েছে। আমি ইহা উদ্ধারের চেষ্টা করছি। তুমি কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করো না। সদ্ভাবাপন্ন বীরগণ কখনই অস্ত্রহীন, কবচহীন বিপদগ্রস্ত বিপক্ষের প্রতি অস্ত্রক্ষেপণ করেন না। তুমি রথোপরি অবস্থান করছ। আমার রথচক্র উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বিনাশ করা তোমার অকর্তব্য। আমি বাসুদেব বা তোমাকে বিন্দুমাত্র ভয় করি না। ক্ষত্রিয় কুলে তোমার জন্ম। কুলধর্ম স্মরণ করে তুমি আমাকে ক্ষণকাল ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ তখন বললেন, হে রাধেয়! তুমি ধর্মের কথা শুনাচ্ছ। তুমি যখন কৌরব সভায় দ্রৌপদীকে অপমানিত করছিলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? তোমার সম্মতিতে দুর্যোধন যখন শকুনির সাহায্যে কপট দ্যূতে অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য সম্পদ অধিকার করেছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন বালক অভিমন্যুকে অন্যান্যদের সঙ্গে তুমি নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলে তখনই বা তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এখন ধর্মের কথা বলে তুমি নিষ্কৃতি পাবে না।

বাসুদেবের কথায় কর্ণ নিরুত্তর রইলেন। তিনি ক্রোধে ওষ্ঠ কম্পিত করে এক ভয়ঙ্কর বাণ অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। বাণের আঘাতে অর্জুন সংজ্ঞাহীন হলেন, গাণ্ডীব হাত থেকে পড়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথচক্র উদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। ইতিমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে অর্জুন ক্ষুরগ্র বাণ দিয়ে কর্ণের রথধ্বজ কেটে ফেললেন। পরে অগ্নি ও যমের ন্যায় করাল অঞ্জলিক বাণ-দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন করলেন। নিপতিত কর্ণের প্রাণহীন দেহ থেকে একটি তেজ আকাশে উঠে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করল। পাণ্ডবসেনা কর্ণের মৃত্যুতে উল্লাসে ফেটে পড়লেন। শল্য কর্ণের ধ্বজহীন রথ নিয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। কর্ণের শোণিতাক্ত শরচ্ছিন্ন মরদেহ ভূমিতে পড়ে রইল।

কর্ণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন বিরাট বাহিনী নিয়ে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তাঁর সৈন্যদল পাণ্ডবদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে চারিদিকে পলায়ন করতে লাগল। দুর্যোধন নিজ সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে ব্যর্থ হলেন। শল্য, অশ্বত্থামা ও অনান্য যোদ্ধাদের অনুরোধে দুর্যোধন হতাবশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে 'হা কর্ণ, হা কর্ণ' বলে অশ্রুপাত করতে করতে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে যুধিষ্ঠির রণস্থলে এসেছিলেন; কিন্তু কর্ণের বাণে আহত হয়ে পুনরায় শিবিরে চলে আসেন। সেখানে কৃষ্ণার্জুন যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করে কর্ণের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। পরে কৃষ্ণার্জুনের রথে যুধিষ্ঠির রণস্থলে শায়িত মহাবীর কর্ণের প্রাণহীণ দেহ দেখে কৃষ্ণ ও অর্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করে কৃষ্ণকে বললেন, হে গোবিন্দ, এতদিন পর তোমার অনুগ্রহে আজ আমি সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হব।

কৌরব শিবিরে কৃপাচার্য দুর্যোধনকে বললেন, আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। অবশিষ্ট যোদ্ধাদের সঙ্গে তোমার জীবনও বিপন্ন। এ অবস্থায় পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি করাই কর্তব্য। আমার বিশ্বাস ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণ অনুরোধ করলে দয়ালু যুধিষ্ঠির তোমাকেই রাজ্যপদ প্রদান করবেন।

দুর্যোধন বললেন, হে আচার্য! মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, সেইরূপ আমিও আপনার হিতকরবাক্য গ্রহণ করতে পারছি না। আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য হতে নির্বাসিত করেছি; তাঁকে কপট দ্যূতে পরাজিত করেছি। তিনি এখন আমাদের কথা শুনবেন কেন? শান্তিদূত হিসাবে কৃষ্ণকে আমরা প্রতারিত করেছি। তিনিই বা আমাদের বিশ্বাস করবেন কেন? অভিমন্যুর হত্যা কী ভাবে তাঁরা বিস্মৃত হবেন? ভীমসেন আমাদের বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। নকুল সহদেবও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। ধৃতদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমাদের পুরাতন শত্রু। দ্যূত সভায় অপমানিত হয়ে দ্রৌপদী আমাদের বিনাশ কামনায় কঠোর তপস্যা করেছেন। তিনি আমাদের কখনই ক্ষমা করবেন না। বিশেষত অভিমন্যুর বধের পর যে বৈরানল সৃষ্টি হয়েছে তা নির্বাপিত হওয়ার নয়। এই সসাগরা পৃথিবী ভোগ করে কেমনে আমি পাণ্ডবদের প্রসাদে রাজ্যভোগ করব? এখন দুর্বলতা প্রদর্শনের সময় নয়। আমাদের যুদ্ধের পথেই অগ্রসর হতে হবে। যে সকল বীর যোদ্ধা আমার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ ও ঋণ শোধের বাসনায় আমি রাজ্যপদ গ্রহণে অভিলাষী নই। পিতামহাদি বীরগণকে মৃত্যুর পথে পাঠিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নিজের জীবন রক্ষা করলে আমি লোকের কাছে নিন্দনীয় হব। এখন যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গে গমনই শ্রেয়কর মনে করছি। রাজ্যলাভে আমার কোন অভিরুচি নেই। দুর্যোধন এই কথা বললে উপস্থিত রাজন্যবর্গ তাঁকে 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন।

কর্ণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন মদ্ররাজ মহাবীর শল্যকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করে আগামী কালের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এ সংবাদ পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছিলে যুধিষ্ঠির

শঙ্কিত হয়ে পাণ্ডবদের কর্তব্য সম্বন্ধে কৃষ্ণের অভিমত প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি ভিন্ন অন্য কেউই মদ্ররাজকে বধ করতে সক্ষম হবেন না। আপনি কিন্তু মাতুল মনে করে মদ্ররাজের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করবেন না। ক্ষাত্রধর্ম পালন করে মদ্ররাজকে বধ করুন।

অষ্টাদশ দিবসের ভীষণ যুদ্ধে প্রথমে কর্ণের তিন পুত্র নকুলের হস্তে ও শল্যের পুত্র সহদেবের হস্তে নিহত হলেন। মদ্ররাজের সঙ্গে ভীমসেনের যুদ্ধে দুজনেই আহত হলেন। জয়পরাজয় অনিশ্চিত রইল। উভয়পক্ষেরই ক্ষতি হল অসামান্য। এরপর ভীমসেন, অর্জুন, সাত্যকি প্রভৃতি বীরদের পাণ্ডব সেনার বিভিন্ন দিক রক্ষা করতে আদেশ দিয়ে যুধিষ্ঠির শল্যকে আক্রমণ করে তাঁর রথের চার অশ্ব ও দুই সারথীকে বিনষ্ট করলেন। অশ্বত্থামা শল্যকে নিজের রথে তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ বাদে শল্য অন্য রথে আবার যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুধিষ্ঠিরের শরে শল্যের চার অশ্ব নিহত হল। শল্য রথ থেকে নেমে খড়্গ ও ঢাল নিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। ভীমসেন এগিয়ে এসে বাণদ্বারা শল্যের খড়্গ ও ঢাল বিনষ্ট করে ফেললেন। যুধিষ্ঠির তখন কৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করে এক মন্ত্রসিদ্ধ শক্তি অস্ত্র দিয়ে নিরস্ত্র শল্যকে বধ করলেন। শল্যের ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তিনিও যুধিষ্ঠিরের হস্তে প্রাণ দিলেন।

অষ্টাদশ দিবসের আরও যুদ্ধে কৌরব বীর শাল্ব গান্ধাররাজ শকুনি ও পুত্র উলুক এবং ধৃতরাষ্ট্রের অবশিষ্ট পুত্রগণসহ কৌরব পক্ষীয় বহু বীর নিহত হলেন। হতাবশিষ্ট কৌরব সেনা দুর্যোধনের উৎসাহে যুদ্ধ করতে লাগল। শেষে তারাও বিনষ্ট হল। এইভাবে দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। পাণ্ডবদের অবশিষ্ট রইল দশ হাজার পদাতিক, পাঁচহাজার অশ্ব, সাত শত হস্তী ও দুহাজার রথ। আর যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই বুঝতে পেরে দুর্যোধন একাকী ক্ষতবিক্ষত দেহে তাঁর মৃত অশ্বকে পরিত্যাগ করে গদাহস্তে পূর্বমুখে গমন করলেন।

।। চৌদ্দ।।

এদিকে যুদ্ধশেষে হস্তিনাপুরের পথে সাত্যকি সঞ্জয়কে দেখতে পেয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ব্যাসদেবের হস্তক্ষেপে সঞ্জয়ের জীবন রক্ষা পেল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সঞ্জয় দুর্যোধনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে যুদ্ধের শেষ সংবাদ জানালেন। দুর্যোধন সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাবে আমি দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছি।

সঞ্জয়কে বিদায় দিয়ে দুর্যোধন দ্বৈপায়ণ হ্রদে এসে মায়াদ্বারা জল স্তম্ভিত করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। পথে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা সঞ্জয়ের নিকট দ্বৈপায়ণ

হ্রদে দুর্যোধনের আশ্রয় গ্রহণের কথা জানতে পারলেন। অশ্বত্থামা বললেন, ধিক আমাদের জীবন ; আমরা যে জীবিত আছি রাজা দুর্যোধন তাহা জানেন না। আমরা সকলে এক সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি। দূরে পাণ্ডবদের আসতে দেখে তাঁরা দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করলেন। পাণ্ডবগণ তাঁদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা সকলের অজ্ঞাতে হ্রদের তীরে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, তুমি জল থেকে উঠে এলে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়লাভ করে পৃথিবী ভোগ কর অথবা মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে গমন কর। দুর্যোধন জানালেন, আপনারা এখন পরিশ্রান্ত, আমিও ক্ষতবিক্ষত। আজ রাত্রি বিশ্রাম করে কাল আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হব। অশ্বত্থামা বললেন, তুমি এখনই উঠে এস, আজই আমি সোমক ও পাঞ্চালদের বধ করব।

দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার কথাবার্তা জলপানরত কয়েকজন ব্যাধ অন্তরাল থেকে শুনতে পেল। তারা পাণ্ডব শিবিরে মাংস শরবরাহের কাজে নিযুক্ত ছিল। দুর্যোধন হ্রদের জলে লুকিয়ে আছেন জেনে তারা দ্রুত পাণ্ডব শিবিরে এসে ভীমসেনকে সব জানাল। দুর্যোধনের অবস্থান জেনে পাণ্ডবগণ কাল বিলম্ব না করে রথে দ্বৈপায়ণ হ্রদের তীরে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আসার পূর্বে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা সেস্থান ত্যাগ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, বাসুদেব, দুর্যোধন মায়াবলে হ্রদের জল স্তম্ভিত করে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে; এখন কোন মনুষ্য হতেই তাঁর কোন ভয় নেই। কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ! আপনি মায়াবলে মায়াবী দুর্যোধনের মায়া নষ্ট করুন। আপনি কোন কুট উপায় দ্বারা দুর্যোধনকে বিনষ্ট করুন। এই উপায়েই দানবরাজ বলি, রাবণ, তারকাসুর প্রভৃতি নিহত হয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সহাস্যে জলে লুক্কায়িত দুর্যোধনকে বললেন, কুরুরাজ, তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও নিজ আত্মীয় বন্ধুবর্গকে বিনষ্ট করে কী নিমিত্ত আপন জীবন রক্ষার জন্য জলের মধ্যে প্রবেশ করেছ? ক্ষত্রিয় কুলে তোমার জন্ম, যুদ্ধে ভীত হয়ে জলের মধ্যে অবস্থান করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত নহে। তুমি বৃথাই সর্বসমক্ষে নিজেকে বীর বলে গর্ব করতে। প্রকৃত বীরপুরুষেরা কখনই শত্রুর ভয়ে পলায়ণ করে না। তুমি জল থেকে উঠে যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করে এই পৃথিবী ভোগ কর, নতুবা আমাদের হস্তে নিহত হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ কর।

দুর্যোধন উত্তরে বললেন, মহারাজ! আমি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসিনি। আমি রথ, তূণ ও সারথী হারিয়ে সহায়হীন একাকী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য জলের মধ্যে প্রবেশ করেছি। আমি অবিলম্বেই জল থেকে উঠে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হব।

দুর্যোধনের বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁকে জল থেকে উঠে আসতে বললেন। তখন দুর্যোধন বললেন, মহাবীর দ্রোণাচার্য, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়ায় আমার আর যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা নেই। এক্ষণে তুমিই বন্ধুবান্ধবহীন পৃথিবী ভোগ কর। আমি মৃগচর্ম পরিধান করে বনবাস গমনে বাসনা করেছি। রাজ্য ভোগে আমার কোন স্পৃহা নেই। যুধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আমরা দুজনই জীবিত থাকলে লোকে আমাদের জয়পরাজয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে। অতএব হয় তুমি আমাকে পরাজিত করে রাজ্যসুখ ভোগ কর, নতুবা আমার হস্তে নিহত হয়ে তুমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তোমার জীবন এখন আমার অধীন। তুমি ইচ্ছা করলেই নিষ্কৃতি পেতে পার না।

এরপর দুর্যোধন গদাহস্তে জল থেকে উঠে এসে বললেন, হে কুন্তীনন্দন, তোমরা সকলে রথোপরি ও সশস্ত্র। আমাকে বেষ্টন করে আছ; কিন্তু আমি একাকী রথবিহীন ও পরিশ্রান্ত। এই অবস্থায় আমি তোমাদের সঙ্গে কী প্রকারে সংগ্রাম করতে পারি? তোমরা একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের সকলকেই একে একে সংহার করব সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠির বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। ইচ্ছামত অস্ত্রগ্রহণ করে তুমি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। কথা দিচ্ছি আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হবে। এই কথা শুনে দুর্যোধন গদা উদ্যত করে উচ্চৈস্বরে পাণ্ডবদের একে একে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আহ্বান করলেন। তখন কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আপনি কেন এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন আপনাদের মধ্যে একজনকে নিহত করলেই সমুদয় রাজ্য দুর্যোধন পাবে? এখন যদি দুরাত্মা দুর্যোধন আপনাকে অথবা অর্জুন, নকুল বা সহদেবকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করে তবে আপনার পরিণামে কী হবে তা কি অবগত আছেন? আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতিত দুর্যোধনের সমকক্ষ কোন বীর নেই। তিনিও দুর্যোধনের ন্যায় এতদিন ধরে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করেন নি। মনে হচ্ছে পাণ্ডুপুত্রদের রাজ্যভোগ কপালে নেই। ভীমসেন সব শুনে এগিয়ে এসে বললেন, আর বিবাদের প্রয়োজন নেই। আমি গদাযুদ্ধে দুর্যোধনকে বিনষ্ট করে বৈরানল নির্বাপিত করব। তোমরা আমার যুদ্ধ কৌশল দর্শন কর। এই বলে ভীমসেন দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

এমন সময় রোহিনীনন্দন বলরাম তীর্থভ্রমণ শেষ করে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যদ্বয় দুর্যোধন ও ভীমসেনের আসন্ন গদাযুদ্ধের কথা অবগত হলেন। তাঁর উপদেশ মত পূণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে গদাযুদ্ধ সংঘটিত হল। বহু সময় পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলল; কিন্তু উভয়ে গুরুতর আহত হয়েও পরাজয় স্বীকার করলেন না। এই দুই বীরের মধ্যে কে শ্রেয়? অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, ভীমসেন অধিক বলশালী, তবে দক্ষতায় ও যত্নে দুর্যোধন শ্রেষ্ঠ। ন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে বধ করা সম্ভব হবে না, অন্যায় যুদ্ধেরই আশ্রয় নিতে হবে। দ্যূত সভায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের যে প্রতিজ্ঞা ভীমসেন করেছিলেন এখন তিনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন।

কেবল নিজের বলের উপর নির্ভরশীল হয়ে ভীমসেন যুদ্ধ করলে যুধিষ্ঠির মহাবিপদে পতিত হবেন। অর্জুন বাসুদেবের কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে নিজের জানুতে আঘাত করে ভীমসেনকে সংকেত দিলেন। ভীমসেন সুযোগ বুঝে পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে সেইমত দুর্যোধনের জানুদ্বয় ভগ্ন করে তাঁকে ভূতলে নিপতিত করলেন। ধরাশায়ী দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হয়ে ভীমসেন বললেন, হে দুরাত্মন, তুমি হস্তিনাপুর রাজ-সভায় আমাদের যে উপহাস ও দ্রৌপদীকে যে অপমান করেছিলে তার ফল ভোগ কর। এই বলে তিনি বামপদদ্বারা দুর্যোধনের মস্তকে বার বার আঘাত করতে লাগলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বললেন, সৎ পথেই হোক বা অসৎ পথেই হোক, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছ। এখন শান্ত হও। দুর্যোধন আমাদের জ্ঞাতি; তিনি একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের ও কৌরবদের অধিপতি ছিলেন। তাঁর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পদাঘাতে তাঁকে এমনভাবে অপমান করা তোমার উচিত হয় নি। এই বলে তিনি দুর্যোধনের সমীপে গমন করে বললেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তোমার দোষেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রাণ হারাল। শেষে তুমিও নিহত হলে। যা হোক, এক্ষণে তোমার শোক করা উচিতনয়। মৃত্যুই তোমার সকল দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাবে। তুমি মর্ত্যভূমি ত্যাগ করে স্বর্গলোকে গমন করবে। আর আমরা প্রিয়জনদের মৃত্যুজনিত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে জীবনে বেঁচে থাকব। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ সর্বদা আমাদের অভিসম্পাতে জর্জরিত করবেন। এই বলে যুধিষ্ঠির বিলাপ করতে লাগলেন।

এদিকে দুর্যোধনের উরুদেশে আঘাত করার জন্য বলদেব ভীমসেনকে ধিক্কার দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, ধর্মযুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত করে ভীমসেন অতি গর্হিত কার্য করেছে। এমন কুকার্যের অনুষ্ঠান পূর্বে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নি। এই বলে বলদেব ক্রোধে অধীর হয়ে তাঁর লাঙ্গল উদ্যত করে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হলে কৃষ্ণ তাঁর বাহুদ্বয় ধারণ করে তাঁকে বাধা দিলেন। বলদেবের ক্রোধ প্রশমিত করতে কৃষ্ণ বললেন, হে মহাত্মন, শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতির বিষয় উল্লেখ আছে। সেগুলি হল নিজের উন্নতি, নিজমিত্রবর্গ ও তাদের বন্ধুবান্ধবদের উন্নতি, শত্রুর অবনতি ও শত্রুর মিত্র ও তাদের বন্ধুবান্ধবদের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা নিজের ও নিজ মিত্রগণের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান থাকবেন। পাণ্ডবগণ আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র। তাঁরাই আমাদের সহজ মিত্র। তাঁদের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম। ভীমসেন পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন। দুর্যোধনের উপর ঋষির অভিশাপও ছিল তিনি উরুভঙ্গ হয়ে মৃত্যু বরণ করবেন। এমতাবস্থায় ভীমসেনের কার্যে আমি কোন দোষ দেখছি না। আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। পাণ্ডবদের উন্নতিতে আমাদেরই উন্নতি হবে সন্দেহ নেই। বলরাম উত্তরে বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মের তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। কেবল সাধু ব্যক্তিগণই

ধর্মানুষ্ঠান করে থাকেন। অর্থলোভ ও আসক্তি মানুষকে ধর্মহীন করে। যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, যথার্থ সুখভোগ তারই করায়ত্ব। তুমি যত ব্যাখ্যাই দেও না কেন ভীমসেন যে অধর্মাচরণ করেছে সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ বলদেবকে শান্ত করতে বহু চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। বলদেব বললেন, ভীমসেন ধর্মপরায়ণ দুর্যোধনকে অধর্মাচরণে নিহত করেছে। সেজন্য ভীমসেন জগতে কুটযোদ্ধা বলে কুখ্যাত হবে। ধর্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন বলে দুর্যোধন পরলোকে সদ্গতি ও ইহলোকে যশোলাভ করবেন। এই বলে বলদেব পাঞ্চাল, যাদব ও পাণ্ডবদের বিষাদে নিমগ্ন করে রথে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করলেন।

বলরাম প্রস্থান করলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে কেমনে অবচেতনপ্রায় কৌরব প্রধান দুর্যোধনের প্রতি ভীমসেনের এই অমানবিক ব্যবহার উপেক্ষা করলেন? যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেন যে দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেছে তা আমি চাই নি। কিন্তু ভীমসেনের মনের অবস্থাও চিন্তা করতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দের শঠতাচরণ ও কটুক্তি ভীমসেনের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে আমি দুর্যোধনের কার্য উপেক্ষা করেছি। কৃষ্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের বাক্য অনুমোদন করলেন।

অতঃপর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ভীমসেনের প্রশংসা ও দুর্যোধনের নিন্দা করতে লাগলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন, হে নৃপতিগণ, মৃতকল্প ব্যক্তির প্রতি এরূপ কটুক্তি করা উচিত নয়। দুর্যোধন যখন গুরুজনদের উপদেশ উপেক্ষা করে পাণ্ডবদের তাঁদের পৈতৃকরাজ্যের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন আমি তখনই বুঝেছিলাম এটা নিয়তিরই বিধান। তিনি এখন শত্রুমিত্রের ঊর্ধ্বে উঠে কাষ্ঠের ন্যায় জড়পদার্থে পরিণত হয়েছেন।

কৃষ্ণের কথায় ক্রুদ্ধ দুর্যোধন নিজ দেহ ভূমি থেকে সামান্য উত্তোলন করে বললেন, হে বাসুদেব, তোমার ইঙ্গিতেই ভীমসেন অধর্মযুদ্ধে আমার ঊরু ভঙ্গ করেছে। আশ্চর্য! এতেও তোমার কোনরূপ লজ্জা বোধ হচ্ছে না। তুমি শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে পিতামহকে নিহত করেছ। অশ্বত্থামা নামে হস্তী নিহত হলে তুমিই কৌশলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আচার্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়েছিলে এবং এই অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে নিহত করতে উদ্যত হলে তুমি তাঁকে বাধা দেও নি। তোমারই কৌশলে কর্ণের বাণে অর্জুনের পরিবর্তে ঘটোৎকচ নিহত হয়েছে। সাত্যকি তোমারই প্ররোচনায় ছিন্নহাত প্রয়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে নিহত করেছে। তোমার কৌশলেই অর্জুনের প্রতি নিক্ষিপ্ত কর্ণের সর্পবাণ ব্যর্থ হয়েছে। রথচক্র উদ্ধারে ব্যস্ত থাকার সময় তোমারই নির্দেশে অর্জুন কর্ণকে অন্যায়ভাবে নিহত করেছে। তোমার চেয়ে পাপাত্মা, নির্দয় ও নির্লজ্জ কে আছে? ভাগ্যের পরিহাস অধর্মযুদ্ধে ধর্মপরায়ণ-নৃপতিদের সঙ্গে আমারা নিহত হলাম।

দুর্যোধনের অভিযোগগুলির কোন উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, হে গান্ধারী নন্দন,

প্রবল লোভের বশবর্তী হয়ে তুমি বহু অকার্যের অনুষ্ঠান করেছ। এক্ষণে তুমি তারই পরিণাম ভোগ করছ।

কৃষ্ণের কথায় কোনরূপ দমিত না হয়ে দুর্যোধন বললেন, হে কৃষ্ণ, আমি জীবনে সদা পূণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেছি। পরিশেষে ক্ষত্রিয়ের প্রার্থনীয় রণক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেছি। আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করছি। তোমরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের হারিয়ে মৃতের ন্যায় এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।

দুর্যোধনের বাক্য শেষ হতেই আকাশ থেকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। গন্ধর্বগণ সুমধুর বাদ্যবাদন ও অপ্সরাগণ দুর্যোধনের যশোগান করতে লাগলেন। সিদ্ধগণ তাঁকে সাধুবাদ প্রদান করলেন। এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করে বাসুদেব প্রমুখ পাণ্ডবগণ লজ্জিত হলেন এবং ভীম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্ম যুদ্ধে নিহত করেছেন সে কথা শ্রবণ করে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন।

পাণ্ডবদের চিন্তাকুল দেখে কৃষ্ণ বললেন, হে পাণ্ডবগণ, ভীষ্মপ্রমূখ মহারথগণ ও রাজা দুর্যোধনকে তোমরা কদাচ ধর্মযুদ্ধে পরাজিত করতে পারতে না। আমি তোমাদের হিতের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করে ও মায়াবলে তাঁদের নিহত করেছি। ভীমসেন যে অসদ উপায়ে দুর্যোধনকে পরাভূত করেছে সে বিষয়ে আর কোন আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এরূপ প্রসৃদ্ধি আছে শত্রু সংখ্যা অধিক হলে তাদের কুটযুদ্ধে নিহত করবে। দেবতারা অসুরদের কুটযুদ্ধেই নিহত করেছিলেন। আমরা সকলেই পরিশ্রান্ত। চল আমরা নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করি। এই বলে বাসুদেব অন্যান্যদের সঙ্গে দুর্যোধনের নিধনে উৎফুল্ল হয়ে শঙ্খধ্বনি করে উঠলেন।

পরদিন যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে হস্তিনাপুরে এলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা নানাভাবে চেষ্টা করেও আপনার অসম্মতির জন্য এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি নি। আপনার অপরাধেই সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হল। কালপ্রভাবেই এরূপ হয়েছে সন্দেহ নেই। আপনি ও সাম্রাজ্ঞী গান্ধারী শোক সংবরণ করে পাণ্ডবদের প্রতি রোষ পরিত্যাগ করুন। তাঁদের নিরাপদে প্রতিপালন করুন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত শত্রু নিধন করেও গভীর দুঃখে দিন অতিবাহিত করছেন। তিনি লজ্জায় আপনার সম্মুখে উপস্তিত হতে পারছেন না।

পরে কৃষ্ণ শোকবিহ্বলা গান্ধারীকে বললেন, সুবলনন্দিনী, আপনি আপনার পুত্রদের তাঁদের ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করতে বহু উপদেশ দিয়েছেন; তাঁরা আপনার কথায় কর্ণপাত করেন নি। আপনি তাঁদের এও বলেছেন 'যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়'। এক্ষণে সেই বাক্য কার্যে পরিণত হল। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি ইচ্ছা করলে ক্রোধানলে সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস করতে পারেন। আপনি পাণ্ডবদের বিনাশ করবেন না।

গান্ধারী বললেন, বাসুদেব! তোমার বাক্যে আমি মনে শান্তি ফিরে পেলাম। তুমি

পাণ্ডবদের সঙ্গে বৃদ্ধ পুত্রহীন অন্ধ রাজাকে রক্ষণাবেক্ষণ কর।

এমন সময় অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি বাসুদেবের মনে উদয় হল। তিনি গান্ধারীকে জানালেন আজ রাত্রিতেই অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের বিনাশের পরিকল্পনা করেছেন। গান্ধারীর নির্দেশে বাসুদেব পাণ্ডবদের রক্ষায় অবিলম্বে পাণ্ডব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এদিকে দূতমুখে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা যুদ্ধক্ষেত্রে আগমণ করে ভগ্নউরু যন্ত্রণাকাতর ভূমিশয্যায় শায়িত দুর্যোধনকে দেখে শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। অশ্বত্থামা অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, হে সর্বলোকেশ্বর, তুমি সর্বলোকের মাননীয় ও ইন্দ্রতুল্য অতুল বৈভবের অধিকারী হয়েও আজ ধুলিলিপ্ত দেহে ভূতলে শায়িত আছ। তোমার দুর্দশা দর্শনে বোধ হচ্ছে লক্ষ্মী কারও নিকট স্থায়ীভাবে বাস করেন না।

কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে সম্বোধন করে দুর্যোধন বললেন, হে বীরগণ, পণ্ডিতগণ বলে থাকেন কাল প্রভাবে সর্বভূতেরই বিনাশ হয়। আমার বিনাশ এই অমোঘ সত্যকেই নূতন করে প্রমাণ করল। যাহোক আমি কোন বিপদেই সম্মুখ সমরে পরাঙ্মুখ হই নি। পাপাত্মা পাণ্ডবগণ আমাকে ছলনা দ্বারা পরাভূত করেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তোমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। আমার জন্য শোক করো না। বেদবাক্য সত্য হলে আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হব। তোমাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৌরবদের বিজয় সম্ভব হল না। স্পষ্টতই দৈবকে অতিক্রম করা কারও সাধ্য নয়।

অশ্বত্থামা বললেন, মহারাজ, নীচাশয় পাণ্ডবগণ নিষ্ঠুরভাবে আমার পিতাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তোমার জন্যই বেশী শোক অনুভব করছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ রাতেই বাসুদেবের সম্মুখে সকল পাঞ্চালদের বিনষ্ট করব। তুমি আমাকে আদেশ কর।

দুর্যোধন তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৌরবপক্ষের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন। দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে সিংহনাদে চারিদিক প্রকম্পিত করে অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

বনমধ্যে রাত্রি যাপন কালে অশ্বত্থামা পাঞ্চালদের হত্যার পরিকল্পনা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার নিকট প্রকাশ করে বললেন, বিজয়ী পাণ্ডবদের এখন সম্মুখ সমরে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। কার্যসিদ্ধির জন্য আমাদের অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। আহত ও পরিশ্রান্ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ গভীর রাত্রিতে নিদ্রামগ্ন হলে আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁদের বিনষ্ট করব।

কৃপাচার্য অশ্বত্থামার প্রস্তাব অস্বীকার করে বললেন, বৎস! নিদ্রিত, অস্ত্রহীন, রথহীন, বাহনহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদের বধ করা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে মৃতব্যক্তির ন্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে আজ রাত্রিতে নিদ্রাসুখ উপভোগ করবে। এই অবস্থায় যিনি তাঁদের আক্রমণ করবেন তাঁকে অনন্ত নরকভোগ করতে

হবে। তুমি অস্ত্রজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এ পর্যন্ত কোন পাপই তোমায় স্পর্শ করে নি। কল্য সূর্যোদয় হলে প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুদের বিনষ্ট করার সুযোগ পাবে।

অশ্বত্থামা কৃপাচার্যের উপদেশ অগ্রাহ্য করে রথে পাণ্ডব শিবির অভিমুখে যাত্রা করলে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাও তাঁর অনুগামী হলেন। শিবিরদ্বারে উপস্থিত হয়ে অশ্বত্থামা ভীষণ দর্শন প্রকাণ্ড দেহধারী এক মহাপুরুষকে দেখতে পেলেন। এই দিব্য পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষু হতে নির্গত তেজরাশি শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষিকেশ চারিদিকে উৎক্ষেপণ করছে। অশ্বত্থামা এই মহাপুরুষকে দেখে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে তাঁর প্রতি দিব্যাস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন; কিন্তু কোনই ফল হল না। তিনি পূর্বের ন্যায়ই পথরোধ করে শিবির দ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন। অশ্বত্থামা বুঝলেন দৈববল প্রাপ্ত না হলে তাঁর কার্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি তখন রথ থেকে নেমে দেবাদিদের মহাদেবের শরণাগত হলেন। মহাদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তাঁর অনন্ত মহিমার উল্লেখ করে অশ্বত্থামা বললেন, হে দেবেশ, তুমি শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর। আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হলাম। আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আমি আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ উৎসর্গ করে তোমার পূজা করব।

স্তব শেষ হলে অশ্বত্থামার সম্মুখে সহসা এক অগ্নিপূর্ণ কাঞ্চনময় বেদী প্রাদুর্ভূত হল। অগ্নি হতে রুদ্রভক্ত বিচিত্র দর্শন ভূতগণ নির্গত হয়ে একযোগে অশ্বত্থামার দিকে ধাবমান হল। অশ্বত্থামা ভীত না হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের উদ্দেশে বললেন, হে ভগবন্, অদ্য আমি তোমার প্রীতির জন্য অগ্নিতে নিজেকে আহুতি প্রদান করব, তুমি আমার এই উপহার গ্রহণ কর। এই বলে তিনি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। তখন মহাদেব বললেন, হে বীর, কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রিয়তর আমার আর কেহই নেই। সে জন্য কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য পরীক্ষা করতে পাঞ্চালদের মায়া বলে সুরক্ষিত করে রেখেছিলাম; কিন্তু কালগ্রস্ত পাঞ্চালগণ অদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এই বলে মহাদেব আপন খড়্গ অশ্বত্থামাকে প্রদান করে নিজে তাঁর দেহে প্রবেশ করলেন। দৈবিক শক্তিলাভ করে অশ্বত্থামা মহাউল্লাসে সেই খড়্গ ধারণ করে পাণ্ডব শিবিরে প্রবিষ্ট হলেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা শিবিরের দ্বারদেশে অবস্থান করতে লাগলেন। শিবিরাভ্যন্তরে রক্ষীদের সকল প্রকার বাধা বিনষ্ট করে অশ্বত্থামা নিদ্রারত দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, পাঞ্চাল বীর উত্তমৌজা ও যুধামন্যু এবং প্রতিবিন্ধ্যাদি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে খড়্গ দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। অসংখ্য পাণ্ডব সৈন্য ও তাঁর হাতে প্রাণ হারাল। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার অস্ত্রাঘাতেও পলায়নপর বহু পাণ্ডব সৈন্য বিনষ্ট হল। কার্য সম্পাদন করে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দ্রুত এই শুভ সংবাদ জানাতে দুর্যোধন সমীপে উপনীত হলেন।

দুর্যোধন তখন অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রক্তবমন করছেন। ভীষণ দর্শন শৃগালগণ তাঁকে বেষ্টন করে আছে। প্রাণ নির্গত হলেই তারা তাঁর দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে। দুর্যোধনের এই অবস্থা দেখে অশ্বত্থামা,

কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, অধর্মযুদ্ধে তোমার উরুভঙ্গ করে ভীমসেন চিরদিন জগত সংসারে নিন্দনীয় হয়ে থাকবে। তুমি স্বর্গে গিয়ে পিতা দ্রোণাচার্যকে বলবে আজ অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিধন করেছে।

অশ্বত্থামার নিকট পাণ্ডবশিবিরের ঘটনাবলী শ্রবণ করে দুর্যোধন বললেন, হে বীর, যে কার্য মহাবাহু পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য সম্পাদন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন, তুমি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে সেই কার্য সম্পাদন করেছ। নীচাশয় পাণ্ডব সেনাপতির মৃত্যুতে আমি নিজেকে ইন্দ্রতুল্য মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হোক। স্বর্গে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে। এই বলে দুর্যোধন বীরত্রয়কে আলিঙ্গন করে প্রাণত্যাগ করলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির দূতমুখে শিবিরের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে পুত্রশোকে মুহ্যমান হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। কিয়ৎকাল বাদ সংজ্ঞালাভ করে বিলাপের স্বরে বললেন, কী বিচিত্র! আমাদের হস্তে পরাজিত শত্রুগণ আমাদেরই পরাজিত করল। কার্যের গতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকটও দুর্জ্ঞেয়। এক্ষণে মনে হচ্ছে জয়লাভ করে আমরা পরাজিত হলাম, আর শত্রুগণ পরাজিত হয়ে জয়ী হল। যে জয় অনুতাপ সৃষ্টি করে সে জয় পরাজয় স্বরূপ। আমি দ্রৌপদীর অবস্থা মনে করে স্থির থাকতে পারছি না। তিনি কীরূপে এই পুত্র শোক সহ্য করবেন?

ইতিমধ্যে দ্রৌপদী সেস্থানে উপস্থিত হয়ে পুত্রগণের নিধন সংবাদ শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভীমসেন দ্রৌপদীকে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। জ্ঞানলাভ করে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, শুনেছি, অশ্বত্থামার মস্তকে এক সহজাত মণি আছে। এই মণি আপনার মস্তকে স্থাপন করলে আমি কিছুটা শান্তি পাব। এই বলে তিনি ভীমসেনকে অনুরোধ করলেন অশ্বত্থামাকে বধ করে তাঁর মণি সংগ্রহ করতে। ভীমসেন তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ভীমসেনের একার পক্ষে অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করা অসম্ভব মনে করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে নিয়ে দ্রুতগামী রথে ভীমসেনের অনুগামী হলেন। ভীমসেন ও পশ্চাতে বাসুদেবের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখে অশ্বত্থামা ঈষিকাতে (শরতুণ) পিতা দ্রোণাচার্যের নিকট প্রাপ্ত সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন করে 'পাণ্ডব বংশ বিনষ্ট হোক' বলে তা নিক্ষেপ করলেন। বাসুদেবের নির্দেশে অর্জুনও 'অশ্বত্থামার অস্ত্রবিনষ্ট হোক' বলে নিক্ষেপ করলেন নিজের ব্রহ্মাস্ত্র। অশ্বত্থামা ও অর্জুনের মহাস্ত্র প্রয়োগে ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়ে চারিদিক অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয়ে ধ্বংসোন্মুখ হল।

এই সময় দেবর্ষি নারদ ও ব্যাসদেব দুই দিব্যাস্ত্রের মধ্যে অবস্থান করে অশ্বত্থামা ও অর্জুনকে তাঁদের অস্ত্র সংবরণ করতে বলে জানালেন পূর্বে কোন অস্ত্রবিদ এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নি। সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসোন্মুখ দেখে অর্জুন স্বীয় শক্তিবলে তাঁর

দিব্যাস্ত্র ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ব্যর্থ হলেন তাঁর নিজের অস্ত্র ফিরিয়ে আনতে। তিনি অন্যায় স্বীকার করে বললেন, পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে এই দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করে আমি অতি কুকর্ম করেছি। এই অস্ত্র পাণ্ডবদের বিনাশ করবে সন্দেহ নেই। ব্যাসদেব অশ্বত্থামাকে বললেন, বৎস, অর্জুন তোমার বধের উদ্দেশ্যে তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন নি। তোমার অস্ত্র নিবারণের জন্যই এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন; কিন্তু কোনরূপ বিলম্ব না করে তা সংবরণও করে এনেছেন। তুমি অবিলম্বে তোমার অস্ত্র সংবরণ কর। পাণ্ডবগণ নিরাপদ হোন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মানুসারে জয়লাভ করতে চান না। তুমি তোমার মস্তকস্থিত মণি পাণ্ডবদের প্রদান কর। অশ্বত্থামা বললেন, আপনারা যা বললেন, তাই হোক। কিন্তু আমি আমার অস্ত্র সংবরণ করতে সমর্থ হচ্ছি না। এই অস্ত্র পাণ্ডবতনয়দের ভার্য্যাদের গর্ভস্থ সন্তানাদির উপর নিপতিত হবে।

অশ্বত্থামার বাক্যানুসারে তাঁর অস্ত্র অর্জুন পুত্রবধু উত্তরার গর্ভে পতিত হয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করল। বাসুদেব তখন নিজ বলে তাকে পুনর্জীবিত করে তুললেন। এই পুত্রের নামই পরীক্ষিৎ। বাসুদেব শাপ দিলেন অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করার অপরাধে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে একাকী ত্রিশ সহস্র বৎসর নির্জন প্রদেশে ভ্রমণ করে বেড়াবে। অশ্বত্থামা তখন নিজের মণি পাণ্ডবদের প্রদান করে বিষণ্ণ মনে বনে প্রস্থান করলেন। নারদ ও ব্যাসদেবের নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবগণ ফিরে এলেন নিজেদের শিবিরে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের মস্তকে অশ্বত্থামার মণি ধারণ করলে দ্রৌপদী অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। এইভাবে মহাভারতের মহাযুদ্ধ কৌরবদের পরাজয়ের মধ্যে শেষ হল। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

॥ পনের ॥

যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধকালীন ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে আমরা পান্ডবদের যুদ্ধজয়ের কারণসমূহ অনুধাবন করতে পারি। কারণসমূহ হল ঃ

(১) শত্রুপক্ষের যুদ্ধপ্রস্তুতির সম্যক সংবাদ সংগ্রহ এবং তার যথাযথ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ,

(২) গুপ্তচর নিয়োগ করে দৈনন্দিন যুদ্ধের শত্রুপক্ষীয় পরিকল্পনার সময়োচিত সংগ্রহ ও সফল প্রতি-সংবাদ (counter intelligence) সংগ্রহের ব্যবস্থা,

(৩) শত্রুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও বিশিষ্ট শত্রুপক্ষীয় সেনানীদের সহায়তা লাভ এবং

(৪) কৃষ্ণের কুটবুদ্ধি ও মায়া বল।

অন্যদিকে কৌরবদের পরাজয়ের প্রধান প্রধান কারণসমূহ হল ঃ

(১) দুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি কৌরব যোদ্ধাদের আত্মম্ভরিতা ও শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে উপযুক্ত সংবাদ সংগ্রহে ও মূল্যায়নে ব্যর্থতা,

(২) নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নিজ পক্ষীয় প্রধান প্রধান সেনানীদের বিশ্বাসঘাতকতা,

(৩) মায়া বল প্রয়োগে ও অন্যায় যুদ্ধে অনীহা এবং
(৪) কৃষ্ণের ন্যায় কুটবুদ্ধি সম্পন্ন কোন পরামর্শদাতার অভাব।

চর ও দূতের সাহায্যে পাণ্ডবগণ কী উপায়ে শত্রুর যুদ্ধপ্রস্তুতির সকল সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি তাঁদের নিকট শত্রুর অভিসন্ধি ও যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে কোন সংবাদই অজ্ঞাত ছিল না। সংবাদ সংগ্রহ করেই তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না; নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সকল সংবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে আপন স্বার্থে প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। কৃষ্ণের বুদ্ধিকৌশল, রাজনৈতিক ও যুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান ও দূরদর্শিতা পাণ্ডবদের প্রকৃত পন্থা নির্ণয়ে সর্বদা সাহায্য করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে বিপক্ষের সংবাদ আহরণ ও তার সম্যক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছিল কেবল কৃষ্ণের জন্যই। কৃষ্ণ নিজেও ছিলেন একজন অফুরন্ত সংবাদ ভাণ্ডার। স্বভাবতঃই কৃষ্ণ- নির্ভরতাই ছিল যুধিষ্ঠিরের প্রতি পদক্ষেপের অঙ্গ। কোন কোন বিষয়ে প্রথমে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেও যুধিষ্ঠির শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের উপদেশ মতই কার্যসম্পাদন করেছেন। কৃষ্ণের পক্ষেও উচ্চতর তথ্যসমৃদ্ধ বুদ্ধিবলে যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবদের স্বপক্ষে আনয়ন করা কঠিন ছিল না। কৃষ্ণ কেবল পাণ্ডবদের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি প্রত্যক্ষভাবে পাণ্ডবদের স্বার্থে কার্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। কৌরবদের মনোবল বুঝতে ও যুদ্ধ বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে তিনি সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর রাজ সভায় এসেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি যুদ্ধনীতি নির্দ্ধারণে পাণ্ডবদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল পাণ্ডবদের চেয়ে অনেক বেশী। তখনকার ভারতের বহুরাজন্যবর্গ, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। তাঁদের সহায়তায় তিনি শত্রুপক্ষের নানাসংবাদ সংগ্রহ করতেন। তিনি জানতেন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রথম যোগদান হল শত্রুর সকল প্রকার কার্যকলাপের পূর্বসংবাদ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। কৃষ্ণ একাজটি অতি নিপুণভাবে সম্পন্ন করে অধিক শক্তিশালী কৌরবদের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের জয়ের পথকে বহুলাংশে সুগম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রয়োজন বোধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহে বিশেষভাবে শিক্ষিত চরদের নিয়োগ করতেন। তাঁর সমগ্র কার্য্যাবলী দৃষ্টে কৃষ্ণকে আমরা একজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বলে আখ্যাত করতে পারি।

গোয়েন্দার ভূমিকায় বিদুরের অবদানও ছিল অপরিসীম। এ বিষয়ে পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। জীবিকার জন্য দুর্যোধনের নিকট ঋণী থাকা সত্ত্বেও তিনি পিতামহ ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ও কুলগুরু কৃপাচার্যের ন্যায় যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যোগ দেন নি। দুর্যোধনও যুদ্ধে বিদুরের সাহায্যে প্রার্থনা করেন নি। অথচ এঁরাও বিদুরের ন্যায় পাণ্ডব হিতৈষী বলে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য বিদুরই ধাত্ররাষ্ট্রগণের কার্যকলাপের অধিক সমালোচক ছিলেন। দুর্যোধনের জন্মের পর চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখে কুলরক্ষার জন্য তাঁকে পরিত্যাগ করতে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিনিই মাতা গান্ধারীকে অনুরোধ করেছিলেন। হস্তিনাপুর রাজসভায় তিনিই দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবাদ

করেছিলেন এবং এর জন্য দুর্যোধন কর্তৃক সর্বসময় তিনি তিরস্কৃতও হয়েছিলেন। দুর্যোধনের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক জতুগৃহ দাহে পান্ডবদের জীবন রক্ষা বিদুরের প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিদুরের ছিল অবারিত দ্বার। দুর্যোধন অবগত ছিলেন বিদুর তাঁদের বিরুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করতেন পান্ডবদের হিতকামনায়। এ সব কারণে বিদুরের সঙ্গে দুর্যোধনের সম্পর্ক ভীষ্মাদির চেয়ে একটু বেশী তিক্ত ছিল। এমতাবস্থায় দুর্যোধন বিদুরকে যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ না জানিয়ে অন্যায় কিছু করেন নি। এই সুযোগে অবশ্যই বিদুর তাঁর অনুগত চরদের নিয়োগ করে কৌরবদের পান্ডব বিরোধী কার্যাবলীর উপর নজর রাখছিলেন এবং সকল সংগৃহীত সংবাদ পান্ডবদের নিকট প্রেরণ করতেন। পান্ডবদের এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তিনি নিশ্চুপ থাকার লোক ছিলেন না। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গুপ্তচর বিভাগ সহ সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর তাঁর অবাধ কর্তৃত্ব থাকায় বিদুরের পক্ষে এ কাজ সহজ হয়েছিল। মনে হয় সংবাদ আদান প্রদানের ব্যাপারে কৃষ্ণের সঙ্গেও বিদুরের কোন গোপন যোগাযোগ ছিল। শান্তিদূত হয়ে হস্তিনাপুরে কৃষ্ণের গৃহে অবস্থান ও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ একান্ত আলোচনা দুজনের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। তদুপরি কৃষ্ণ ও বিদুর দুজনেই ছিলেন কট্টর কৌরব বিরোধী ও পান্ডব হিতৈষী। তাঁরা যে একই উদ্দেশ্যে কাজ করতেন তা বলাই বাহুল্য।

অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে আমরা পান্ডবগণ কতৃক কৌরবদের বিরুদ্ধে পূর্বগৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলির সম্যকপ্রতিফলন দেখতে পাই। কৌরবদের যুদ্ধপ্রস্তুতির সকল সংবাদ আহরণ করেই পান্ডবগণ ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা কৌরব সেনানীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও মদ্ররাজ শল্যের ন্যায় একজন অশেষ শক্তিসম্পন্ন কৌরবপক্ষীয় নৃপতিকে গোপনে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় স্বপক্ষে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্ষতি-নিবারণ (damage control) ব্যবস্থা হিসাবে কৃষ্ণ কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করে পান্ডবদের বিরুদ্ধে তাঁর মনকে দূর্বল করে দিয়েছিলেন এবং মাতা কুন্তী কর্ণের নিকট হতে অর্জুন ভিন্ন অন্য কোন পান্ডব ভ্রাতাদের আক্রমণ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাঁদের জীবনরক্ষা সুনিশ্চিত করেছিলেন। কারণ কুন্তী জানতেন তাঁর অন্য পুত্রগণ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলে প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। এ সবই পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি। কর্ণ হতে সম্ভাব্য বিপদ হতে কথঞ্চিত প্রশমিত করে পাণ্ডবগণ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধে পরাভূত করার উপায় নির্ধারিত করলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য ছিলেন যুদ্ধে অপরাজেয়। তাঁদের সম্মুখ সমরে পরাজিত করতে পারেন এমন কোন বীর ছিলেন না। অথচ তাঁদের বিনষ্ট করতে না পারলে পান্ডবদের বিজয় সম্ভব হবে না। যাঁরা দুজনেই জীবিকার জন্য ঋণ পরিশোধ করতে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। মনেপ্রাণে তাঁরা ছিলেন পান্ডবদের শুভানুধ্যায়ী। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের এই মনোভাব কাজে লাগিয়ে যুধিষ্ঠির জয়লাভের প্রার্থনা করে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে তাঁদের বধের উপায় জানতে চাইলেন। ভীষ্ম এই উপায়টি তখনই প্রকাশ না করে পরে জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নবম দিবসের রাত্রিতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে

তাঁর বধের উপায় প্রকাশ করেন। আমরা জ্ঞাত আছি, তিনি জানালেন বিরাটপুত্র শিখণ্ডী — যিনি পূর্বে নারী ছিলেন পরে পুরুষ হয়েছেন—তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন এবং তখন তাঁকে বধ করা সম্ভব হবে। কারণ তিনি এমন ব্যক্তির উপর শরনিক্ষেপ করেন না। কৃষ্ণের নির্দেশে রাতের অন্ধকারে দুর্যোধনের চরদের চোখে ধুলো দিয়ে ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বধের উপায় সংগ্রহ করেন। চরনীতির এটা একটি বিরাট সাফল্য। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন কর্তৃক ভীষ্মের নিকট হতে পাণ্ডবদের মৃত্যুবাণ সংগ্রহও তাঁদের আর একটি বড় সাফল্য।

দ্রোণাচার্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে জানালেন তিনি যুদ্ধকালে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাঁকে বধ করা সম্ভব হবে। পাণ্ডবগণ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে তাঁদেরই উদঘাটিত উপায়ে নিহত করলেন। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। যাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন তঁদেরই নিজেদের বধের উপায় প্রকাশ করে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য এক মহাবিশ্বাসঘাতকতার কার্য করলেন। দুর্ভাগ্য দুর্যোধনের, যাঁদের উপর তিনি যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরাই নিজেদের শত্রুর হস্তে নিহত হবার সুযোগ দিয়ে তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত করলেন। এই কি জীবিকার জন্য দুর্যোধনের প্রতি ঋণ পরিশোধের নমুনা? ভীষ্ম ও দ্রোণের এই কার্যকে আমরা ধিক্কার না জানিয়ে পারি না। জানি ছলনার আশ্রয়ে দ্রোণাচার্যকে নিজ পুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে তাঁকে রথোপরে অচৈতন্য করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এটাও সত্য দ্রোণাচার্য নিজেই বলেছিলেন অস্ত্রত্যাগ করে অচৈতন্য হয়ে পড়লেই তাঁকে বধ করা সম্ভব হবে। সে জন্য সমস্ত ঘটনার জন্য দ্রোণাচার্যের অবজ্ঞাও কখন ছিল না। যাহোক ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভবিষ্যতের কোন সেনানী বা রাজ কর্মচারী যেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্যে লিপ্ত না হন। অবশ্য দুর্ঘটনাবলী ·র পরিকল্পনামত অগ্রসর হয়ে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের পতনের মধ্যে তাঁদের জয়লাভের প্রধান বাধা দূর হল।

দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্যোধনকে দেওয়া আরও একটি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন। দ্রোণাচার্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্জুনকে অন্যত্র যুদ্ধে আবদ্ধ করে রাখলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আনবেন। পরিকল্পনামত দ্বাদশ দিনের যুদ্ধে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করলে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্ভাগে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। দ্রোণাচার্য অর্জুন-অরক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু বন্দী করতে পারলেন না। বহু পাণ্ডব বীর নিহত হলেও যুধিষ্ঠির সুযোগ বুঝে দ্রোণাচার্যকে ফাঁকি দিয়ে অন্যত্র গমন করলেন। দুর্যোধনের সন্দেহ দ্রোণাচার্য স্বেচ্ছায় যুধিষ্ঠিরকে পলায়ন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দ্রোণাচার্যের প্রতি এই সন্দেহ অমূলক মনে হয় না। দ্রোণাচার্যের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ শস্ত্রবিদের পক্ষে পার্শ্বরক্ষীদের পরাভূত করে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আনা অসম্ভব ছিল না, বিশেষতঃ অর্জুন তখন যেস্থানে অনুপস্থিত। মনে হয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দুর্বলতাবশতঃই দ্রোণাচার্যের এই যুদ্ধ-শিথিলতা। আরও একটি গূঢ় কারণ ছিল। দুর্যোধন স্থির করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে

বন্দী করে এনে তাঁকে আর একবার পাশা খেলায় পরাজিত করে পুনরায় বনবাসে প্রেরণ করবেন। দুর্যোধনের এই কুঅভিপ্রায় সঙ্গত কারণেই দ্রোণাচার্য মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। দুর্যোধন কিন্তু ধরে নিলেন আচার্য যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আনবেনই। সেও দ্রোণাচার্যের এক প্রকার প্রতারণা দুর্যোধনের প্রতি। তিনি সরাসরি দুর্যোধনের যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারতেন এবং যুদ্ধ থেকে অবসর প্রার্থনা করতে পারতেন। একজন আচার্যের নিকট এখন নীতিবিরুদ্ধ কাজ পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের ঘরের শত্রু রাবণভ্রাতা বিভীষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভীষ্মাদি গুরুজনগণ, আমরা জানি, প্রথম থেকেই দুর্যোধনের কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন। দ্রুপদ পুরোহিত ও কৃষ্ণের দৈত্যের ফলে তাঁদের দুর্যোধন-বিরোধী মনোভাব আরও দৃঢ় হয়। কৃষ্ণ ও পান্ডবদের সঙ্গে আলোচনা করে কৌরব দূত সঞ্জয়ও পূর্বমত পরিবর্তন কবে পান্ডবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও মাতা গান্ধারী দুর্যোধনকে বার বার পান্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব কৌরব সেনানীদের দুর্বল করে দিয়েছিল তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই যুদ্ধক্ষেত্রে। এসবই কৃষ্ণ ও পান্ডবদের সুষ্ঠু ভেদনীতির ফসল। পান্ডবদের জয় সুনিশ্চিত করতে প্রাধান প্রধান কৌরব সেনানীগণ রাজার প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করলেন। সেনানীদের মধ্যে ভেদ্‌ভাব এতই প্রবল ছিল যে ভীষ্ম প্রকাশ্যে কর্ণের বলবীর্য সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করলেন না। যেখানে নিজেদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী সেই সময় রাজা দুর্যোধনের সখা মহাবীর কর্ণকে হেয় প্রতিপন্ন করা দূরভিসন্ধিমূলক সন্দেহ নেই। কর্ণকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়াই যেন ছিল ভীষ্মের উদ্দেশ্য। ভীষ্মের অপমানের প্রতিবাদে কর্ণ তাঁর পতনের পূর্বে যুদ্ধে যোগ দেন নি। এই দুই মহাযোদ্ধা এক সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে পান্ডবদের জয় এমন সহজ হত না। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে কর্ণ সাক্ষাৎ করলে তাঁদের মনোমালিন্যের অবসান হয়। ভীষ্ম স্বীকার কলেন অস্ত্রশস্ত্র চালনায় কর্ণ বাসুদেব ও অর্জুনের সমান। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

দুর্যোধনের প্রতি মদ্ররাজ শল্যের বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনী আমরা জানি। যুধিষ্ঠিরকে দেওয়া গোপন প্রতিশ্রুতি মত তিনি কর্ণের সারথীর পদ গ্রহণ করে তাঁর প্রতি নানা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করলেন। কটাক্ষ করলেন তাঁর বলবীর্যের প্রতি। কর্ণ ও নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করে মদ্ররাজকে অপমানিত করলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যখন মানসিক স্থৈর্য ও মনোবলের প্রয়োজন, তখন কর্ণ এক গভীর মানসিক পীড়নের শিকার হলেন। তাঁর যুদ্ধ জয়ের একাগ্রতা অনেকাংশে ব্যাহত হল। মদ্ররাজের ব্যবহারে কর্ণের স্বভাবতঃই সন্দেহ হল তিনি বন্ধুর বেশে শত্রুর ন্যায় আচরণ

করছেন। কিন্তু তখন আর মদ্ররাজকে সারথীর পদ থেকে অপসারণ করা সম্ভব ছিল না। দুর্যোধনের মধ্যস্থতায় তাঁদের বাদানুবাদ বন্ধ হলেও ক্ষতি যা হবার তা হলই। মদ্ররাজের সাহায্যে কর্ণের শক্তি হরণের যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য সফল হল। মদ্ররাজ সারথী হিসাবে কর্ণকে এমন সব উপদেশ দিলেন যাতে পাণ্ডবদেরই সুবিধা হয়। শল্যের জন্যই কৌরবদের যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। নাগবাণে অর্জুনের মৃত্যু অবধারিত জেনে শল্য কর্ণকে অন্য বাণ ব্যবহার করতে উপদেশ দিলেন। তখন কৃষ্ণের মায়াবলে অর্জুনের জীবন রক্ষা পেল। মদ্ররাজের বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব সংবাদ দুর্যোধনের অজ্ঞাত ছিল বলেই তিনি কৌরবদের এরূপ ভীষণ-ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় কর্ণের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের পরম উপকারী মদ্ররাজ শল্য তাঁরই হস্তে নৃশংসভাবে নিহত হলেন। বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম বোধ হয় এমনই হয়।

মাতা কুন্তীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সুযোগ পেয়েও যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে কোন ক্ষতি না করে ছেড়ে দিলেন এ ব্যাপারে কৃষ্ণেরও হাত ছিল। তিনি কর্ণকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর মনকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। স্পষ্টতই মাতা কুন্তী ও কৃষ্ণের ক্ষতি নিবারণ (damage control) ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস পরম সুহৃদ কর্ণের কার্যে দুর্যোধনেরই ক্ষতি হল সব চেয়ে বেশী। কর্ণের পক্ষে অর্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডুপুত্রদের বন্দী বা বিনষ্ট করা অসম্ভব ছিল না। নিজ জন্মবৃত্তান্ত না জানলে বা মাতা কুন্তীকে পাণ্ডব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দিলে কর্ণের প্রচেষ্টায় যুদ্ধের ফলাফল অন্য রকম হতে পারত।

শত্রুর ব্যূহ রচনা, সৈন্য সমাবেশ, যুদ্ধ কৌশল, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের পরিচয় প্রভৃতি যুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য উভয় পক্ষেরই বহু গুপ্তচর অন্য শিবিরে নিযুক্ত ছিল। সংগৃহীত সংবাদের গুরুত্ব দেখে মনে হয় চরদের মধ্যে অনেকেই নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। এসব কাজ কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই উভয় পক্ষে এ কাজে নেমেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যথাস্থানে সংগৃহীত সংবাদের দ্রুত গোপন প্রেরণের ব্যবস্থাও ছিল। মনে হয় এ জন্য অন্য কাজে নিযুক্ত কিছু বিশ্বস্ত লোকদের গোপন সংবাদ বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হত। তাদের অবশ্যই উভয় শিবিরে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র ছিল। বহু লোক উভয় শিবিরে মাংস, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি সরবরাহ করত এবং তাদের অনেকের মধ্যে যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। এরাই এই সব গোপনীয় কাজ সম্পন্ন করত। চরগণ প্রয়োজনবোধে সরাসরি নিয়োগকর্তার সঙ্গে দেখা করে সংবাদ প্রদান করত। রাত্রির অন্ধকারেই সাধারণত এ কাজ সম্পন্ন হত। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সর্বত্র সম্মানিত। তাঁরা সহজেই বিভিন্নস্থানে যাতায়াত করতে পারতেন। সংবাদ সংগ্রহের

ব্যাপারে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণবেশী চরদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য দময়ন্তী ব্রাহ্মণ চরদের সাহায্যেই নিরুদ্দিষ্ট স্বামী নলকে উদ্ধার করেছিলেন।

আমরা দেখেছি কৌরব শিবিরে যুদ্ধ-আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনাদির নিকট উভয় পক্ষের বীরদের শক্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ অচিরেই পান্ডবদের গোচরীভূত হয়েছিল। প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে কৃষ্ণ ও অর্জুনের নির্দেশমত পান্ডবপক্ষ উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন কৌরবদের আক্রমণ প্রতিহত করতে। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু জয়দ্রথ কর্তৃক পান্ডব সৈন্যদের বাধাদানের ফলে শক্রচক্রব্যূহে একাকী প্রবেশ করে দ্রোণাচার্যপ্রমুখ বীরদের হাতে নিহত হন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে অর্জুন আগামী দিনের যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করবেন বলে আপন সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। দুর্যোধনের চরগণ এই সংবাদ সংগ্রহ করে অবিলম্বে তাঁর গোচরে আনে। কৌরব বীরগণ জয়দ্রথ-রক্ষার সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই রক্ষা ব্যবস্থাগুলি কৃষ্ণ নিজের চরদের নিকট জানতে পেরে অর্জুনকে জানিয়ে দেন। আমরা জ্ঞাত আছি অর্জুন শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের সহায়তায় জয়দ্রথকে বধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কাহিনীতে উল্লেখ না থাকলেও, উভয়পক্ষই যে যুদ্ধসংক্রান্ত অন্য বহুসংবাদই চরদের সাহায্যে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাত্মক বা আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চরগণ যে যুদ্ধের সময় কত সতর্ক ও তৎপর ছিল এসব ঘটনা থেকে তারই প্রমাণ মেলে।

জয়দ্রথরক্ষায় কৌরবদের ব্যবস্থাগুলির সংবাদ কৃষ্ণের চরদের সংগ্রহের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এতে মনে হয় যুদ্ধসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণের নিজের অধীনে একদল চর নিযুক্ত ছিল। তাদের পান্ডবগণ কর্তৃক নিযুক্ত চরদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা সরাসরি কৃষ্ণের নিকট সকল সংগৃহীত সংবাদ সরবরাহ করত। শত্রুর কার্যাবলীর সঠিক ও সময়োচিত সংবাদের গুরুত্ব যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কৃষ্ণ ভাল করেই জানতেন। সে জন্য তিনি কোন ঝুঁকি না নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহুপূর্ব থেকে নিজের অধীনে এক বিশ্বস্ত গুপ্তচর দল প্রস্তুত করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিযুক্ত করেছিলেন। দুটি উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। এক, শত্রুর কার্য্যাবলী ও যুদ্ধ পরিকল্পনার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ এবং দুই, অন্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের সত্যতা নিরূপণ। বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরু-পান্ডবদের যুদ্ধ ছিল না ; এই যুদ্ধ ছিল কৃষ্ণের সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধ। সে জন্য যুদ্ধে জয়লাভের দায়িত্ব ছিল তাঁরই। তিনিই ছিলেন পান্ডবদের মধ্যমণি এবং তাঁর নির্দেশমতই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যই শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর এমন ব্যাগ্রতা ও প্রস্তুতি।

মহাকাব্যাশ্রয়ী কোন কোন রচনায় দেখতে পাই কৃষ্ণের অন্যতম প্রধান চর ছিল সেই ব্যাধ যার স্ত্রী ও পাঁচ পুত্র জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। ব্যাধের

সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক পান্ডবদের জ্ঞাতসারেই তার স্ত্রী ও পুত্রগণ এই দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ব্যাধ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের মৃত্যুর জন্য পান্ডবদের দায়ী করে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে নানা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করতে লাগল। দূরদর্শী কৃষ্ণের সমস্ত ঘটনার উপর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি ব্যাধের এই অভিসন্ধির বিষয় জানতে পেরে গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পান্ডব বলে প্রথম কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কৃষ্ণ নানা যুক্তি দ্বারা ব্যাধের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি বুঝিয়ে বলেন, কোন বড় ঘটনায় নিরীহ ও নিরপরাধ লোকজনও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই সমাজজীবনের দুঃখজনক হলেও অবশ্যাম্ভাবী নিয়ম। কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বহু কীটপতঙ্গ পদদলিত হয়ে জীবন হারায়। এই জীবন নাশের জন্য এই ব্যক্তিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেইরূপ কুরু ও পান্ডবদের মধ্যে আসন্ন মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্ত্রীপুত্রের এই মৃত্যু দুঃখজনক হলেও অস্বাভাবিক নয় এবং এর জন্য পান্ডবদের দোষী সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। তিনি বুঝালেন আসন্ন যুদ্ধে পান্ডবদের সাহায্য করেই সে তার প্রতিহিংসা লালসা চরিতার্থ করতে পারবে। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে সে পান্ডবদের পুত্রনাশ, বংশ নাশ দেখতে পাবে। কৃষ্ণ ব্যাধকে সকল বৈরীভাব পরিত্যাগ করে তাঁর নির্দেশানুসারে কাজ করতে উপদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাধ কৃষ্ণের কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর আজ্ঞামত প্রতিপক্ষের সংবাদ আহরণের কাজে নিযুক্ত হল।

ব্যাধ পান্ডব ও কৌরব শিবিরে মাংশ সরবরাহের কাজ গ্রহণ করে। এর ফলে তাকে ও তার সহকর্মীদের সদাসর্বদা দুই শিবিরে যাতায়াত করতে হত। এ জন্য তাদের উভয় শিবিরে প্রবেশের প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র ছিল। ব্যাধ কৃষ্ণের নির্দেশে বিপক্ষের কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না করে তাদের শিবিরের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সংবাদ গোপনে তাঁকে জানাত। কৌরবদের পক্ষেও ব্যাধ সংবাদ সংগ্রহ করত। দ্বিচর (double agent) হিসেবে কাজ করলেও ব্যাধের প্রথম আনুগত্য ছিল কৃষ্ণের প্রতি। অসাধারণ বুদ্ধিধারী কৃষ্ণের নির্দেশে ব্যাধ ও তার কর্মীদের কাজকর্ম অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। কোন সমস্যা দেখা দিলে কৃষ্ণের উপদেশে তার নিরসন হত। কথিত আছে, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় যুদ্ধের শেষে কৃষ্ণ কিছু সময়ের জন্য একাকী কোন অজ্ঞাত স্থানে গমন করতেন। শিবিরের কেউই এমন কি প্রিয় সখা অর্জুনও জানতেন না তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যেতেন। তবে অনেকের সন্দেহ হত হয়তো জপাদি কর্মের জন্যই কৃষ্ণের এই অজ্ঞাতস্থানে গমন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যেতেন ব্যাধের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে বিপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য। মনে হয় রাত্রিতে অর্জুনের দুর্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাত ও তাঁর মুকুট সংগ্রহ এবং পরে ভীষ্মের নিকট হতে দুর্যোধনবেশে পঞ্চপান্ডব বধের মন্ত্রপুত মৃত্যুবরণ অপসারণ, যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্মের শিবিরে গমন ও তাঁর বধোপায় সংগ্রহ প্রভৃতি বিপজ্জনক কার্য ব্যাধের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়েছিল। ব্যাধই কৃষ্ণকে কৌরব

শিবিরে প্রবেশের পাস্ ওয়ার্ড (pass word) বলে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য বহু বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণ ব্যাধের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই সব সংবাদের ভিত্তিতে কৃষ্ণের নির্দেশে পান্ডবগণ প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতেন।

ব্যাধের এই ভূমিকা আনুমানিক হলেও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। হয়তো ঘটনা এইভাবেই ঘটেছিল, যদিও মহাভারতের কবি সংগত কারণেই সংবাদ আদান প্রদানের এ সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, উচ্চতর বুদ্ধি ও মায়া শক্তির বলেই পান্ডবগণ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কৌরবদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক শত্রুপক্ষের সকল কার্যাবলীর পূর্ব সংবাদ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল বলেই তাঁর এই সবগুণাবলীর প্রয়োগ সহজ হল। কৃষ্ণবিহীন পান্ডবদের জয়লাভ অসম্ভব ছিল। যখনই কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে তখন কৃষ্ণ সেই বিপদ থেকে পান্ডবদের উদ্ধার করেছেন। কৃষ্ণ ভিন্ন পান্ডবপক্ষের অন্য কারও এই সকল দুষ্কর কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা ছিল না। নানা ঘটনায় আমরা এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পেয়েছি। যুদ্ধে ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ কৃষ্ণ নির্দিষ্ট উপায়দ্বারাই নিহত হলেন। পান্ডবগণ নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেলেন, বিশ্বস্ততার সঙ্গে কৃষ্ণের নির্দেশ ও উপদেশমত কাজ করেই। কৃষ্ণের উপদেশেই যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট গমন করে তাঁর বধোপায় জেনে নিলেন। কৃষ্ণের বুদ্ধিবলেই ভীমপুত্র ঘটোৎকচ কর্ণের এক শত্রুঘাতিনী শরে নিহত হয়ে অর্জুনের প্রাণরক্ষা করল। আবার কৃষ্ণ তৃতীয় ও নবম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের আক্রমণে পান্ডবদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখে নিজে আক্রমনোদ্যত হয়ে ভীষ্মকে নিরস্ত করলেন। কৃষ্ণের নির্দেশে যুধিষ্ঠির, পুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে সুনিশ্চিত করলেন মহাবীর দ্রোণাচার্যের মৃত্যু। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে কৃষ্ণের বুদ্ধিবলেই অশ্বত্থামার নারায়ণ অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে পান্ডবদের জীবন রক্ষা পেলে। গান্ডীব ধনুর নিন্দার প্রতিবাদে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণই তাঁকে বাধা দেন এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্য পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। মায়া শক্তির প্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণ কৃত্রিম সূর্যাস্ত সৃষ্টি করে অর্জুনের হাতে জয়দ্রথের মৃত্যু সম্ভব করে অর্জুনকে নিশ্চিত আত্মাহুতি থেকে উদ্ধার করেন। মায়াবলেই কৃষ্ণ অর্জুনের রথচক্র মাটিতে প্রোথিত করে কর্ণের নাগবাণ ব্যর্থ করে অর্জুনের জীবন রক্ষা করেন। ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ কৃষ্ণের ইঙ্গিতেই সম্ভব হয়েছিল। অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের অস্ত্রে নিহত সন্তানকে কৃষ্ণ বাঁচিয়ে তুলে পান্ডবদের বংশ রক্ষা করেন।

যুদ্ধে অর্জুনের সাফল্য সম্ভব হয়েছিল কৃষ্ণের সারথ্যের জন্যই। যখনই সাধারণ বুদ্ধিতে কাজ হয় নি তখনই কৃষ্ণ মায়া শক্তি ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে প্রাণরক্ষায় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে কোন পাপ নেই। সর্বোপরি গীতার

উপদেশাবলী শুনেই অর্জুন সকল দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। অতএব কৃষ্ণেরই যে মহাভারতের যুদ্ধে মুখ্য ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পান্ডবগণ তাঁর ক্রীড়নক হয়ে কাজ করেছেন মাত্র।

কৃষ্ণের নেতৃত্বে পান্ডবদের যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যাবলী পরিকল্পনামত অগ্রসর হয়েছিল। কৌরবদের পদক্ষেপগুলির মধ্যে কিন্তু বহু ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। পান্ডবদের ন্যায় তাঁরা চরনীতির সঠিক প্রয়োগ করে বিপক্ষের প্রয়োজনীয় সংবাদ সব সময় সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাঁরা কি জানতেন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য যাদের উপর নির্ভর করে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা দুজনেই যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের বধোপায় বলে দিয়েছেন। যদি না জেনে থাকেন তবে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বিচ্যুতি আর কী হতে পারে? আর যদি জেনেই ছিলেন তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ হয়নি কেন? মদ্ররাজ শল্য সম্বন্ধেও একই অভিযোগ প্রযোজ্য। যুদ্ধের সময় তাঁদের বাক্য ও কার্য থেকে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক, তাঁদের আনুগত্য ও সহানুভূতি পান্ডবদের প্রতিই ছিল ; ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের প্রতি ছিল না, যদিও তাঁরা তাঁদের পক্ষেই পান্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। আমরা এ বিষয়টি পূর্বেও আলোচনা করেছি। পান্ডব শিবিরে নিযুক্ত তাঁর চরদের সাহায্যে দুর্যোধন বিপক্ষের কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই সংবাদের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। পূর্ব সংবাদ থাকা সত্ত্বেও তিনি শিখন্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে আসতে বাধা দিতে পারেন নি। জয়দ্রথকে বধ করার অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা দুর্যোধন পূর্বাহ্নে জানতে পেরে তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু মায়া- বলে কৃষ্ণ সূর্যকে আচ্ছাদিত করে মিথ্যার আশ্রয়ে অর্জুনের হস্তে জয়দ্রথ বধের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সে দিক থেকে জয়দ্রথ বধের জন্য কৌরবদের দোষ দেওয়া যায় না। ব্যাধ যে দ্বিচরের (double agent)-এর ভূমিকায় কৃষ্ণের প্রতিই বেশী অনুগত ছিল এবং কৌরবদের সে যে ভুল বা অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন করত সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন সংবাদ ছিল না। দুর্যোধনের চরগণ ব্যাধের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল বলে মনে হয়। স্পষ্টতই দুর্যোধনের প্রতি-সংবাদ (counter intelligence) সংগ্রহ ব্যবস্থা ভীষণ দূর্বল ছিল।

পান্ডবদের ভেদনীতির তাৎপর্য কৌরবগণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। ভীষ্ম ও কর্ণ এবং পরে কর্ণ ও শল্যের মধ্যে অর্থহীন বাদানুবাদ থেকে এর প্রমাণ মিলে। দুর্যোধন আরও সজাগ থাকলে এই বাদানুবাদ এতদূর গড়াতে পারত না। লাভ হল পান্ডবদেরই। বাদানুবাদের ফলে কর্ণের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। দ্রোণাচার্যের সঙ্গেও কর্ণের সম্পর্ক ভাল ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও শল্যের বাক্যে ও কার্যে তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে এবং সে কথা কর্ণ দুর্যোধনকে প্রকাশও করেন। তাঁদের পরিত্যাগ করার প্রস্তাবও উঠে। আমরা এই তিন প্রধান কৌরব যোদ্ধার বিশ্বাসঘাতকতার কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

কৌরবপক্ষ যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ও দ্বিধাবিভক্ত তখন পান্ডবগণ কৃষ্ণের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ও যুদ্ধজয়ে কৃত সংকল্প। এ অবস্থায় ফলাফল যা হবার তাইই হয়েছিল।

আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণের মায়াশক্তি প্রয়োগের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছি। ভীষ্মাদি কৌরবপক্ষীয় বীরগণও মায়াশক্তির অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু তাঁরা কেউই এই শক্তি প্রয়োগ করেন নি। পান্ডব হিতৈষী ভীষ্মাদি গুরুজনদের পান্ডবদের উপর মায়াশক্তি প্রয়োগ না করার কারণ বুঝতে পারি। দুর্যোধন কিন্তু সম্পূর্ণ নৈতিক কারণে এই শক্তির প্রয়োগ থেকে বিরত ছিলেন। দুর্যোধন ঘোষণা করেছিলেন, কৌরব বীরগণ তাঁদের নিজ শৌর্যবীর্যের উপর নির্ভর করেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তাঁর মতে মায়াশক্তি প্রয়োগ ক্ষত্রীয় ধর্মবিরুদ্ধ। দুর্যোধন তাঁর এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। নিদারুণ বিপদের সময়ও তিনি বা তাঁর মিত্র অন্য কোন কৌরব বীর মায়াশক্তির আশ্রয় নেওয়ার কথা ভাবেন নি। আবার কৌরবপক্ষ খুব কম ক্ষেত্রেই যুদ্ধ জয়ের জন্য মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কৌরবরথীদের বালক অভিমন্যুবধই একমাত্র কলঙ্ক। সে দিক থেকে পান্ডবপক্ষ শতগুণে বেশী দোষী। ঈশ্বরাবতার ও সত্য ও ন্যায় প্রতীক বলে আমরা যাকে জানি সেই কৃষ্ণই এই মিথ্যা ও ছলনার উদ্ভাবক ও নির্বাহক। যুদ্ধের শেষে তিনি স্বীকার করেছেন ন্যায় যুদ্ধে কৌরবদের পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে কৃষ্ণের মত আমরা জানি। তাঁর মতে যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় অধার্মিক নয়। সে যাই হোক যে ভাবে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভুবিশ্রবা ও দুর্যোধন নিহত হলেন তা আমাদের মনকে ব্যথিত করে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞামত অস্ত্রসংবরণ করলেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃত নিয়মানুসারে অস্ত্রসংবরণ করেছেন এমন কারও উপর অস্ত্র প্রয়োগ করা চলবে না। এই দিক থেকে বিচার করলে ভীষ্মের পতন যুদ্ধের নিয়মাবলী ভঙ্গ করেই সম্ভব হয়েছিল। আপন পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়েছে এই মিথ্যা বাক্য যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনে দ্রোণাচার্য মুচ্ছির্ত হয়ে পড়লে দৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে নিহত করেন ও তাঁর শিরচ্ছেদ করে দূরে নিক্ষেপ করেন। সত্যাশ্রয়ী বলে পরিচিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আপন আচার্যের নিকট এই মিথ্যা কথনের নিন্দার ভাষা নেই। দ্রোণাচার্যের বিশ্বাস ছিল যুধিষ্ঠির কোন প্রলোভনেই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। সে জন্যই তিনি যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন পুত্র অশ্বত্থামা সত্যই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন কি না। নিজের দোষ স্খলনের জন্য তিনি অস্ফুটস্বরে অশ্বত্থামা নামে একটি হস্তী নিহত হয়েছে, কোন মানুষের মৃত্যু হয় নি এই কথা বলে তিনি যেন নিজের মিথ্যা কথনের পাপকে ষোলকলায় পূর্ণ করে ভন্ডামির পরাকাষ্ঠা দেখালেন। ধিক যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞান। আমরা জানি, কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকেই বলেছিলেন অশ্বত্থামার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ দ্রোণাচার্যের নিকট প্রকাশ করতে। অর্জুন কৃষ্ণের সখা ও শিষ্য হয়েও তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। মিথ্যার আশ্রয়ে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যের মৃত্যুকে

প্রতিরোধ করতে না পেরে তিনি পরে দুঃখপ্রকাশও করেছিলেন। অন্যায়ভাবে বালী বধের জন্য রামের ন্যায় যুধিষ্ঠিরও দ্রোণাচার্য বধের জন্য চিরকাল অশ্বত্থামা দায় ভাগী হয়ে থাকবেন অর্জুনের এই অভিমত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই গর্হিত কাজের জন্য যুধিষ্ঠির আজ সকলের নিকট ধিকৃত।

কর্ণকেও অন্যায় পথে নিহত করা হয়েছে। রথচক্র ভূমিতে প্রোথিত হলে কর্ণ যখন নিরস্ত্র হয়ে তা উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তখনই তাঁর উপর আক্রমণ করা হল। অস্ত্রবিহীন যোদ্ধাকে আক্রমণ যুদ্ধনীতির বিরোধী। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন অনায়াসে এই নীতিবিরুদ্ধ কাজটি সমাধা করলেন কর্ণকে রথচক্র উদ্ধারের কোন সময় না দিয়ে। কর্ণ কিন্তু ইতিপূর্বে অর্জুন বধের জন্য বাণরূপী তক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করেন নি ; তিনি আপন শক্তির উপর নির্ভর করেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই নীতিবোধের জন্য আমরা কর্ণকে প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। পান্ডবদের মধ্যে এরূপ নীতিপরায়ণতা ছিল অতি বিরল।

জয়দ্রথের মৃত্যুর বিবরণ আমরা জেনেছি। ন্যায়যুদ্ধে তাঁকে বধ করা সম্ভব হয় নি। কেবল যে কৃষ্ণের মায়াশক্তি প্রভাবেই এই কাজ সম্ভব হয়েছিল তা নয়। জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষেত্রের অভিশাপ ও আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়ে কৃষ্ণের পূর্বসংবাদ ছিল বলেই জয়দ্রথ বধের এই অসাধ্য কাজটি অর্জুন কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল।

সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে রত ভুরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কর্তন করে অর্জুন যুদ্ধ-নীতি ভঙ্গ করেছেন সন্দেহ নেই। দ্বৈরথ যুদ্ধে তৃতীয় কোন যোদ্ধার যোগদান নিষিদ্ধ বলে তখনকার দিনের স্বীকৃত নিয়ম। সাত্যকি কর্তৃক ধ্যানস্থ গুরুতর আহত মৃত্যুপথযাত্রী ভুবিশ্রবার মস্তকচ্ছেদনও এক গর্হিত কাজ যার নিন্দার ভাষার নেই।

গদাযুদ্ধে ভীমসেন কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ পান্ডবদের আর একটি নীতি বিগর্হিত কাজ। ন্যায় পথে দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভব নয় জেনে কৃষ্ণ অর্জুনকে সে কথা বলেন। অর্জুন কৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য বুঝতে পেরে যুদ্ধরত ভীমসেনকে সেইমত নিজের উরুতে চপেটাঘাত করে ইঙ্গিত প্রদান করেন। ভীমসেন তখন তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে যুদ্ধের নিয়ম অগ্রাহ্য করে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে ফেলে তাঁকে ধরাশায়ী করেন। ভীমসেন গুরুতর আহত ভূমিশয্যায় শায়িত দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন নি। এ কথা সত্য কৌরব সভায় ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন। দুর্যোধনের উপর ঋষির শাপও ছিল তিনি উরুভঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। আমরা দেখেছি কৃষ্ণ কি উপায়ে গান্ডীব ধনুর নিন্দার জন্য যুধিষ্ঠির-বধের অর্জুন-প্রতিজ্ঞা পালন করে যুধিষ্ঠিরের জীবন রক্ষা করেছিলেন এবং অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা বিফলের পাপ থেকেও উদ্ধার করেছিলেন। এতে মনে হয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজনিত দোষ নিবারণের উপায়ও আছে। ভীমসেন দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন উপায় দ্বারা তাঁকে সমস্ত

বর্জিত পাপ থেকে উদ্ধার করে আনতেন। তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে ঋষির শাপকেও কৃষ্ণের পক্ষে খন্ডন করা অসম্ভব ছিল না। অবশ্য মহাশত্রু দুর্যোধনের প্রতি এরূপ মিত্রসুলভ ব্যবহার আমরা আশা করতে পারি না। প্রধানত ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দুর্যোধনের এই উরুভঙ্গ—এই কৃষ্ণ ও পান্ডবগণের সুচিন্তিত অভিমত এবং তাঁরা এর মধ্যে অন্যায় কিছু দেখেন নি। কিন্তু গদাযুদ্ধে নাভীর নিচে আঘাত সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। দুর্যোধনের নিধনও অন্যায় যুদ্ধেই সম্পন্ন হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি কৌরবগণ প্রধানত যুদ্ধের নিয়মকানুন মেনেই যুদ্ধ করেছেন। অন্যায় পথ তাঁরা গ্রহণ করেছেন খুব কমই। পান্ডবদের ন্যায় ছলনা ও মায়াশক্তির আশ্রয় নিলে তাঁরা এমনভাবে পরাজিত হতেন কি না সন্দেহ। আমরা জানি কৃষ্ণের জন্যই এ সব সম্ভব হয়েছে। কৌরবপক্ষে কৃষ্ণের ন্যায় বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কেউ ছিলেন না যিনি প্রতিপদক্ষেপে বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁদের সঠিক পথ নির্দিষ্ট করতে পারেন। একমাত্র মহাজ্ঞানী ভীষ্মের পক্ষেই কৌরবদের জন্য এ কাজ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, যেহেতু দুর্যোধন অন্নদাতা ছিলেন। নীতিগত কারণে তাঁর পক্ষে কৃষ্ণের ন্যায় কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না। পান্ডবদের বিজয়ের এও একটি বড় কারণ।

মহাভারতের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভে শত্রুর কার্যাবলীর পূর্বসংবাদ সংগ্রহের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। কৃষ্ণ নির্দিষ্ট বিভিন্ন উপায়ে কৌরব বীরদের নিধন করা সম্ভব হত না যদি না তাঁদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সকল সংবাদ পূর্বে তাঁর জানা না থাকত। কৃষ্ণ এবং পান্ডবগণ জানতেন যতক্ষণ পিতামহ ভীষ্ম ও শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করে থাকবেন ততক্ষণ তাঁদের কোনরূপ ক্ষতি করা সম্ভব হবে না। এই সংবাদের ভিত্তিতেই তাঁদের অস্ত্রশূন্য করে বধ করা সম্ভব হয়েছিল কি উপায়ে? এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। জয়দ্রথের পিতার অভিশাপের বিষয়টি কৃষ্ণ পূর্বেই অবগত ছিলেন। যুদ্ধের দিন বনমধ্যে তার ধ্যানস্থ হয়ে অবস্থানের বিষয়টিও তাঁর জানা ছিল। চর মারফত ও অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত এই সংবাদের ভিত্তিতে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন মন্ত্রসিদ্ধ বিশেষ বাণ দ্বারা জয়দ্রথের মুণ্ড কর্তিত করে ধ্যানস্থ পিতার ক্রোড়ে স্থাপন করলে তিনি পুত্রের মুণ্ড হতচকিত হয়ে মাটিতে ফেলে দেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন আপন অভিশাপের ফলস্বরূপ। কৃষ্ণের জয়দ্রথ পিতার অভিশাপের বিষয় জানা না থাকলে অর্জুন জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুপথ যাত্রী হতেন। কৃষ্ণের ছিল অসাধারণ দূরদর্শিতা ও পূর্বানুমান ক্ষমতা। তাঁর নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করেই অর্জুন নিজে রক্ষা পেলেন এবং সেই সঙ্গে নিহত হলেন মহাশত্রু জয়দ্রথ ও তাঁর অভিশাপদানকারী পিতা। ব্যর্থ হল পুত্রকে

রক্ষার পিতার সকল প্রচেষ্টা।

জয়দ্রথ পিতার অভিশাপের কথা কৌরবদেরও অজানা থাকার কথা নয়। তাঁরা কিন্তু এর কোন সুযোগই নিতে পারলেন না। তাঁদের মনেই আসে নি কৃষ্ণের নির্দেশে এমন অভিনব উপায়ে জয়দ্রথ ও তাঁর পিতার জীবন বিনষ্ট হবে এবং অর্জুন জয়দ্রথের হত্যাকারী হয়েও অভিশাপকে কৌশলে নস্যাৎ করে নিজে বেঁচে থাকবেন। সমস্ত ঘটনাবলী দেখে কৌরবদের বিস্ময়ের শেষ থাকল না। বুঝলেন কৃষ্ণের বুদ্ধি বলেই এমন অসাধ্য সাধন হল।

কৃষ্ণ জানতেন কর্ণ ও অর্জুন বলবীর্যে সমকক্ষ। এঁদের দুজনের যুদ্ধে-জয়পরাজয় অনিশ্চিত। কৃষ্ণ সে জন্য কর্ণ-বধের কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সুযোগ উপস্থিত হল যখন কর্ণ অস্ত্রবিহীন অবস্থায় মাটিতে প্রোথিত তাঁর রথচক্র উদ্ধারের চেষ্টা করলেন। কর্ণের রথচক্র মাটিতে প্রোথিত না হলে অর্জুনের পক্ষে অস্ত্রধারী কর্ণকে বধ করা এত সহজ হত না। এখানেও কৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণের বলবীর্যের যথার্থ মূল্যায়ণ ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্যই কার্যোদ্ধার সম্ভব হল।

দুর্যোধনের উরুভঙ্গের কাহিনী আমরা জানি। গদাযুদ্ধে পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমসেনই কেবল দুর্যোধনের সমকক্ষ ছিলেন বরং অনুশীলন ছিল ভীমসেনের চেয়ে দুর্যোধনের অনেক বেশী। কৃষ্ণ এ সবই জানতেন। তাঁর প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল ভীমসেন সত্যই দুর্যোধনের বিরুদ্ধে পেরে উঠবেন কি না। গদাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তাঁর সন্দেহ গভীরতর হল। কৃষ্ণ প্রমাদ গুনলেন। শেষে, আমরা দেখেছি, যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে ভীমসেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে তাঁকে ধরাশায়ী করলেন। গদা চালনায় দুর্যোধন ও ভীমসেনের পারদর্শিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল বলেই কৃষ্ণের পক্ষে ভীমসেনের জয় সুনিশ্চিত করতে এমন পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। মহাভারতের ঘটনাবলীতে আপন উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করতে বিপক্ষের কার্যকলাপ ও প্রস্তুতি সম্বন্ধে পূর্বসংবাদ সংগ্রহের গুরুত্ব আমরা নানাভাবে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। চরনীতির এই সুষ্ঠু প্রয়োগে কৃষ্ণের নেতৃত্বে পান্ডবপক্ষ যে কৌরবদের চেয়ে বহুগুণে পারদর্শী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

বিপক্ষের অভিসন্ধি ও প্রস্তুতি বিষয়ে পূর্ব সংবাদ সংগ্রহ অতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সাফল্য লাভের জন্য নিজের উপযুক্ত বলবীর্য থাকা প্রয়োজন। পান্ডবগণ সংবাদ ও প্রতিসংবাদ (counter intelligence) সংগ্রহের গুরুত্ব কোন সময়েই উপেক্ষা করেন নি। সে জন্যই তাঁরা প্রয়োজন মত আপন শক্তি ও বিভিন্ন সৎ ও অসৎ উপায়ের আশ্রয় নিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য কৌরবদের এ বিষয়ে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। তাঁরা যেন কেবল নিজেদের সামরিক শক্তির উপরেই নির্ভর করেছিলেন। এ শক্তিও আবার অটুট ছিল না প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। বিপক্ষের অভিসন্ধি ও প্রস্তুতি সম্বন্ধে তাঁদের পূর্ব সংবাদের

অসম্পূর্ণতা ছিল। স্বভাবতঃই তাঁদের চরদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। চরদের উপর তদারকি ব্যবস্থাও আশানুরূপ ছিল না। সংগৃহীত সংবাদের মূল্যায়নও সঠিক হয় নি। তদুপরি তাঁদের তরফে বিপক্ষের উপর সাম, দান, ভেঁদ প্রভৃতি নীতিগুলির প্রয়োগ হয়নি বললেই চলে। মায়াশক্তির প্রয়োগে অনীহা তাঁদের আর একটি বড় বিচ্যুতি। যুদ্ধকালে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নকে বড় করে দেখে কৌরবগণ নিজেদের যুদ্ধকার্য সীমিত গন্ডীর মধ্যে রেখে আপন পক্ষের যোদ্ধৃবৃন্দকে বিপদের মুখে ফেলে শত্রুর কার্যসিদ্ধির সুযোগ করে দিলেন। কৃষ্ণের কুটবুদ্ধি ও ছলাকলার কাছে হেরে গেল বিরাট কৌরববাহিনী। তাঁদের পক্ষে সর্বশেষে একমাত্র আলোকরশ্মি দেখা গেল দৈববলে বলীয়ান অশ্বত্থামা কর্তৃক পাঞ্চালবীর ও দ্রৌপদীর পুত্রদের পান্ডব শিবিরে হত্যার মধ্যে। কিন্তু তখন কৌরবদের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত। ভঙ্গঊরু দুর্যোধন কেবল অশ্বত্থামার সফল অভিযানের সংবাদ শুনে আনন্দিত মনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কুরুকুল ধ্বংসের মধ্যে শেষ হল কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ।

অশ্বত্থামার দুষ্ট অভিসন্ধির কথা মনে উদয় হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ, শিখন্ডী, দৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল বীর ও দ্রৌপদীর পুত্রদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে অশ্বত্থামা মহাবলে বলীয়ান হয়ে মহাদেবেরই প্রদত্ত খড়্গ দিয়ে নিদ্রারত তাঁদের সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করলেন। কৃষ্ণের পক্ষে কি এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে মহাদেবের সাহায্যে অশ্বত্থামাকে বিরত করা সম্ভব ছিল না? দৈবিক কারণে সংঘটিত এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ি। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে কৃষ্ণ পঞ্চপান্ডব বা পান্ডবপক্ষীয় অন্যান্য বীরদের কোনরূপ সতর্ক পর্যন্ত করেন নি। অথচ গান্ধারীর নির্দেশে পান্ডবদের রক্ষায় কাল বিলম্ব না করে হস্তিনাপুর থেকে আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। সতর্কবার্তা পেলে মহাদেব প্রদত্ত পাশুপাত অস্ত্র ও অন্যান্য দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত অর্জুন পান্ডব যোদ্ধৃবৃন্দের সঙ্গে অশ্বত্থামাকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হতেন ; অশ্বত্থামার পক্ষে এমন একতরফা হত্যাকান্ড চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। কিন্তু কৃষ্ণ সব কিছু চেপে গেলেন; বিপদাশঙ্কার কথা কাউকেও প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করলেন না। তবে কি এই হত্যাকান্ড কৃষ্ণের লোকক্ষয়কারী কালের ভূমিকার আর একটি নূতন অভিব্যক্তি? অথবা এটা কি কৃষ্ণ কর্তৃক দেবাদিদেব মহাদেবের প্রাধান্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বিনা বাধায় মহাদেবের ইচ্ছাপূরণ? বাস্তববুদ্ধি দিয়ে আমরা এর উপর কোন আলোক সম্পাত করতে ব্যর্থ হই। যে কৃষ্ণ কৌরবদের বিরুদ্ধে পান্ডবদের জয়ের জন্য এত কিছু করলেন, সেই কৃষ্ণ পাঞ্চালবীর ও দ্রৌপদীপুত্রদের এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড নীরবে সংঘটিত হতে দিলেন। হত্যাকান্ডের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও তার কোন সদ্ব্যবহার করলেন না। আপন যোদ্ধৃবৃন্দের জীবন রক্ষায় কৃষ্ণের এই উদাসীনতা (ব্যর্থতা?)

আমরা ক্ষমা করতে পারি না। সে রাত্রির এই হত্যাকান্ড যুদ্ধজয়ের সকল আনন্দ বিনষ্ট করে পান্ডবদের গভীর শোকে নিমজ্জিত করল। শেষ সফল আঘাত হেনে যুদ্ধবিধ্বস্ত কৌরবপক্ষই প্রকৃত বিজয়ের আনন্দ ভোগ করলেন। তৃপ্ত হল তাঁদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা। পান্ডবদের অন্যায় যুদ্ধের যোগ্য উত্তর দিয়ে শেষ হাসি হাসলেন কৌরবপক্ষ।

* * *

মহাভারতের ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় যে বিষয়টি বার বার আমাদের মনে উদয় হয় তা হল কৃষ্ণের গীতার তত্ত্বগুলির সঙ্গে ফলিত দিকগুলির বিরাট পার্থক্য। গীতায় ধর্মজ্ঞান ও ন্যায়নীতির প্রতীক হিসাবে যে কৃষ্ণকে আমরা দেখেছি সেইকৃষ্ণ যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত। জানি, তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত কার্যফলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু মহাভারতে এই পার্থক্য যেন আকাশ ও পাতালের ব্যবধানের মতই বিরাট। দুইয়ের মধ্যে যেন কোন সম্পর্ক নেই। গীতার অমৃতবর্ষিণী বাণীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্যত্র কৃষ্ণের মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয়ের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পাই না। জরাসন্ধকে যেভাবে বধ করা হয়েছে তার কি সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল? তাঁকে কি ছলনার আশ্রয় না নিয়ে অন্য কোন স্বাভাবিক উপায়ে বধ করা যেত না? দ্রোণাচার্যের নিধনও কি ঐরূপ জঘন্য মিথ্যাচার বিনা সম্ভব ছিল না? তাঁর ন্যায় একজন মহাসম্মানিত আচার্যের খন্ডিত মুন্ডের কেশাকর্ষণে কৌরব সেনাদের মধ্যে নিক্ষেপের মধ্যে কি বীরত্ব থাকতে পারে? কৃষ্ণনির্দিষ্ট মিথ্যাচারে আচার্যের নিধন যে শিখন্ডীকে এই জঘন্য কার্যে উত্তেজিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণের মৌনতা এই কাজের প্রতি তাঁর সম্মতিই নির্দেশ করে। জয়দ্রথের নিধনও কৃষ্ণের ছলনার আর একটি নগ্ন প্রকাশ। কৃষ্ণের নির্দেশে অস্ত্রহীন কর্ণের উপর অর্জুনের আক্রমণ ও অর্জুন কর্তৃক সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধরত ভুরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কর্তন আমরা কীভাবে সমর্থন করতে পারি? অন্যায় যুদ্ধে ভীমসেন কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও মৃতপ্রায় যন্ত্রণাকাতর দুর্যোধনের মস্তকে ভীমসেনের পদাঘাত এবং কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের এর নির্লজ্জ সমর্থন— এ সবের যেন নিন্দার কোন ভাষা নেই। বিজয়ে শত্রুর প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন তৎকালীন মূল্যবোধেও অনস্বীকার্য নয়। কিন্তু নীতিজ্ঞানী বলে পরিচিত কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির অবলীলাক্রমে তা ভুলে গেলেন। এই কি তাঁদের লোকশিক্ষার নমুনা?

ছলনা ও অন্যায় যুদ্ধ বিনা কৌরবদের পরাজিত করা সম্ভব ছিল না— কৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে কতটা সত্যতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। গীতায় কৃষ্ণ জয়পরাজয় সুখদুঃখকে সমানভাবে দেখে সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পন করে একনিষ্ঠ হয়ে আপন কার্য সম্পাদন করতে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। সমত্ব বোধই যোগে

একথা তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। কার্যক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ তাঁর সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বকথার বিচ্যুতি ঘটিয়ে অতি সাধারণ মানুষের ন্যায় মিথ্যা ও ছলনার সহজপথ বেছে নিয়ে পান্ডবদের জয়লাভ সুনিশ্চিত করলেন। গীতায় বর্নিত তাঁর নিজের উপদেশ নস্যাৎ করে তিনি কর্মফলকে কর্মের চেয়ে বড় করে দেখলেন। আপন কার্যদ্বারা তিনি তাঁর তত্ত্বসমূহকে যেন ভুল প্রমাণ করলেন। অন্যদিকে দেখি তথাকথিত দুরাত্মা দুর্যোধন জয়পরাজয়কে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মহাসম্মানের সহিত ক্ষত্রিয়ের সাধনোচিত ধামে গমন করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের জন্য রেখে গেলেন এক যুদ্ধবিধ্বস্ত ভারতভূমি ও যুদ্ধে নিহত অগনিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মিত্র ও অন্যান্য যোদ্ধাদের শোকাহত পরিবারবর্গ। যুধিষ্ঠির সত্যই বুঝতে পারলেন দুর্যোধন পরাজিত হয়েও জয়লাভ করলেন, আর পান্ডবগণ জয়লাভ করেও প্রকৃত পরাজয় বরণ করলেন। গীতার নীতিবাক্য সমূহ যেন দুর্যোধনই সততার সহিত পালন করলেন। এ যেন গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট মানবদেহধারী অবতার শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়।

কৃষ্ণের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, বাস্তববুদ্ধি, সংবাদ আহ্বানে দক্ষতা প্রভৃতি নানা গুনাবলী দর্শনে আমরা মুগ্ধ। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের 'ধর্মযুদ্ধে' অধর্মের এমন নির্বিচার প্রয়োগ — তাও আবার ঈশ্বরাবতার কৃষ্ণের নির্দেশে— আমাদের মনকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। দ্বিধাগ্রস্ত হই সত্যাসত্য নির্ণয়ে। কৃষ্ণের নেতৃত্বে গীতার তত্ত্বগুলির সহিত সংগতি রেখে জাগতিক ঘটনাবলী নীতিগ্রাহ্য উপায়ে সংঘটিত হলে আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হত। তত্ত্বের সফল প্রয়োগ দেখে আনন্দ পেতাম। সার্থক হত কৃষ্ণের লোকশিক্ষার প্রয়াস। হয়তো গীতার লেখক ও মহাভারতের অন্যান্য অংশের লেখক এক ব্যক্তি নন। সেইজন্যই মনে হয় কৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের কার্য্যাবলীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় নি।

মহাভারতে কৃষ্ণই সুস্পষ্টভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হিসাবে প্রতিভাত। শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য তিনি লাভ করেছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজশূহ যজ্ঞানুষ্ঠানে। কৃষ্ণের ন্যায় এমন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? আমরা মহাভারতের ঘটনাবলীতে কৃষ্ণের এই শ্রেষ্ঠত্বের বহু প্রমাণ পেয়েছি এবং সে বিষয়ে আলোচনাও করেছি। হরিবংশ পুরাণে মহাভারত-পূর্ব কৃষ্ণের কর্মজীবনের বহু ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। সেখানেও তিনি দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালন কর্তারূপ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণই নিজ বাহুবলে অসুরদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দেবতাদের জন্য নিষ্কন্টক করেছেন। গোয়েন্দাকার্যে অনুসন্ধিৎসা ও পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন অপরিহার্য্য। এ সব গুণই ছিল কৃষ্ণের সহজাত। সেজন্য সত্য উদঘাটন ও বিপদোদ্ধার তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। এ বিষয়ে হরিবংশ পুরাণ থেকে কৃষ্ণের জীবনের দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভোজ-কুকুর বংশীয় রাজা সত্রাজিত ছিলেন সূর্যদেবের একজন পরমভক্ত ও শখা। একদিন তাঁর বন্দনায় সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে স্বীয় কণ্ঠস্থিত স্যমন্তক নামক মণিরত্ন রাজা সত্রাজিতকে অর্পণ করেন। পরে সত্রাজিত স্নেহবশতঃ ঐ মণি নিজ ভ্রাতা প্রসেনজিতকে দান করেন। প্রসেনজিতের গৃহে ঐ মণি হতে সুবর্ণ ক্ষরিত হতে লাগল। সময়ে বৃষ্টিপাত হয়ে দেশ শস্যপূর্ণ হয়ে উঠল। প্রজাগণের মন হতে ব্যাধিভয় দূর হল। মণির এমন অসামান্য ক্ষমতা দর্শনে কৃষ্ণ তা অধিগ্রহণে আগ্রহী হলেন; কিন্তু সুযোগ পেয়েও তিনি মণি গ্রহণ করলেন না।

একদা প্রসেনজিত মনিরত্নে বিভূষিত হয়ে মৃগয়ার জন্য বনে গমন করেন। বনে এক সিংহ প্রসেনজিতকে বধ করে মণি নিয়ে পলায়ন করতে উদ্যত হয়। সেই সময় ঋক্ষরাজ সিংহকে হত্যা করে মণি-রত্ন নিয়ে নিজ গুহায় প্রবিষ্ট হন।

এদিকে প্রসেনজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করল কৃষ্ণই প্রসেনজিতকে বধ করে তাঁর অঙ্গস্থিত মণি-রত্ন আত্মস্যাৎ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এই ভিত্তিহীন অভিযোগে কৃষ্ণ ভীষণভাবে দুঃখিত হলেন। অভিযুক্তকারীদের সন্দেহ নিরসন কল্পে কৃষ্ণ কয়েকজন যাদব বীরের সঙ্গে সেই মণি-রত্ন উদ্ধার করতে প্রসেনজিতের পদাঙ্গ অনুসরণ করে বনে আগমন করেন। নানা দুর্গম পর্বতমালা আন্বেষণ করে একস্থানে দেখতে পেলেন প্রসেনজিত তাঁর অশ্বের সঙ্গে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। অদূরে এক মৃত সিংহও দৃষ্টিগোচর হল। সমস্ত স্থান পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণ অনেকগুলি পদচিহ্নের মধ্যে ঋক্ষের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। তখন তিনি ঋক্ষের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁর গুহার মুখে এসে ভিতরের কথোপথন সতর্কতার সহিত শ্রবণ করে নিঃসন্দেহ হলেন প্রজেনজিতের মণিরত্ন গুহাভ্যন্তরেই লুক্কায়িত আছে। ভ্রাতা বলরাম ও অন্যান্য অনুগামীদের গুহার মুখে অবস্থান করতে বলে নিজে একাকী গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঋক্ষরাজ জাম্বমানের সঙ্গে কৃষ্ণের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধ চলেছিল একুশ দিন ধরে। কৃষ্ণের বিলম্ব দেখে বলরামাদি যাদব বীরগণ দ্বারাবতীতে ফিরে এসে জানালেন কৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এদিকে কৃষ্ণ জাম্ববানকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণির সঙ্গে ঋক্ষরাজ কন্যা জাম্ববতীকেও লাভ করলেন। দ্বারাবতীতে প্রত্যাবর্তন করে কৃষ্ণ পন্ডিতগণের সমক্ষে স্যমন্তক মণি রাজা সত্রাজিতকে সমর্পণ করে নিজের সততার প্রমাণ দিয়ে মণি হরণের মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত হলেন। রাজা সত্রাজিত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর তিন কন্যা—সত্যভামা, ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনীকে কৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করলেন।

অনন্তর মহাবল ভোজরাজ শতধন্বা যাদব বীর অক্রুর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সত্রাজিতকে বধ করে মণিরত্ন হস্তগত করেন এবং রাত্রিযোগে গোপনে তা অক্রুরকে সমর্পণ করেন। শতধন্বা অঙ্গীকার করেন অক্রুরের মণিরত্ন প্রাপ্তির সংবাদ কাউকেও প্রকাশ করবেন না। কৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করেন; কিন্তু তাঁর নিকট মণিরত্ন পাওয়া

যায় না। এদিকে কৃষ্ণের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে অক্রুর বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হলেন। বহুবৎসর পর কৃষ্ণ জানতে পারলেন স্যমন্তক মণি অক্রুর নিকট আছে, তিনি অক্রুকে মণিরত্ন ফেরত দিতে বলেন। অক্রুর বিনাবাক্য ব্যয়ে মণিরত্ন কৃষ্ণের হাতে তুলে দেন। পরে কৃষ্ণ অক্রুরকেই এই মণিরত্ন দান করেন। এইভাবে স্যমন্তক মণি নিয়ে জ্ঞাতি বিরোধের অবসান ঘটল।

এই ঘটনায় আমরা কৃষ্ণের সততা, অনুসন্ধিৎসা, সত্য নির্ণয়ে আগ্রহ, সাহসিকতা ও মহানুভবতার এক বিরল পরিচয় পাই। কৃষ্ণ সুযোগ পেয়েও মণিরত্ন হরণ করেন নি, যদিও তার প্রতি তাঁর লোভ ছিল। সততার এমন দৃষ্টান্ত কমই দেখা যায়। যে ভাবে তিনি বন ও পর্বতের দুর্গম প্রান্তে প্রসেনজিত ও পরে ঋক্ষরাজের পদচিহ্ন অনুসরণ করে মণিরত্ন উদ্ধার করলেন তা কেবল একজন গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ গোয়েন্দার পক্ষেই সম্ভব। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মণিরত্ন হরণের মিথ্যা অপবাদ নিরসনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠায় তাঁর পক্ষে কোন মূল্যই অদেয় ছিল না। সে জন্য তিনি জীবন বিপন্ন করে একাকী ঋক্ষরাজের গুহায় প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তার পূর্বে তিনি গোয়েন্দাসুলভ বিচক্ষণতার সঙ্গে জেনে নেন মণিরত্ন সেই গুহাতেই লুকায়িত আছে। মণিরত্ন উদ্ধারে যুদ্ধ-দুর্মদ কৃষ্ণের এই সাহসিকতা তাঁর পূর্বাপর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কৃষ্ণই কেবল পারেন এমন সাহসিকতা প্রদর্শন করতে। সত্রাজিত ও পরে অক্রুরকে স্যমন্তক মণি দান করে কৃষ্ণ তাঁর অনাসক্তি ও মহানুভবতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্যই জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সৌহার্দ ফিরে আসে। এমন কাজ কৃষ্ণের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

দ্বিতীয় ঘটনাটি নিম্নরূপ।

তখন বলিপুত্র দৈত্যবর বাণ শোণিতপুর নামক রাজ্যের অধিশ্বর। দেবাদিদেব মহাদেব বাণকে তাঁর আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজপুত্র বলে স্বীকৃতি দেন এবং পুত্র কার্তিকেয়র সহিত তাঁর রাজ্যরক্ষায় প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হন। মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে বলীয়ান বাণের ভয়ে দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বাণের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরা বারংবার পরাজয় বরণ করলেন। এদিকে বাণ-দুহিতা ঊষা পার্বতীর বরে নিদ্রাযোগে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে পতিরূপে পেতে আগ্রহী হন। অনিরুদ্ধও স্বপ্নযোগে ঊষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ঊষার অনুরোধে সহচরী চিত্রলেখা দেবর্ষি নারদ কর্তৃক প্রদত্ত তামসী বিদ্যা প্রভাবে অনিরুদ্ধকে সম্মোহিত করে সকলের অলক্ষিতে দ্বারাবতী হতে শোণিতপুরে ঊষার আলয়ে আনয়ন করে। সেখানে গান্ধর্ব ধর্মানুসারে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছুদিন বাদ দৈত্যরাজ বাণ বিবাহের এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে এক দানব বাহিনী প্রেরণ করেন অনিরুদ্ধকে বন্দী করতে। কিন্তু দানব সেনা অনিরুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করে। এরপর দানবরাজ বাণ স্বয়ং অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নানাবিধ

অস্ত্রপ্রয়োগ করেও অনিরুদ্ধের কোন ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হলেন না। অনিরুদ্ধের নিপুণ অস্ত্র চালনায় বাণরাজের অস্ত্রসমূহ ব্যর্থ হল। দানবরাজ তখন তামসী বিদ্যা প্রভাবে বিষধর সর্পদ্বারা অনিরুদ্ধকে বেষ্টন করে মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডকে আদেশ করলেন তাঁকে বধ করতে। কুম্ভাণ্ড বিনীতভাবে দৈত্যরাজকে বললেন, রাজন! এই যুবা বলবান, সাহসী ও অস্ত্রবিশারদ। নিশ্চয়ই ইনি কোন মহদ্বংশসম্ভূত। তদুপরি ইনি আপনার কন্যাকে বিবাহ করেছেন। আমার মতে এঁকে বিনাশ করা উচিত হবে না।

মন্ত্রীর বাক্যে সম্মত হয়ে অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বদ্ধ অবস্থায় রেখে বাণরাজ স্বীয় ভবনে গমন করলেন।

এদিকে দ্বারাবতীতে অনিরুদ্ধের অন্তর্ধানে শোকের ছায়া নেমে আসে। যাদববীরগণ অনিরুদ্ধের সন্ধানে চারিদিকে দূত প্রেরণ করলেন। দূতগণ যথা সময়ে প্রত্যাবর্তন করে এসে জানাল তারা সকল উদ্যান, পর্বত, নদী, গুহা, সরোবর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান অন্বেষণ করে কোথাও অনিরুদ্ধের সন্ধান পায় নি। যাদব বীরগণের অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, হয়তো দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্ব বৈরিতা বশতঃ অনিরুদ্ধকে হরণ করে থাকবেন। এ কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, এ কাজ দেবতা, গন্ধর্ব, ঋক্ষ বা রাক্ষস দ্বারা সাধিত হয়নি। অনিরুদ্ধ নিশ্চয়ই কোন মায়াবী পুংশ্চলী (কুলটা নারী) দ্বারা অপহৃত হয়েছেন।

এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে জানালেন, অনিরুদ্ধ শোণিতপুরে বাণরাজ কর্তৃক নাগপাশে আবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করছেন।

এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে কৃষ্ণ ভ্রাতা বলদেব ও পুত্র প্রদ্যুম্নের সঙ্গে গরুড়পৃষ্ঠে শোণিতপুরে এসে উপস্থিত হলে বাণরাজ পরিচালিত দানব সেনার সঙ্গে তাঁদের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দানবসেনা কৃষ্ণের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পলায়ন করতে লাগল। দানব সেনার বিপর্যয় দর্শনে মহাদেব স্বয়ং তাঁর অনুচরদের সঙ্গে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দেবী পৃথিবী নিতান্ত নিপীড়িত হয়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন শান্তি কামনায়। ব্রহ্মা তখন মহাদেবকে অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন। তিনি জানালেন, কৃষ্ণ মহাদেবেরই দ্বিধাভূত আত্মা, তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের কোন স্থান নেই। ব্রহ্মার কথায় মহাদেব যুদ্ধ হতে প্রতিনিবৃত্ত হলেন। এরপর কার্তিকেয় কিছুক্ষণ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রস্থান করলেন। অতঃপর কৃষ্ণের সঙ্গে বাণরাজের যুদ্ধ শুরু হল। বাণের ছিল সহস্র বাহু। কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্রদ্বারা একে একে তাঁর সমস্ত বাহু ছিন্ন করতে লাগলেন। যখন মাত্র দুটি বাহু অবশিষ্ট আছে তখন মহাদেব কার্তিকেয়র সঙ্গে কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে কৃষ্ণ, আমি বিদিত আছি ত্রিলোকমধ্যে কেউই তোমাকে পরাস্ত করতে পারে না। তুমি এক্ষণে তোমার চক্রাস্ত্র সংবরণ কর। আমি বাণকে অভয় প্রদান করেছি। যাতে আমার বচন রক্ষা হয়, তাই কর।

মহাদেবের অনুরোধে কৃষ্ণ চক্রাস্ত্র সংবরণ করলেন। বাণের জীবন রক্ষা পেল।

অতঃপর মহাদেবের বরে বাণ অমরত্ব লাভ করে তাঁর অনুচরদের প্রধান হয়ে মহাকাল নামে খ্যাতিলাভ করলেন।

যুদ্ধশেষে কৃষ্ণ নাগপাশমুক্ত অনিরুদ্ধকে ঊষার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সকলের সঙ্গে দ্বারাবতীতে প্রত্যাবর্তন করেন। মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড শোনিতপুর রাজপদে অভিসিক্ত হলেন।

এই ঘটনায় শক্তির পরীক্ষায় মহাদেবের উপর কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় যদিও মহাদেব ও কৃষ্ণ একই আত্মার দুই রূপ। এদিক থেকে বিচার করলে কৃষ্ণ সচেষ্ট হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অন্যান্য পাঞ্চাল বীরদের মহাদেবের বরে বলীয়ান অশ্বত্থামার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হতেন, বিশেষ করে যখন তিনি পূর্বেই এই জঘন্য আক্রমণের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। যুদ্ধনিরপেক্ষ কৃষ্ণের পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হলে তিনি মহাবীর পাণ্ডবদের দ্বারা কোন বিশেষ উপায়ে অশ্বত্থামাকে প্রতিহত করতে পারতেন। তাও তিনি করলেন না। মনে হয় দৈবিক কারণে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টির বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সে সময় কৃষ্ণ অশ্বত্থামার এই আক্রমণে উদাসীন থাকা সমীচিন মনে করেছিলেন।

চর (দূত) নিয়োগে নিরুদ্দিষ্ট অনিরুদ্ধের উদ্যান পর্বত প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণের বিষয়টি লক্ষণীয়। ইহা মহাভারতোক্ত চরনীতিরই প্রয়োগ। আত্মগোপনের পক্ষে এ সকলস্থানই প্রকৃষ্ট। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ কেবল বীরদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই চর নিয়োগ অনুমোদন করেছিলেন। তিনি জানতেন অনিরুদ্ধকে খুঁজে বার করা চরের কর্ম নয়। পরিস্থিতি অনুধাবন করে তিনি বুঝেছিলেন অনিরুদ্ধের অন্তর্ধানের পিছনে কোন মায়াবিনীর হাত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র যে এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন না তাও তিনি বুঝেছিলেন। সেজন্য তিনি যাদববীরদের সন্দেহ কোনরূপ অনুসন্ধান না করেই খারিজ করে দিয়েছিলেন। এতই দৃঢ় ছিল কৃষ্ণের আত্মপ্রত্যয়। এ সবই সত্য নির্ণয় কৃষ্ণের সহজাত প্রবৃত্তির প্রতিফলন। কৃষ্ণের ন্যায় একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দার পক্ষেই এরূপ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ হরিবংশ পুরাণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ সমূহের এক অপূর্ব নির্ঘন্ট।

* * *

মহাভারতের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবদের বিজয় ও কৌরবদের পরাজয়ের কারণগুলি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। ভারতের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা ভাল নয়। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট উগ্রপন্থী কার্যকলাপই সব চেয়ে বড় সমস্যা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থান উগ্রপন্থীদের প্রধান পৃষ্টপোষক। তাদের উদ্দেশ্য অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কেবল কাশ্মীরেই সীমাবদ্ধ নয়; স্থানীয় লোকদের একাংশের সাহায্যে তা দেশের বেশ কয়েকটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদও

বেশ সক্রিয়।

ভারত ও পাকিস্থান কর্তৃক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের (মে, ১৯১৮) ফলে সমগ্র পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে এবং দু দেশের সম্পর্ক এক নুতন তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এই প্রতিকূল অবস্থাতেও অবশ্য দুদেশের প্রধান মন্ত্রী নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। গত বৎসর (১৯১৮) ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লাহোর শুভেচ্ছা সফরের সময় দু দেশের কাশ্মীর সহ সকল বকেয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সংকল্প ঘোষণা করে। এই লাহোর ঘোষণাপত্রে ভারত ও পাকিস্তানের অগণিত লোক আশান্বিত বোধ করে, হয়তো ধীরে ধীরে দু দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু এই আশা বাস্তবায়িত হয় নি। শুভেচ্ছা সফরের কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তান মদত পুষ্ট সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী (যাদের মধ্যে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীও ছিল) নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে কাশ্মীরের কারগিল ও তার সন্নিহিত অরক্ষিত বিরাট দুর্গম পাহাড়ী এলাকা দখল করে বসে। অনেকের মতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আরও পূর্ব থেকে। অনুপ্রবেশকারীদের গোলাবর্ষণে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কারগিল-লে সড়ক বিপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে এক যুদ্ধের পরিস্থিতি উপস্থিত হয়। আমাদের সৈন্য ও বিমানবাহিনীর প্রতি আক্রমণে অনুপ্রবেশকারীরা নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে হটে যেতে বাধ্য হয়। অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের উপর যথেষ্ট আন্তর্জাতিক চাপও সৃষ্টি হয়েছিল। কারগিল এলাকার দুর্গম ১৩-১৪ হাজার ফুট উঁচু তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ পুনর্দখলের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে (মে মাস থেকে ১৪ই জুলাই, ১৯১৮) আমাদের পক্ষে নিহত হয়েছে চার শতের উপর এবং আহত হয়েছে প্রায় ছয় শত। কয়েকজন নিখোঁজও আছে। পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের মৃতের সংখ্যা প্রায় সাত শত। এছাড়া অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই। সীমান্তের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয় নি। ইতিমধ্যে (১২ই অক্টোবর, ১৯১৮) পাকিস্তানের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত-পাক সম্পর্ক এক নুতন অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এই ব্যাপক অনুপ্রবেশের পূর্বসংবাদ কিছুই সংগ্রহ করতে পারে নি। কেবল তাই নয়, অনুপ্রবেশ সংঘটিত হওয়ার তাৎক্ষণিক সংবাদও আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। যে সামান্য ছিটেফোঁটা সংবাদ আকস্মিক সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম তারও কোন সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। অনুপ্রবেশকারীদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ থেকে আমাদের টনক নড়ে এবং তাদের হটাতে আমরা 'অপারেশন বিজয়' আরম্ভ করি। উল্লেখ করা যেতে পারে আকসাই চীন অঞ্চলে চরদের অনুপ্রবেশও আমরা সময়মত জানতে পারি নি। এই ব্যর্থতার জন্য কাশ্মীরের এক বিরাট ভূখন্ড চীনের দখলে চলে গেছে। ১৯১৮ তে চীনের নিকট সীমান্ত সংঘর্ষে আমাদের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হল চীনাদের সম্বন্ধে

সঠিক সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থতা। ১৯১৮-এর যুদ্ধের সময়েও আমরা পাকিস্তানের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সময়মত সংবাদ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছি। আশির দশকে শ্রীলঙ্কার তামিল গেরিলাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ না থাকায় ভারতীয় শান্তি রক্ষী বাহিনীকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। কাশ্মীর ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ব সংবাদ সংগ্রহে যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ আছে। কারগিলের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে সংবাদের অভাবের জন্য আমাদের হতাহতের সংখ্যা এমনবেশী হয়েছে। কারগিলের যুদ্ধে আমাদের আরও দুর্বলতা ধরা পড়েছে। তা হল পাহাড়ের উপর যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামের অভাব। মহাভারতে আমরা দেখেছি রাষ্ট্র পরিচালনায় চরের ভূমিকার গুরুত্ব। মহাভারতের ঋষি ও রাষ্ট্রনায়কগণ বার বার উপদেশ দিয়েছেন শত্রু মিত্র সকলের সম্বন্ধেই সংবাদ সংগ্রহ করতে, কারণ আজকের মিত্র কাল শত্রুতে পরিণত হতে পারে। কাকেও অতি বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে। সংবাদ সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত পরীক্ষিত চরকেই নিয়োগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বহু নূতন পন্থায় আমরা সীমান্তের উপর নজরদারীর ব্যবস্থা করতে পারি। বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহের উপরও মহাভারতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক যুদ্ধ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। তা হলেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করতেই হবে। তবে দেখতে হবে সবই যেন উপযুক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। ঝোঁকের মাথায় ধূর্ত অস্ত্রব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় আমরা যেন অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য আমাদের সীমিত সম্পদ অযথা নষ্ট না করি। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের যথাযত রক্ষণাবেক্ষণেরও প্রয়োজন। কারগিলের যুদ্ধে সুব্রাহ্মণ কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি যেন সরকার অবিলম্বে দূর করার ব্যবস্থা করেন।

কারগিলের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীর শৌর্যবীর্য ও আত্মাহুতি সমস্ত দেশকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছে। দেশের অসংখ্য মানুষ এগিয়ে এসেছে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সাহায্য করতে। যুদ্ধে যারা আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের পরিবারবর্গ ও আহতদের সহায়তার দায়িত্ব সকল দেশবাসীর ও রাষ্ট্রের। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই আমরা যেন তাদের না ভুলি। আমরা এমন কিছু করব না যাতে আমাদের সামরিক বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়। এ বিষয়ে মহাভারতোক্ত উপদেশাবলী আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। সৈনিকদের উচ্চ মনোবল পাণ্ডবদের জয় ত্বরান্বিত করেছিল।

কারগিলের যুদ্ধে পরাজিত হলেও পাকিস্তান কাশ্মীরে ও ভারতের অন্যত্র তাদের ছায়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং এই ছায়া যুদ্ধ আগের চেয়ে আরও তীব্র আকার

ধারণ করেছে বিশেষ করে কাশ্মীরে। পাকিস্থানে মদত পুষ্ট বিভিন্ন উগ্রবাদী সংগঠনগুলি কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়সহযোগীদের সাহায্যে নানা হিংসাত্মক কার্য সংঘটিত করে চলেছে। বহু নিরীহ নারী, পুরুষ ও শিশুও এই আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। আতঙ্ক সৃষ্টি করে শাসনযন্ত্রের উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করাই এদের উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক (ডিসেম্বর, ১৯১৮) ভারতীয় বিমান অপহরণ ও বিমানযাত্রীদের জীবনের বিনিময়ে ৩ কট্টর জঙ্গীর মুক্তি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ছায়া যুদ্ধ এক নুতন মাত্রা পেল। স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা না পেলে উগ্রপন্থীরা এতটা সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হত না। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উগ্রপন্থী কার্য কলাপ সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। উগ্রপন্থীদের স্থানীয় সহযোগীদের মধ্যে সকলেই কট্টরপন্থী নন। নানা কারণে তারা হিংসার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এ সব নরমপন্থীদের চিহ্নিত করে উগ্রপন্থীদের থেকে পৃথক করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের সকল কল্পিত ও বাস্তব অভিযোগগুলি দূর করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে চেষ্টা করতে হবে তাদের জাতীয় মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে। স্থানীয় লোকদের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে বাইরের কোন দেশ বা সংস্থা আমাদের কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। মনে রাখতে হবে নরদূর্গ বা সুখী জনগণই রাষ্ট্রের প্রধান রক্ষা কবচ। এটা মহাভারতের শিক্ষা। অন্তর্বিরোধের জন্য কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। অধিকতর শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কৌরবপক্ষ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিল। আবার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুশাসনে দেশে শান্তিসমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার বিবরণ আমরা জানি। এই সুশাসনের প্রভাবে শত্রু ভাবাপন্ন রাজন্যবর্গ ও দস্যু, তস্কর প্রভৃতি সমাজবিরোধীরা স্বেচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে এগিয়ে এসেছিল। আজকের দিনে এতটা আশা করতে না পারলেও, এ কথা অনস্বীকার্য, সার্বিক চেষ্টা হলে অবস্থার অনেকটাই উন্নতি বিধান সম্ভব। মহাভারতের নানা ঘটনাবলীতে আমরা চরদের ভূমিকা লক্ষ্য করেছি। কত সততার সঙ্গে তারা তাদের নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করেছে। সঠিক সংবাদ ছিল বলেই পান্ডবগণ কৃষ্ণের নৈতৃত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন উপায় সমূহের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। মহাভারতের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বই দেশকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে।

দেশের শক্তি কেবল কয়েকটি আণুবিক বোমা বিস্ফোরণের উপর নির্ভর করে না। এই শক্তি নির্ভর করে জাতীয় সংহতি, আর্থিক স্থিতাবস্থা ও সামাজিক স্থিরতার উপর। এ দিক থেকে ভারত অনেক পিছিয়ে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমলাদের একটি বড় অংশ আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। জন সাধারণ দিশাহারা। শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি মৌলিক অধিকার থেকে অগণিত মানুষ বঞ্চিত। দেশে

এক নেতিবাচক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় জাতীয় সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সকল জাতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের আঁরও বেশী দায়িত্বশীল হতে হবে। কেবল দলীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাজ করলে চলবে না। জাতীয় স্বার্থরক্ষায় ও সমাজের অবক্ষয় নিবারণে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও প্রচার মাধ্যমের এক বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই ভূমিকা পালনে তাঁদের নুতন উদ্যমে অগ্রসর হতে হবে। রাজনীতির অপরাধীকরণ ও উচ্চপর্য্যায়ের ভ্রষ্টাচার— যা আমাদের সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে— দমিত হলে শিষ্টের পালন ও.দুষ্টের দমন সহজ হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে কর্মশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে। নূতন করে প্রেরণা পাবে দেশ রক্ষার অতি দুরুহ কার্যে নিযুক্ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ভিত্তিতেই ভিতর ও বাইরের শত্রুকে প্রতিহত করা সম্ভব। এই জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমই মহাভারতোক্ত রাজধর্ম যার সার কথা হল যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। দেশের বর্তমান সংকট নিরসনে এই রাজধর্মের সুষ্ঠু প্রয়োগ জরুরী হয়ে পড়েছে।

ভারত এক ঐতিহ্যবাহী দেশ। দেশবাসী সরল, কর্মঠ, ধর্মানুরাগী, বুদ্ধিসম্পন্ন ও অল্পে সন্তুষ্ট। সঠিক পথে চালিত হলে তারা অসাধ্যসাধন করতে পারে। এ জন্য চাই মহাভারত-বর্ণিত এক স্বার্থশূন্য জনগণ-অধিনায়ক নেতৃত্ব এবং তাঁর চক্ষুস্বরূপ এক সুসংহত গুপ্তচর দল ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক সুশিক্ষিত সুরক্ষা বাহিনী।

— o —